রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৮৮-১৯৮৮

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্মশতবর্ষপূর্তি-শ্রদ্ধার্ঘ্য

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

নিবেদন

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদনের যে কৃত্যসূচী বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছেন, সেই পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ এই গ্রন্থপ্রকাশ।

পিতার ইচ্ছাক্রমে, তাঁর জীবনব্রতকে যথাসাধ্য সফল করে তোলার ইচ্ছা নিয়ে রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কর্মে যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের অবর্তমানে পিতার আদর্শকে রূপায়িত করতে রথীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সমগ্র জীবন বিশ্বভারতীর সেবায় কিভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, সে ইতিহাস আমাদের কাছে অনেকখানিই অপরিজ্ঞাত। অনুরূপভাবে প্রায় নেপথ্যে থেকে গিয়েছে বিশ্বভারতী-গঠন-কর্মের বাইরে তাঁর সৃজনশীল কর্মোদ্যোগের ইতিহাস।

রথীন্দ্রনাথের জীবৎকালে, বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষে তাঁর সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি রচনা এই সংকলন-গ্রন্থের প্রথমে গ্রথিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ যে-সকল রচনা প্রকাশিত হয়, তার একটি নির্বাচিত অংশ এর পর সংকলিত। অতঃপর রথীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন রচনা যুক্ত হয়েছে— যা বর্তমান উপলক্ষে লিখিত। রথীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সে লেখা আত্মীয়-পরিজন ও সহকর্মীদের কাছে কয়েকখানি চিঠি তাঁর অন্যান্য কয়েকটি রচনার সঙ্গে মুদ্রিত হল। এগুলির কোনো কোনোটির মধ্যে পিতার কর্মজীবনের কথা অনেকাংশে উদ্‌ভাসিত, আর কতকটা প্রচ্ছন্ন আছে ক্রমশ নিজেকে প্রস্তুত করার ইতিহাস।

রথীন্দ্রনাথের প্রতি বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধানিবেদনকল্পে পুলিনবিহারী সেন তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কাছে নিবেদন করেছিলেন। তাঁর সে প্রস্তাব গৃহীত হলেও নানা কারণে তাঁর পক্ষে কাজ অগ্রসর করা সম্ভবপর হয় নি। আলোচনাসূত্রে এই গ্রন্থ-পরিকল্পনার কথা তিনি নানা সময়ে বলেছেন, সেই আরব্ধ কর্ম যথাসাধ্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করা গেল, বিনম্রচিত্তে এ কথা নিবেদন করি।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীনিমাইসাধন বসু এই গ্রন্থপ্রকাশে আন্তরিক প্রয়াস ও আনুকূল্য করেছেন। শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী প্রথমাবধি এই গ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ এবং সম্পাদনার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। শ্রীক্ষিতীশ রায় একাধিক রচনার সন্ধান দিয়ে সম্পাদনা-কর্মে সহায়তা করেছেন এবং কয়েকটি রচনার বঙ্গানুবাদ করেছেন। গ্রন্থ-সম্পাদন, পরিমার্জন ও মুদ্রণসৌকর্য-সাধনে বিশেষ-ভাবে সহায়তা করেছেন গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক ও শ্রীসুবিমল লাহিড়ী।

বিষয়সূচী

রচনা-সংকলন : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রসূচী

প্রতিমাদেবী রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সি. এফ. অ্যাণ্ডরুজ

আশীর্বাদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই আমি একমনে সঁপিলাম তাঁরে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
যখনি আমারি ব'লে ভাবি তোমাদের
মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-ফাঁদের।

সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ।
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে,
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই ;
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন ১৩২১
রাত্রি

কল্যাণীয় রথীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধ্যপথে জীবনের মধ্যদিনে
উত্তরিলে আজি ; এই পথ নিয়েছিলে চিনে,
সাড়া পেয়েছিলে তব প্রাণে
দূরগামী দুর্গমের স্পর্ধিত আহ্বানে
ছিল যবে প্রথম যৌবন।
সেদিন ভোজের পাত্রে রাখ নি ভোগের আয়োজন,
ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।
অন্তরেতে দিনে দিনে হয়েছে সঞ্চিত
পূজার নৈবেদ্য-অবশেষ,
যে পূজায় তব দেশ
তোমারে দিয়েছে দেখা দরিদ্র দেবতা রূপে
আসীন ধূলির স্তূপে
অসম্মানে অবজ্ঞায়।
সঁপেছ জীবন তব অর্ঘ্য তাঁর পায়ের তলায়।
তপস্যার ফল তব প্রতিদিন ছিলে সমর্পিতে
আমারি খ্যাতিতে।
তোমার সকল চিত্তে,
সব বিত্তে
ভবিষ্যের অভিমুখে পথ দিতেছিলে মেলে,
তার লাগি যশ না'ই পেলে।

কর্মের যেখানে উচ্চদাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে একপাশে।
মানবের ইতিহাসে
যে-সকল খ্যাতনাম বহিতেছে উজ্জ্বল অক্ষর
তাদের অজানা লিপিকর
আপনার অকীর্তিত জীবনের হোমাগ্নিশিখায়
লাগায় রঙের দীপ্তি সে নাম-লিখায়।
প্রগল্‌ভ জনতা যত দেয় পুরস্কার
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান নিভৃতে নীরব বিধাতার।

মন্দগতি গেছে কত দিন
মন্থর দৈন্যের ভারে কৃচ্ছ্রশীর্ণ বিশ্রামবিহীন।
অকরুণ সংসারের দুঃখ তাপ শোক
যাত্রাপথে ছায়াচ্ছন্ন করেছে আলোক
বারংবার,
অকারণ প্রতিকূলতার
পেয়েছ আঘাত
অকস্মাৎ;
দুর্যোগের কুটিল ভ্রূকুটি ক্ষণে ক্ষণে
অবসাদ ঘনায়েছে কর্মের লগনে।
ভাগ্যের করুণা কাজ করে
নির্মম ঔদাস্যবেশে আকাঙ্ক্ষার দূর অগোচরে,
বিধাতার প্রত্যাশিত বর
প্রতিক্ষণে সেবা চাহে, দেয় শুধু সন্দিগ্ধ উত্তর।

সফল ভাবীর জাগরণ

ভূমিগর্ভে গুপ্ত থাকে, বাহিরের আকাশে যখন
আশা আর নৈরাশ্যের উদ্‌বিগ্ন পর্যায়
খর রৌদ্রে কভু শাপ দেয়,
আশা দেয় মেঘের সংকেতে।
অবশেষে অঙ্কুরের দেখা মেলে কৃষিদীর্ণ ক্ষেতে,
প্রসন্ন অঘ্রানে
সোনার আশ্বাস লাগে ধানে।
প্রৌঢ় সেই শরতের সফল দিনের জয়ধ্বনি
অন্তর-আকাশ তব ভরুক আপনি
ঊর্ধ্ব হতে
আনন্দের স্রোতে।
সম্পূর্ণ করিবে তারে বন্ধুদের বাহিরের দান
স্নেহের সম্মান।
বিদায়প্রহরে রবি দিনান্তের অস্তনত করে
রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের ক্ষেত্র-'পরে

শান্তিনিকেতন
১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালীমোহন ঘোষ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চাশ বছর বয়স -পূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তাঁর সহকর্মী, বন্ধু ও ছাত্রছাত্রীরূপে আমরা আজ এখানে একত্র হয়েছি তাঁকে শ্রদ্ধা প্রীতি ও শুভ ইচ্ছা নিবেদন করতে।

পূজ্যপাদ গুরুদেব যখন শান্তিনিকেতনে তাঁর বিদ্যায়তন রচনা করে দেশের সামনে শিক্ষার নূতন আদর্শ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, রথীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রথম ছাত্রদের অন্যতম। তখন পুত্রের মনে যে-সকল উচ্চ আদর্শের বীজ বপন করেছিলেন আজ তাঁর জীবনচর্যায় সেগুলি পূর্ণবিকশিত। সেই-সব মহৎ আদর্শ তাঁর জীবনের সকল কর্মে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং এই-সকল কর্মের চূড়ান্ত বিকাশ আমাদের এই প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গুরুদেবের গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতনে। দেশের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু জনসাধারণ, যারা দু বেলা দু মুঠো পেট ভরে খেতে পায় না— তাদের প্রতি গুরুদেবের গভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে শ্রীনিকেতনে।

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর গুরুদেব শিলাইদহ অঞ্চলে পল্লী-পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যায় সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য ও তাঁর পল্লী-সংগঠনের আদর্শ সুষ্ঠুরূপে রূপায়িত করার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞানের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বদেশে ফিরে এসে রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহ অঞ্চলে একটি আদর্শ কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করে গ্রামের লোককে উন্নত ধরনের চাষের কাজ

হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার প্রযত্ন করেন। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর অতিক্রান্ত, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ক্রমশ বড়ো হতে হতে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গুরুদেব এবার ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিচালনার জন্য রথীন্দ্রনাথের সহযোগিতা চাইলেন। স্বাভাবিক সংকোচবশত রথীন্দ্রনাথ প্রথমে কিঞ্চিৎ ইতস্তত করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন বাদেই পিতার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিজেকে নিবেদন করতে সংকল্প জ্ঞাপন করলেন। আমার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে সেই একটি দিনের কথা, যেদিন গুরুদেব উদ্‌ভাসিত মুখে আমাদের কয়েকজনকে ডেকে বললেন: রথী যে নিজের থেকেই প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে চেয়েছে, আমার পক্ষে এর চেয়ে সুখের কথা আর কিছু হতে পারে না। আমি কখনো তার উপর চাপ দিতে চাই নি, সে যে নিজের থেকে এগিয়ে এসেছে এতে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

রথীন্দ্রনাথ নীরব কর্মী। লোকচক্ষুর অগোচরে গভীর অধ্যবসায়ে ও নিঃস্বার্থভাবে তিনি বিশ্বভারতীর ভাবরূপ কীভাবে বাস্তবায়িত করার প্রযত্ন করেছেন, সে-কথা আমরা, যে-সব সহকর্মীরা তাঁর নিকটসান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করেছি— সকলেই খুব ভালো-ভাবে অবগত আছি। শান্তিনিকেতন যখন বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হল, দেখেছি তিনি দৈনিক আঠারো ঘণ্টা এক নাগাড়ে পরিশ্রম করেছেন বিশ্বভারতীর বহুবিচিত্র কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য। প্রস্তুতিপর্বে নূতন প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার কাজ থেকে শুরু করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ একেবারে সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজ তাঁকে প্রায় একা হাতেই সামলাতে হয়েছিল। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। রোগশয্যায় তিনি যখন যন্ত্রণায় কাতর, তখনও, আমরা কেউ যদি তাঁর শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছি, তিনি তাঁর শরীর

স্বাস্থ্যের কথা ঘুণাক্ষরে তুলতে চাইতেন না। বরঞ্চ বার বার জানতে চেয়েছেন নূতন প্রতিষ্ঠানের নানা সমস্যার কথা এবং কীভাবে সেগুলির সমাধান করা যায় সে প্রসঙ্গ।

বিশ্বভারতী তাঁর জীবনের সাধনার ধন। বিশ্বভারতীর সেবায় তিনি পরিপূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করেছেন বলে আজ তিনি তাঁর সকল সহকর্মীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করব—

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রখ্যাত নেতা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একবার গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে বলেছিলেন, তাঁর বিশেষ ইচ্ছা রথীন্দ্রনাথ যেন ভারতীয় লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য হন। রাজশাহী ডিভিসন থেকে যাতে রথীন্দ্রনাথ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারেন, সে-ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন দেশবন্ধু। গুরুদেব দেশবন্ধুর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেও, রথীন্দ্রনাথ সদস্য হতে রাজি হতে পারেন নি। সে-সময় আমি কলকাতায় ছিলাম। রথীন্দ্রনাথকে আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করি দেশবন্ধুর প্রস্তাব নাকচ না করার। আমার অনুরোধ উপরোধ শুনে রথীন্দ্র-নাথ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন : আমার সমস্ত শক্তি ও সময় বিশ্বভারতীর কাজে উৎসর্গ করতে আমি বদ্ধপরিকর। অন্য কাজে হাত লাগাবার মতো উদ্‌বৃত্ত সময় তো আমার একেবারেই নেই। অ্যাসেম্বলির সদস্য হতে পারলে আমার সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু তার লোভে তো আমি বিশ্বভারতীর কাজে অবহেলা করতে পারি না।

বিশ্বভারতীর মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিচালনার গুরু দায়িত্ব থেকে রথীন্দ্রনাথ গুরুদেবকে বহুলাংশে মুক্ত করতে পেরেছেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি গুরুদেবের আদর্শ অনুসরণ করার

জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস করেছেন। বিশ্বভারতী গড়ে তোলার কাজে রথীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক সহায়তা ও সহযোগিতা গুরুদেবের পক্ষে কী গভীর সন্তোষ ও ভরসার উৎস হয়েছে— সে-কথা আমরা সকলেই জানি। সেইজন্যই তো আমরা সকল কাজের কাজী রথীন্দ্রনাথকে আমাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছি। তাঁর এই পঞ্চাশ বছর বয়সের পূর্তি উপলক্ষে আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা তাঁর প্রতি নিবেদন করছি। ঈশ্বরের কাছে আমাদের একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করেন, যেন তাঁর জীবৎকালেই তিনি দেখে যেতে পারেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানে তাঁর পূজ্যপাদ পিতার আদর্শ সফল ও সার্থক হয়েছে।

রথীন্দ্রনাথ

লেনার্ড এলম্‌হার্স্ট

মহা প্রতিভাবান পিতার পুত্রের পক্ষে সহজ জীবনযাত্রা কদাচই সম্ভব হয়ে থাকে। আর, রথীন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই মাতৃহীন হয়েছিলেন সে কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে। বাল্যে ও কৈশোরে জীবন সম্বন্ধে যে স্বপ্ন যে আশা-আকাঙ্ক্ষাই তাঁর থাকুক, পিতার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবার চেষ্টাতেই চিরদিন তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে। রথীদাকে আমরা যারা জানবার সুযোগ পেয়েছি তারা দেখেছি, নিজের অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষাকে একধারে সরিয়ে রেখে তিনি তাঁর কবি পিতার নব নব পরিকল্পনাকে রূপ দিতে ব্যস্ত।

অভিজাতসুলভ তাঁর শান্ত মুখশ্রীর অন্তরালে ছিল শিল্পীর হৃদয়— কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ করবার সময়-সুযোগ তিনি কদাচিৎ পেয়েছেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা, বিশ্বভারতীর নানা আর্থিক ও আইনগত প্রশ্নের আলোচনায় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে— তাঁর স্টুডিয়ো, তাঁর ছোটো কারখানা-ঘর, বা তাঁর উদ্যান-চর্চার কাজে দেবার সময় তিনি সামান্যই পেয়েছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যরূপে তাঁর গুরুতর শ্রম ও চিন্তার বিবরণ ইতিমধ্যেই ধূলিধূসর ফাইলে চাপা পড়েছে— তাঁর দু-চারজন পুরাতন বন্ধুই কেবল সে কথা স্মরণ রাখবেন। আর, এর মধ্যে তাঁর শিল্পীমন কখনো কখনো ছাড়া পেয়েছে— শিল্পী রূপেই হয়তো তাঁর স্মৃতি সঞ্জীবিত থাকবে।

জাপানের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এক চা-পান উৎসবে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছেন; অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে ব্যবহৃত

পাত্রগুলির বিশেষ সৌন্দর্য কোথায়, সেগুলির ইতিহাস কী, তা রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, চীনা কবি সু-সী-মো ও আমরা অন্য যারা উপস্থিত আছি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝানো হচ্ছে। সর্বশেষে অনুষ্ঠানপতি বাঁশের তৈরি সুগঠিত একটি লম্বা চামচের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যেটি দিয়ে চায়ের পাত্রে চায়ের পাতা তুলে দেওয়া হচ্ছিল— 'প্রায় তিনশো বৎসর আগে জাপানি সেনা-বাহিনীর এক অধিনায়ক এটি তৈরি করেছিলেন। সৈন্যাধিনায়ক রূপে তিনি কৃতকর্মাই ছিলেন, কিন্তু সে-সব বিবরণ কারো আজ আর মনে নেই, তিনি নিজের হাতে যে বাঁশের চামচ তৈরি করতেন সেগুলির সুন্দর গড়নের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। এ চামচ তারই একটি।'

রথীন্দ্রনাথ নিজের হাতে কাঠের কাজ করতে ভালোবাসতেন। তিনি একজন কুশলী কারুশিল্পী ছিলেন— তাঁর আঁকা যাঁরা দেখেছেন, তাঁর রচনা পড়েছেন, তাঁরা তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি, তাঁর প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করবেন। উত্তরায়ণের উদ্যানও তাঁর একটি বিশেষ সৃষ্টি।

তাঁকে ঘিরে সেকালের অনেক স্মৃতি আজ মনে পড়ছে— নানা উৎসব-অনুষ্ঠান, টেনিস খেলা, দিনেন্দ্রনাথের চায়ের আসর, কলা-ভবনের ছাত্রদের বনভোজনে আগুন পোহানো, চন্দ্রালোকিত রজনীতে ডুমকা পাহাড়ে অভিযান— সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ে শ্রীনিকেতনকে প্রথম থেকে গড়ে তুলবার দিনে সমিতিতে আলাপ-আলোচনা। এক সন্ধ্যায় পিঠাপুরমের সুবিখ্যাত বীণাবাদকের বাজনা রথীদা সম্পূর্ণ মনপ্রাণ দিয়ে কী অভিনিবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন, সে কথা মনে পড়ে। মাতৃভাষায় তাঁর দক্ষতার পরিমাপের বিষয় মন্তব্য করতে আমি অধিকারী নই ; কিন্তু এ বিষয়ে আমার সংশয় নেই যে, চর্চা করলে ইংরেজিতে লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার

সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ছাত্র রূপে পিতার কাছে দীর্ঘদিনের শিক্ষায় তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার সদ্‌ব্যবহার করতে তিনি শিখেছিলেন। আমাদের দুঃখ রয়ে গেল যে তাঁর বিচিত্র ক্ষমতা, ঐকান্তিক নম্রতাবশত যার আড়ম্বর তিনি আমাদের কাছে কখনো করেন নি, তার পূর্ণ ব্যবহারের সময় ও অবসর তিনি পেলেন না।

রথীন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম

স্টেলা ক্রামরিশ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন রূপকার। আধুনিক ভারতের শিল্পজগতে তিনি কারুশিল্পের ঐতিহ্যগৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মানসমণ্ডলের গভীরে সঞ্চিত আছে নানা সামগ্রী দিয়ে রচিত বিচিত্র গঠনের সুষম সব রূপকল্প। নানা জাতের কাঠখোদাই করে তিনি তাঁর এই-সব পরিকল্পিত রূপ প্রকাশ করতে চেয়েছেন। নানা জাতের ফুল ফুলদানিতে বসিয়ে জলরঙে তাদের পোর্ট্রেট এঁকেছেন। শিল্পী হিসেবে তিনি কোনো বিশেষ শিল্পীগোষ্ঠীর সামিল হতে চান নি, কোনো গুরুর কাছে তালিমও নেন নি ; শিল্পের প্রাথমিক রীতিনীতি সহজ সরল ভাবে অনুসরণ করেছেন। ছবিতে, হাতের কাজে, রঙে ও উপকরণে হাতের সবটুকু নিপুণতা ও মনের সমস্ত অনুরাগ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন।

তাঁর রচিত শিল্পসামগ্রী আবাসগৃহের আসবাব ও পরিসজ্জা রূপে নিত্যদর্শনীয় ও নিত্যব্যরহার্য। কৌটো, সিগারেট কেস, ট্রে, স্ট্যাণ্ড— প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী এমন সুন্দর ও সুষম পরিমাপে প্রস্তুত যে সেগুলি স্বচ্ছন্দে দৈনন্দিন ব্যবহারে উপযোগ করা যায়। আবলুশ কাঠ থেকে শুরু করে গাম্ভার প্রভৃতি বনজ কাঠও তিনি সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে খোদাই করেছেন। দেখলে মনে হয়, সোজাসুজি সমতল রচনায় তিনি যেমন দক্ষ, তেমনি পারদর্শী আঁকাবাঁকা অলংকরণ রচনাতেও। এ রকম নিপুণতা সচরাচর দেখা যায় ভারতীয় স্থপতিদের পুরুষানুক্রমিক পারদর্শিতায়। কিন্তু ভারতীয় স্থাপত্যের বিশেষ কোনো শিল্প-নিদর্শনের অনুকরণ বা পুনরাবর্তন করার আগ্রহ থেকে

তিনি তাঁর এই-সব রূপকলা আহরণ করতে চান নি। ভারতীয় স্থাপত্যের পরম্পরাগত ঐতিহ্য যেন পুরুষানুক্রমিক স্মৃতি রূপে তাঁর শিল্পচেতনাকে এমনভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছে যে তাঁর রচিত শিল্পসম্ভারে সেই ঐতিহ্যগত সংস্থাপন ও বিন্যাসের বিশিষ্টতা যেন আপনা থেকে ফুটে উঠেছে। এই-সব নিদর্শনের মধ্যে সাদামাটা র‍্যাঁদায় ঘষা কাঠ যেমন আছে, তেমনি আছে সযত্নে-পালিশ-করা মূল্যবান পাথরের মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল কাঠের টুক্‌রো। কতকগুলি শিল্পসামগ্রী আছে কাঠের টুক্‌রো দিয়ে মিনা করা। কয়েকটিতে আছে প্রতিমা দেবী কিংবা সুরেন্দ্রনাথ করের চিত্রিত ডিজাইন। এগুলি এই-সব সামগ্রীর সৌষ্ঠববৃদ্ধিতে ও অলংকরণে সহায়ক হয়েছে।

জীবনযাত্রার শিল্প বহুবিচিত্র হতে পারে। তার রূপকল্প পরিবেশের পশ্চাদ্‌পটের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারজীবন ও কর্মজীবনের পটভূমি রচনা করেছে শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী। সেখানেই তাঁর আশ্রয় ও আবাস রচনা করে দিয়েছেন তাঁর পিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এই আবাসের নানাপ্রকার আসন ও বস্তুসামগ্রী সংরক্ষণের আধার, ফুলদানি ও অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণগুলি যাতে পরস্পরের সঙ্গে সংগতি রেখে সংস্থাপিত হয়— নয়নরঞ্জন অথচ নিত্যব্যবহারের উপযোগী হয়— এগুলির প্রতি লক্ষ রেখে রথীন্দ্রনাথের তাবৎ কারুশিল্প রচিত। শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা শিল্পিত করে তোলাটাই যেন তাঁর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।

তিনি ফুলের ছবি এঁকেছেন নানারকম মাধ্যমে, তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির বিশিষ্টতাটুকু এই যে, তাঁর এই-সব ছবিতে তিনি যেন ফুলের চেহারাটুকু গড়েছেন রঙ দিয়ে। রঙেই এই ফুলগুলি প্রাণিত ও স্পন্দিত। এই প্রাণের স্পন্দন দেখা যায় কেবল ফুলের আকারেই নয়, অপিচ পশ্চাদ্‌ভূমিতেও। ফুল তিনি চিনতেন

প্রাণতত্ত্বের মনোযোগী ছাত্ররূপে, ফুল তিনি জানতেন ফুল ভালো-বাসতেন বলে। উপরন্তু, উত্তরায়ণ-বাড়ির উদ্যান-পরিকল্পনা ও রচনা তিনি করেছিলেন একপ্রকার একা হাতেই। পৃথিবীর নানা দিক ও দেশ থেকে তিনি গাছপালা সংগ্রহ করে এনেছিলেন এই উদ্যানের শ্রী-সৌন্দর্য সমৃদ্ধ করতে। প্রখ্যাত সব উদ্যান থেকে যেমন উঁচু গাছের চারা ও কলম মোটা দামে কিনে এনেছিলেন, তেমনি সযত্নে উদ্ধার করে এনেছিলেন ভারতীয় অরণ্যের লতাগুল্ম থেকে অনামা অথচ অদ্ভুত সুন্দর সব নমুনা— সেখানকার মাটি সুদ্ধ। উত্তরায়ণের বাগানে তাঁর সেবা ও পরিচর্যায় সেই-সব বাহারি ও পোশাকি গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে এই-সব অরণ্যজাত অনামিক লতাগুল্ম পুষ্পিত পল্লবিত হয়ে উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করেছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর যে-জ্ঞান, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও অনুরাগ। তাঁর আঁকা ছবিতে এই-সব গাছপালা-ফুলফলের জন্য তিনি এমন পরিবেশ ও অবকাশ রচনা করেছেন যাতে তাদের বর্ণসুষমা, রূপ ও সুগন্ধ যেন দর্শকের ইন্দ্রিয়গোচর হতে পারে।

রথীন্দ্র-স্মৃতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯০৯ সালে নভেম্বর মাসে বিদ্যালয় খুলেছে পূজাবকাশের পর— আমি সদ্য এসেছি। শুনলাম কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে এসেছেন ছুটির পর তাঁর পুরাতন শিক্ষক ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এই তাঁকে প্রথম দেখলাম। রথীন্দ্রনাথ আমার থেকে চার বৎসরের বড়ো। সুতরাং পরিচয় ও সখ্যতা হতে সময় লাগল না। সেই ১৯১০ সাল থেকে ১৯৬০ সালে এখান থেকে শেষ বিদায় গ্রহণের দিন পর্যন্ত— দীর্ঘকাল তাঁকে নানা ভাবে জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল।

কলকাতায় রথীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' ক্লাব গড়লেন জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে, তিনি আছেন অন্তরালে কর্ণধার রূপে। আমি তখন থাকি কলকাতায়— রোজ যাই সেখানে সকাল-বিকাল। রথীন্দ্রনাথকে কর্মীরূপে দেখবার সুযোগ পেলাম। 'বিচিত্রা' ক্লাব এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার কথা বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। এই সময়ের ক্ষুদ্র একটি ঘটনা মনে পড়ছে— যে-ঘটনার মধ্য থেকে তাঁর মৌল ভদ্রতার নিদর্শন পরিস্ফুট হয়েছে। কবির এক জন্মোৎসবে ঠাকুরবাড়ির কোনো আত্মীয়দের ব্যবহারে আমরা কয়েকজন নিমন্ত্রিত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। রথীন্দ্রনাথ সেটি জানতে পেরে তখনই আমাদের ক্ষোভ শান্ত করলেন। তার পরদিন প্রাতে কলকাতার এক গলিতে আমাদের ক্ষুদ্র বাসায় রথীন্দ্রনাথ হঠাৎ মোটর নিয়ে হাজির হলেন— গত রাত্রের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে চাইলেন মার্জনা। আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করছেন, রথীন্দ্রনাথ আছেন পিতার পাশে। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয় এবং ১৯১৮ সালের ২২ ডিসেম্বর (৮ই পৌষ) শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র ভিত্তি স্থাপিত হল। এই নূতন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য রথীন্দ্রনাথ এলেন শান্তিনিকেতনে। সেই-যে এসে বিশ্বভারতীর দায়িত্ব নিলেন, তার পর ১৯৫৩ পর্যন্ত একাদিক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার উৎসরূপে থেকে সেবা করে যান। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী ভারত-সরকারের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। রথীন্দ্রনাথ হন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার বা উপাচার্য। 'বিশ্বভারতী'র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতিলাভের পশ্চাতে রথীন্দ্রনাথের যে বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টা ছিল সে-কথা আজ অজ্ঞাত।

১৯১৯ সালে জুলাই মাস থেকে বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগের পঠন-পাঠন শুরু হয় স্থানীয় কর্মীবৃন্দ ও অধিবাসীদের নিয়ে। অনেকেই অধ্যাপনা করতেন। রথীন্দ্রনাথ Genetics বা সৌজাত্যবিদ্যা পড়াবার ভার নিলেন। এইখানে তাঁকে দেখলাম শিক্ষক রূপে। এই জটিল বিষয়কে সরস করে বোঝাবার জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়ে আসতেন তিনি, experiment দেখিয়ে আমাদের মুগ্ধ করতেন।

রথীন্দ্রনাথের মেজাজটা ছিল বিজ্ঞানীর, মনটা ছিল আর্টিস্ট বা ভাবুকের। এই দোটানার মধ্যে তাঁর জীবন যায় কেটে। শিল্পী রথীন্দ্রনাথকে দেখা যায় উত্তরায়ণ-অট্টালিকা ও উদ্যান রচনায়। এখানেও বিজ্ঞানীকে পাই যখন দেখি তাঁর উদ্যানের মাঝে গুহাঘরে যাবার পথে লতাবিতান। এই লতা সাধারণ বল্লরী নয়— এগুলি আম সপেটা পেয়ারার গাছ। যত্নের সঙ্গে ডালগুলিকে 'লতানে' করেছেন বেঁধে-বেঁধে। এই পরীক্ষা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন একটি আমগাছ নিয়ে; রথীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে তার পরীক্ষা করেন।

তাঁর উদ্যান ছিল দেখবার মতো। ভিতরের দিকে কত ভাবে কত গাছ রোপণ করেছিলেন— ক্ষুদ্র হ্রদ, তার মাঝে পথ। বাড়ির বাইরে ছিল তাঁর গোলাপ-বাগান— কত জায়গা থেকে নানা বর্ণের, নানা রূপের গোলাপ। জানি না, আজ সেই শিল্পীমনের দরদ নিয়ে কেউ তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কি না। হয়তো পাসকরা মালী, উদ্যান-বিজ্ঞানী রুটিন মাফিক কাজ করেন ; হয়তো গাছপালার যত্নও হয়— কিন্তু তাদের মূক ভাষা কি তাঁরা শুনতে পান ?

রথীন্দ্রনাথ কারুশিল্পী ছিলেন। দারুশিল্পের যে-নমুনা তিনি বহুযত্নে বহুকাল ধরে করেছিলেন, তা আজ কোথায় জানি না। বিরাট কাষ্ঠফলকে নানাবর্ণের কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে প্রান্তরের যে চিত্র রচনা করেছিলেন তা তুলনাহীন সৃষ্টি। চিত্রাঙ্কনে— বিশেষভাবে নানা ফুলের ছবি আঁকায়— তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই-সব চিত্রাঙ্কনে বিজ্ঞান বিকৃত হয় নি।

বিশ্বভারতীকে সুন্দর করে গড়বেন— এই ছিল রথীন্দ্রনাথের ইচ্ছা। কিন্তু তা পূরণ হয় নি। উত্তরায়ণ-অট্টালিকা ও তার পরিবেশ রচনায় তাঁর শিল্পীসত্তার পরিচয়ের কথা পূর্বে বলেছি। উত্তরায়ণ-অট্টালিকা নির্মাণকে construction বলব না— এটা হল creation। কারণ বাড়িটা ক্রমে-ক্রমে গড়ে উঠেছে— রূপ থেকে রূপান্তরিত হয়ে। এই কাজে তাঁর দক্ষিণহস্ত ছিলেন চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর— যিনি বিশ্বভারতীতে স্থাপত্যসৃষ্টির সুযোগ লাভ করে ভারতে স্থাপত্যবিশারদ রূপে সম্মান অর্জন করেন। সহকর্মীরূপে একটি sweet reasonableness দিয়ে সকলকে কর্মে ব্রতী রাখতেন রথীন্দ্রনাথ ; 'মনিবগিরি' করতে কখনো দেখি নি তাঁকে। কর্মক্ষেত্রে কতবার তাঁর সঙ্গে আমার সংঘাত বেধেছে, কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু সে-সব মনে রেখে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অনেক সময়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কাছে এসে কাঁধে হাত

রেখে বলেছেন— 'প্রভাত, মনে কিছু কোরো না।'— সব মিটে গেল এক-কথায়।

রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার স্পষ্ট ব্যবস্থা বিশ্বভারতীতে না হয়ে থাকলেও বিশ্বভারতীর একটি সদন বিশেষভাবে তাঁর স্মৃতি অদৃশ্যে বহন করছে সে কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি— সেটি রবীন্দ্রসদন।[১] আমাদের দেশে বরেণ্য লেখকদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতির ধারণা নেই; রবীন্দ্র-পূর্ব স্মরণীয় লেখকদের পাণ্ডুলিপি চিঠিপত্র সামান্যই পাওয়া যায়। রথীন্দ্রনাথ যৌবনকাল থেকেই পিতার পাণ্ডুলিপি চিঠিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহে তাঁর কর্মময় জীবনের অবকাশে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন যখন এ-সবের চল ছিল না। কবির বন্ধু ও অনুরাগী, যাঁরা তাঁর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের অনেকের কাছ থেকেও পরে অনেক চেষ্টা করে সেগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এক পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র কপি করে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে বহু চিঠি রক্ষা পেয়েছে এবং অনেকটা তারই ফলে চিঠিপত্র গ্রন্থমালা প্রকাশিত হতে পারছে। তাঁর নির্দেশেই রবীন্দ্রনাথের রচনা একসময় থেকে কপি হয়ে প্রেসে যেতে আরম্ভ করে, যার ফলে এক কালের বহু পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হয়ে আজ বিচিত্র গবেষণার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমার যৌবনকালের কথা মনে আছে, পৃথিবীর যেখানে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যত বিবরণ প্রকাশিত হত রথীন্দ্রনাথ তার কর্তিকা সংগ্রহ ও রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করে দেন; এগুলি বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হত— এগুলি ছিল বলে 'রবীন্দ্র-জীবনী'র অনেক

১ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রূপে নামকরণ হয়েছে 'রবীন্দ্রভবন'।

অংশ লেখা সহজ হয়েছিল। এ যখনকার কথা তখন রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের নিদারুণ অর্থকষ্টের কাল— তার মধ্যেও রথীন্দ্রনাথ এ-সকল ব্যবস্থা করতে অবহিত ছিলেন। তার পর রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরে পিতার স্মরণে রবীন্দ্র-ভবন সংগঠনে রথীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছিলেন এবং বিশ্বভারতীর সেই আর্থিক সংকটের মধ্যে যতটা সম্ভব তাঁর উদ্যোগ সফল হয়েছিল। তাঁর সারাজীবনের পাণ্ডুলিপি ফোটোগ্রাফ চিত্রসংগ্রহ তিনি এখানে দান করেন, পরে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ও অন্যান্যের অনুরূপ পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ ইত্যাদির দানে তা পুষ্ট হয়। ভবিষ্যতে যদি রবীন্দ্র-ভবন রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাথ্যিক গবেষণার প্রধান কেন্দ্র হতে পারে তবে যেন আমরা স্মরণ রাখি যে রথীন্দ্রনাথই এর মূলে ; এই ভবনের সার্থকতার দ্বারাই অলক্ষ্যে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা হবে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুলিনবিহারী সেন

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের বংশধারা লুপ্ত হল, অনেকের কাছে এই কথাই বিশেষভাবে শোকাবহ বলে বোধ হয়েছে; কিন্তু পরবর্তী কালের স্মৃতির 'পরে নিজগুণেও যে তাঁর কিছু দাবি ছিল সে কথা একরকম নেপথ্যেই রয়ে গেল। বস্তুত তিনি নিজেই, চেষ্টা করে নয় স্বভাববশেই, যে আত্ম-আবরণের পথে সারাজীবন চলেছিলেন তা তাঁর স্বীয় কৃতিত্ব সর্বসমক্ষে প্রকাশ করবার পথ নয়। পিতার জীবনব্রতের যথাসাধ্য আনুকূল্যের চেষ্টাকে তিনি তাঁর প্রধানতম কর্তব্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন— সে কর্তব্যসাধন তিনি সর্বদা নির্ভুল বিচারেই করতে পেরেছেন এমন কথা বলা চলে না, কার সম্বন্ধেই বা সে কথা বলা যায়— কিন্তু সেই কাজে তিনি যে তাঁর অবসর ও চিন্তা একরকম সম্পূর্ণই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ছাত্র-জীবনের অবসানকাল থেকে, এ কথা স্বীকার করতে হবে। ভাষা-ব্যবহারে তাঁর যতটুকু অধিকার ছিল তার সম্পূর্ণ চর্চা করবার অবসর তিনি হাতে রাখেন নি; শিল্পকারুর যে-চর্চা করেছেন তা নিরহংকারভাবে লোকলোচনের অন্তরালেই করেছেন। ফলে এ কথা অনেকেরই জানা নেই যে, বর্তমানে এদেশে যে-সব শিল্পকারু প্রচলিত তার কোনো-কোনোটির প্রবর্তক তিনিই; যে-শিল্পবোধ বংশানুক্রমে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল তা শ্রীনিকেতনের বিবিধ কারুপণ্যের সুষমা ও বৈচিত্র্য- সাধনে, শান্তিনিকেতনের শ্রী-বিধানে নিয়োজিত হয়েছিল, এর মধ্যে তাঁর দান কতখানি তা আর স্বতন্ত্রভাবে চিনে নেবার উপায় ছিল না। বস্তুত প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত

কোনো স্বীকৃতিতে তাঁর তেমন আগ্রহও লক্ষ্য করা যায় নি। তিনি যশে বীতস্পৃহ উদাসীন পুরুষ ছিলেন না— কিন্তু তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা পিতা ও তাঁর স্থাপিত প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই পূর্ণতা লাভ করেছে। তার বাইরে কোনো ক্ষেত্রে নিজের স্বাক্ষর চিহ্নিত করতে তিনি কখনো ব্যগ্র হন নি। নয়তো, তাঁর পিতার কীর্তির কাছে নিষ্প্রভ হলেও, সে স্বাক্ষর সম্পূর্ণই জলের লিখন না'ও হতে পারত।

বাংলাদেশে আজ একটি প্রবল তর্ক, বাংলায় বিজ্ঞান শেখানো যেতে পারে কিনা। রথীন্দ্রনাথ যদি অভিনিবেশ সহকারে উদ্যোগ করতেন তবে তাঁর অধীত বিজ্ঞানবিষয়কে বাংলাভাষায় বহুজনবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করতে পারতেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ক্ষমতার উজ্জ্বল দুটি প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন— 'প্রাণতত্ত্ব' (১৩৪৮) ও 'অভিব্যক্তি' (১৩৫২)। এ দুটি বইই তাঁর পিতার মৃত্যুর পর প্রকাশিত, বোধ করি আত্মপ্রকাশের দ্বিধাকে এইকালে তিনি একটু-খানি কাটিয়ে উঠেছিলেন। গুণগ্রাহী ইউসুফ মেহেরালি ও বিশ্ব-ভারতী কোয়ার্টার্লির সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনির একান্ত আগ্রহে তিনি ইংরেজিতে *On the Edges of Time* আখ্যায় যে আত্ম-জীবনস্মৃতি রচনা করেছিলেন, আত্মকে অন্তরালে রেখে জীবনস্মৃতি রচনার তা একটি পরম দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই প্রামাণিক গ্রন্থে লেখকের উপস্থিতি পাঠকের সহজে লক্ষ্যগোচরই হয় না, যেন রবীন্দ্রপরিবেশে তিনি সম্পূর্ণই গৌণ। নিরাভরণ সহজ ভাষায়, এই গ্রন্থ অনুসরণে, নূতন উপকরণ যোগ করে বাংলায় 'পিতৃস্মৃতি' নামে তাঁর গ্রন্থটিতেও আত্মকথার সূত্রে প্রধানত রবীন্দ্রকথাই বিবৃত হয়েছে।

কর্ম বা অন্য সূত্রে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয়ও ঘটেছিল আশা করি তাঁরা অন্তত এ কথা স্বীকার করবেন যে সৌজন্যে তাঁর সমতুল্য মানুষ বিরলদর্শন। আরো ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন লোকব্যবহারে তাঁর

গভীর ধৈর্য। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন মত পোষণ ও প্রকাশ করবার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি অব্যাহত ছিল। শান্তিনিকেতনের কর্মপরিচালনায় রথীন্দ্রনাথকে কখনো কখনো সহকর্মীদের কঠিন সমালোচনার ভাজন হতে হয়েছে; অনেক ক্ষেত্রে এ-সকল সমালোচনার সংগত কারণ ছিল; তাঁর মতের প্রতিকূলতা কাজে বা কথায় যাঁরা করেছেন তাঁরা ব্যক্তিগত কারণে তা করেন নি, শান্তিনিকেতনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাবশতই তা করেছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে যা লক্ষ্য করবার বিষয় তা এই যে, কঠিন সমালোচনার ফলে মনে যতই পীড়া বোধ করে থাকুন, বাক্যে বা ব্যবহারে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। ধৈর্য তাঁকে রক্ষা করতে হয় নি, ধৈর্য তাঁর সহজাত ভূষণ ছিল।

মানুষের চরিত্রের এই-সকল গুণ জীবনান্তে কোনো প্রত্যক্ষ নিদর্শন রেখে যায় না; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এই সহজ সৌজন্য ও বিরল ধৈর্যের ফলভোগী যাঁরা হয়েছেন জীবনে নানা অভিজ্ঞতার দিনে, তাঁরা বারে বারে তাঁকে স্মরণ করবেন তিনি কোনো অবিস্মরণীয় সাহিত্য- বা শিল্প- কীর্তি না রেখে গেলেও।

২

যৌবনকালে জমিদারি তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করা অবধি রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পল্লীসংস্কারকর্মের যে উদ্যোগে ব্রতী হয়েছিলেন তার বিস্তারিত ইতিহাস সর্বজনবিদিত না হলেও, তিনি যে স্বদেশী যুগে পল্লীর উন্নতির প্রতি বিশেষভাবে দেশকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন এ কথা অনেকেই জানেন। অন্যত্র তেমন উৎসাহ লাভ না করে নিজের জমিদারিতেই তাঁর ধ্যানধারণাকে যথাসাধ্য রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন— পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রপ্রতিম সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও এই ব্রতে নিবিষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তাঁদের কৃষি গোপালন প্রভৃতি বিষয়ে

আধুনিক শিক্ষালাভ করতে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে জমিদারিতে পল্লীমণ্ডলী গঠন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-কল্পনার কিছু পরিচয় দিয়েছেন। পিতার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করবার বাসনায় রথীন্দ্রনাথ প্রথম-যৌবনেই কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তরুণবয়সে তাঁর জন্মদিনে লেখা একখানি চিঠিতে— চিঠিখানি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত, শ্রীযুক্ত প্রতিমা দেবীর দিনলিপি থেকে তাঁর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত—

পদ্মার উপর
১৩ অগ্রহায়ণ। সোমবার

ভাই নগেন,

কালিগ্রাম থেকে আমরা বোটে করেই আবার ফিরে এলুম। বাবাকে কাল গোয়ালন্দে নামিয়ে রেখে এলুম ; তিনি সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় চলে গেলেন কেননা পর্শু দিন তাঁকে সেখানে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। আমি এখন একলা পদ্মার উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছি।

'আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর।...
ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে ; অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি ; যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে ; ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটির ;...
গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠমগন

করিছে কৌতুকালাপ ;···

তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;

স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্মল বিস্তার ;'

কথাগুলো আমার না হলেও আজ দিনটা সত্যিই এমনি প্রসন্ন নির্মল অগ্রহায়ণের সুন্দর বাতাস সত্যিই মুখে চোখে এসে লেগে সব শীতল করে দিচ্ছে, আজ আবার আমার জন্মদিন, তাই বসে বসে অনেক কথা মনে হতে লাগল। এই কুড়ি বৎসরের সুখদুঃখের কথা ঠেকিয়ে রাখা গেল না। এই মাসটা এলেই সেই সব কথা মনে পড়তে থাকে। সাত বৎসর হল এই সময়েতেই মা আমাদের ছেড়ে যান। আবার শমীরও এই মাসেতে জন্ম ও মৃত্যু দিন। ভগবান আমাদের অদৃষ্টে আরও কি লিখেছেন কে জানে? বাবাকে যত দেখছি, ততই কষ্ট হচ্ছে— তিনি অবিশ্যি কিছু বলেন না— কিন্তু স্পষ্টই দেখছি তাঁর মনে আর কোনও সুখ নেই। আমার কষ্ট আরও বেশি হয় এই জন্যে যে, আমি তাঁকে সুখী করতে পারব এ বিশ্বাস আমার নেই। এখন থেকে নিজেকে যদি একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে পারি তা হলেই যা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারব একটু। আশা করি তুমিও এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবে। বৈষয়িক বিষয়ে পরামর্শ দেবার ঢের লোক আছে— কিন্তু ভিতরের কথায় সায় দেয়, ভাল কাজে সত্যিকার উৎসাহ দেয় এমন লোক খুব অল্পই। এবার শিলাইদহ পৌঁছলেই তো আমার যথার্থ কাজ আরম্ভ হবে। প্রথম কিছু মাস কাজ বুঝতেই যাবে। তার পরে আস্তে আস্তে চাষাদের উন্নতি করবার পথে অগ্রসর হতে পারব। শিলাইদহে থাকতে আমার খুব ভাল লাগে— তবে একলা থাকবার একটিমাত্র অসুবিধা যে, কেউ নেই যাঁর সঙ্গে সমান ভাবে কথা বলতে পারি, সেইজন্য আমাকে একটা library করতেই হবে। মনে করছি আমার মাসিক বৃত্তি থেকে, কিছু কিছু দিয়ে standard authorদের

works বছর দুইয়ের মধ্যে কিনে ফেলব। Living Age কাগজে *বিজ্ঞাপন দেখলুম, একটা দু ডলার মাসিক subscription-এ একটা* masterpiece series দিচ্ছে— সস্তা বলে বোধ হল।··· এক মাসের টাকা পাঠানো হয়ে গেছে— তুমি একখানা বই নমুনা আনিয়ে দেখে, তাদের আমার নামে পাঠিয়ে দিতে লিখে দিও। আর যদি অন্য কোথাও কারও Complete Works বা কোনও series সস্তায় বিক্রী হচ্ছে দেখ তো খোঁজ নিয়ে আমাকে জানিও।

Agricultural Libraryও আস্তে আস্তে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি। আমি ভরসা করছি— তুমি bulletins সমস্ত সংগ্রহ করছ —যেগুলো পাও তার মধ্যে বিশেষ interesting কিছু যদি থাকে তো আলাদা করে পাঠিয়ে দিও। আমার কাছে যা আসবে আমি যত্ন করে রাখব। Magazine পাঠাবার দরকার নেই। বিদ্যালয়ে কিছু আসে না— কিন্তু প্রবাসীর সঙ্কলন অংশের ভার বাবার হাতে পড়ায় যত exchange magazines আসে রামানন্দবাবু সব বাবাকে দেন— সঙ্কলন হয়ে গেলে সেগুলো বাবা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। বোধ হয় দেখেছ এখন প্রবাসীর খুব উন্নতি হয়েছে, ১০০ পাতা reading matter— দামও খুব কম রাখা হয়েছে। subscription আর কিছু বাড়াতে পারলেই বাইরের get-up ভাল করতে পারবেন ও লেখকদের উপযুক্ত বেতন দিতে পারবেন।···

আমি আপাততঃ চাষীদের মধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট industry স্থাপন করবার চেষ্টা করব মনে করছি। মুরগী ও হাঁসের ব্যবসাটা খুব সহজ হবে— সকলেই যদি দশটা বিশটা করে পাখি পোষে তা হলে ডিম ও পাখি সংগ্রহ করে আমি কলকাতায় পাঠাতে পারব ; বেশ যখন চলতে থাকবে তখন নিজে ছেড়ে দিয়ে চাষারাই যাতে co-operation করে সেটা চালায় তার চেষ্টা করব। প্রথমে তারা co-operation বুঝবে না, ক্রমশ একদিকে co-operative dairying,

beekeeping প্রভৃতি ও অন্যদিকে ডালা ঝুড়ি ছাতা প্রভৃতি তৈরি করার ব্যবসা introduce করতে হবে। ছোট ছোট cottage industry বিনা আমাদের দেশের চাষাদের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যা জমি আছে তা থেকে খোরাক পোষাক চলে না। এসব জায়গায় খুব কম চাষা আছে যার মহাজনের কাছে কিছু দেনা নেই। সবসুদ্ধ দেনা শোধ দেওয়া তাদের কোনও জন্মে সম্ভব হবে না। ধান ভানার জন্য thrashing machineও একটা কিনতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু তাহলে আবার একজন expert আনতে হয়। তোমার পক্ষে কি এটা শেখা সম্ভব হবে? সর্বদা দৃষ্টি রাখবে কোনও রকম ছোটখাট simple devices বা machine-এর খোঁজ পাও কিনা। আর একটা কথা মনে রেখো যদি ইতিমধ্যে কেউ ভারতবর্ষে ফিরে আসছেন খবর পাও তো তাঁর সঙ্গে California-র seedless orange-এর কিছু চারা পাঠাতে চেষ্টা কোরো। Sylhet-এ ব্রজেন্দ্রকিশোর-বাবুর মস্ত নেবুর বাগান আছে— সেখানে seedless নেবুর গাছ করা যায় কিনা দেখা কর্তব্য। আর আমাকে অল্প কিছু Sunn hemp, California fig, musk melon ও water melon-এর বীজ পাঠিও। আরও কি কি পাঠালে ভাল হয় পরে লিখব।··· রথী

পিতাকে সুখী করবার জন্য নিজেকে 'একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে', পিতার আরব্ধ কর্মের প্রতিষ্ঠানগত রূপ দিতে রথীন্দ্রনাথ যে যৌবনকাল থেকে জীবনের প্রায় প্রত্যন্তভাগ পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন সেজন্য লোকলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ না করলেও পিতার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন যার চেয়ে কাম্য পুরস্কার তাঁর পক্ষে আর কিছু ছিল না। রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তিতে রচিত সে কবিতা তেমনভাবে লোক-সমাজে প্রচারিত হয়নি, সেটি উদ্‌ধৃত করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি···।[১]

---

১ বর্তমান সংকলনে অন্যত্র মুদ্রিত।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রমদারঞ্জন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের কথা ও শান্তিনিকেতনের কথা বলতে গেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা নানা প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহু শোক পেয়েছিলেন, এবং স্বভাবতই একমাত্র জীবিত পুত্র রথীন্দ্রনাথকে খুব ভালোবাসতেন। রথীন্দ্রনাথও ছিলেন পিতৃভক্ত পুত্র। তুজনের পরস্পরের প্রতি গভীর ভালোবাসার বহু পরিচয় আমরা পেয়েছি। সব কাজে রবীন্দ্রনাথের প্রধান নির্ভর ছিল রথীন্দ্রনাথের উপর। জমিদারি-পরিচালনার দায়িত্ব পুত্রের উপর ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন। দেখেছি, শেষ বয়সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও রবীন্দ্রনাথ নিজ হাতে কোনো অর্থব্যয় করতেন না; তাঁর হাতে টাকাপয়সাও থাকত না, থাকার প্রয়োজনও হত না। ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ পুস্তকে পাঠক দেখে থাকবেন একবার কীভাবে জানি রবীন্দ্রনাথের হাতে ১৮টি টাকা আসে এবং তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবী প্রভৃতির সঙ্গে কী মজা করেন! বস্তুত রথীন্দ্রনাথই পিতার আরামের জন্য (এবং বললে বোধ হয় দোষ হবে না, পিতার খেয়াল-খুশির সাধ মেটাবার জন্য) মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করতেন।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের যোগ ছিল নাড়ীর যোগ। বাল্যে যৌবনে ও পরিণত বয়সে— অর্থাৎ জীবনের সকল পর্বেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ও অপর অল্প কয়েকটি বালক নিয়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা হয়। যৌবনে আমেরিকায় শিক্ষা সমাপ্ত হলে রথীন্দ্রনাথ দেশে ফেরেন এবং কিছু কাল পরে, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, রবীন্দ্রনাথ শান্তি-

নিকেতনের কাজের সঙ্গে রথীন্দ্রনাথকে যুক্ত করা স্থির করেন। পিতার আহ্বানে রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করেন। আশ্রমের উত্তরে পতিত জমিতে আজকের সুরম্য উত্তরায়ণ নির্মাণ করে এখানেই রথীন্দ্রনাথ স্থায়ীরূপে সপরিবারে বাস করতে আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে সুরু হয় আশ্রম-পরিচালনা-ব্যবস্থার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ। ১৯২১ সনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর তিনি বিশ্বভারতীর একজন প্রধান কর্মকর্তা হন। বিশ্বভারতীর সংসদ বা পরিচালক-সভা কর্তৃক রথীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বিশ্বভারতীর যুগ্ম-কর্মসচিব নিযুক্ত হন। পরে বহু বছর তিনিই একক কর্মসচিব হিসাবে বিশ্বভারতীর কর্ণধার হন, বিশ্বভারতীর পরিচালন-ব্যবস্থায় Founder President বা প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার ও দায়িত্বের অধিকারী ছিলেন। রথীন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুসারেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই দায়িত্ব পালন করতেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯৫১ সনে ভারত-সরকার যখন বিশ্বভারতীকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে স্বীকৃতি দেয় তখন রথীন্দ্রনাথই সরকার কর্তৃক বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য (Vice-chancellor) নিযুক্ত হন। কিছুকাল সে পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর রথীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় উপাচার্যের পদে ইস্তফা দেন, এবং শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে দেরাদুনে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন— শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন হয়। দেরাদুনেই ১৯৬১ সনে রথীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।…

দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার যে পরিচয় পেয়েছি, লোকের সঙ্গে ব্যবহারে প্রতিদিনের মানুষ রথীন্দ্রনাথের যে ছবিটি আমার চিত্তের চিত্রপটে অঙ্কিত রয়েছে, আর শান্তিনিকেতনের কল্যাণের জন্য তাঁকে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি, সেই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

প্রথমে মনে পড়ে যে, সচরাচর শিক্ষিত বলে যাঁরা গণ্য হন রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার মান ছিল তাঁদের শিক্ষার চেয়ে অনেক উঁচু। তিনি কেবল সুশিক্ষিত ছিলেন না, একজন সুলেখকও ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজি দুই-ই তিনি ভালো লিখতেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বিজ্ঞানেই তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'প্রাণতত্ত্ব' নামক রথীন্দ্রনাথের লেখা পুস্তকটি একখানি সুলিখিত পুস্তক। আর মৃত্যুর অল্প আগে পিতার জীবনকথা নিয়ে রথীন্দ্রনাথ *On the Edges of Time* নামক যে ইংরেজি পুস্তক লিখেছিলেন তা-ও অনেকের নিকট সমাদর লাভ করে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ যে মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন তা কে না জানে? কয়েক-বছর আগে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত "ধারাবাহী" ও অপর দু-একটি প্রবন্ধে রথীন্দ্রনাথ তাঁর সেই মহান ঐতিহ্যের ও তাঁর বাল্য-জীবনের কথা কিছু লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধগুলি থেকে, এবং আমার শোনা নিম্নের কাহিনীটি থেকে জানা যায় কিরূপ পরিবেশে রথীন্দ্রনাথ বাল্যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কাহিনীটি শুনেছিলাম বহু পূর্বে যখন আমরা কলকাতায় কলেজের ছাত্র। একবার মাঘোৎসবের সময় মহর্ষির মৃত্যুবাসরে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কাহিনীটি বলেছিলেন— ঈশ্বর-চিন্তন মহর্ষির জীবনের প্রধান কাজ হলেও সংসারের সবদিকে মহর্ষির খেয়াল থাকত। পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণবের কাছে কিছুদিন ধরে বালক রথীন্দ্রনাথের সংস্কৃত পড়া চলছিল। শাস্ত্রীমশাই বলেন, একদিন মহর্ষির কাছে গেলে মহর্ষি তাঁকে রথীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষার কীরূপ উন্নতি হয়েছে তা পরীক্ষা করতে বলেন। ছাত্র ও শিক্ষকের ডাক পড়ল মহর্ষির কাছে। শাস্ত্রীমশাই রথীন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করে খুব সন্তুষ্ট হলেন। মহর্ষি তখনি বিদ্যার্ণব মশাইকে

একখানা পাঁচশত টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। পরে শান্তিনিকেতনে একদিন কথাপ্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এ কাহিনীটির সত্যতা স্বীকার করেন। এরূপ পরিবেশে এবং পিতার সতর্ক ও সস্নেহ তত্ত্বাবধানে রথীন্দ্রনাথের শিক্ষা শুরু হয়।

...বালক রবীন্দ্রনাথকে পাহাড়ে মহর্ষি যেমন চলা-ফেরায় স্বাধীনতা দিতেন, রথীন্দ্রনাথকেও রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ চলা-ফেরায় স্বাধীনতা দিতেন। বিপদের আশঙ্কায় প্রতিপদে আগলে রাখা রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না। অনেক বাঙালি মা যে মূঢ়ের ন্যায় সন্তানকে রক্ষা করতে গিয়ে অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে সন্তানকে অমানুষ করে তোলেন রবীন্দ্রনাথের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি হয়তো অনেকেই জানেন।

অভিজাত ও অনভিজাতের আচরণে ব্যবধান সুস্পষ্ট। কথাবার্তা ও চালচলনে অভিজাত সংযমের পরিচয় দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের মুখে কোনো দিনই সামান্য গালিগালাজও শুনি নি। রথীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। কথাবার্তায় আচরণে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ভদ্র লোক। রাগ করলেও তাঁর মুখ থেকে অভদ্র কথা বের হত না। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনিই আগে নমস্কার করতেন, আমরা অনেক সময়ই তাঁকে আগে নমস্কার করার সুযোগ পেতাম না।

রথীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা দরকার। তিনি বলতেন, তিনি জন্মেছিলেন শিল্পীর মন নিয়ে। সৌন্দর্যসৃষ্টিতেই তাঁর ছিল আনন্দ। তিনি সুন্দর ছবি আঁকতেন। কাঠ নিয়ে তিনি নানা প্রকারের সুন্দর জিনিস তৈয়ারি করতেন। আজ এদেশে চামড়া দিয়ে নানা প্রকারের সুন্দর জিনিস তৈরি হয়। যবদ্বীপের কাপড়ের উপর বাতিকের কাজেরও এ দেশে আজ দিন দিন প্রচলন হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে রথীন্দ্রনাথের চেষ্টায়ই চর্মশিল্প ও বাতিক শিল্পের

প্রবর্তন হয় এবং এই দুটি সুন্দর শিল্পের জন্য রথীন্দ্রনাথের নিকট দেশ ঋণী। সরকারও শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকার করেছিল— তাঁকে সরকারি এক শিল্প-সংস্থায় শিল্প-বিষয়ক উপদেষ্টা রূপে গ্রহণ করেছিল।

রথীন্দ্রনাথের শিল্পীমনের আর একটি পরিচয় শান্তিনিকেতনের সুদৃশ্য গৃহসমূহ। এ বিষয়ে কৃতিত্ব তাঁর ও তাঁর বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ কর মশায়ের। বস্তুত ঘরবাড়ি তৈরি করার দিকে রথীন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল অতিরিক্ত। তার অবশ্যম্ভাবী ফল অর্থাভাব। বাইরের অনেকেই বিশেষ কোনো একটি উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ear-marked করে শান্তি-নিকেতন দান করেন। ঐ সব ear-marked fund-এর টাকা বিশ্বভারতীর প্রতিদিনের ব্যয় মেটাতে ক্ষয় হতে থাকে। তখন রথীন্দ্রনাথকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। বিধুশেখর শাস্ত্রী-মশায়ের ন্যায়-অন্যায়বোধ ছিল সূক্ষ্ম। তিনি বললেন এভাবে ear-marked অর্থ যে উদ্দেশ্যে দত্ত সে উদ্দেশ্যে ব্যয় না করা, আর বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করা একই কথা। তিনি ছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তাই বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষায় তিনি বলতেন, এভাবে বিশ্ব-ভারতীতে 'মার' প্রবেশ করবে। বৌদ্ধশাস্ত্রে আছে 'মার' বুদ্ধকে পাপ পথে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল। Andrews সাহেব এরূপ অর্থব্যয়— ইটপাথরে এত টাকা খাটানো সমর্থন না করলেও বলতেন Rathi is writing poetry in bricks and mortar. রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলতেন, রথি এখানকার সকল কর্মীর কাছে সহযোগিতা পায় না— কথাটি যে সম্পূর্ণ ঠিক তা নয়; তবে রবীন্দ্রনাথকে একথা বলে অনেক সময় দুঃখ করতে শুনেছি।

যাক, এ অর্থাভাবের জন্য যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক উদ্‌বিগ্ন ছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। টাকা তোলবার জন্য শান্তিনিকেতনের ছেলে-মেয়েদের দ্বারা অভিনয় করানো হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ ear-

marked fund-এর নিকট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৬০ হাজার টাকায়। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের অভিনয় দ্বারা বৃদ্ধবয়সে ও রুগ্ণদেহে রবীন্দ্রনাথকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় পাটনা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানের উদ্দেশ্যে বের হতে হয়। শেষে দিল্লীতে মহাত্মাজীর নির্দেশে এক অজ্ঞাতনামা বদান্যব্যক্তি বিশ্বভারতীকে ষাট হাজার টাকা দান করলে বিশ্বভারতীর ঐ দেনা শোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ Nobel prize-এর ১ লাখ ১২ হাজার টাকা বিশ্বভারতীকে দান করেছিলেন। টাকাটা খাটছিল রবীন্দ্রনাথের জমিদারির কৃষি ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে এবং টাকাটা মারা যায়। একাজের জন্য রথীন্দ্রনাথের আইনগত কোনো দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুনে খুব খুশি হলেন যে রথীন্দ্রনাথ ঐ টাকার বাবদ রবীন্দ্রনাথের নির্মিত জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনটি— যার দাম অনেক বেশি— বিশ্বভারতীকে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। রথীন্দ্রনাথের একাজ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তিনি বিশ্বভারতীকে কী দরদের চক্ষে দেখতেন এ তার একটি প্রমাণ। আজ সরকার বিশ্বভারতীর ভার গ্রহণ করেছে এবং বিশ্বভারতীর অর্থাভাব দূর হয়েছে। এ যোগাযোগ ঘটাবার মূলেও রয়েছে রথীন্দ্রনাথের অক্লান্ত চেষ্টা। আশ্রমের এই প্রথম ছাত্র এবং এককালের প্রধান কর্মীর গুণরাশির কথা স্মরণ করে আমার স্মৃতিকথা শেষ করছি।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইংরেজি ১৯৩৮ সালের ২৭শে নভেম্বর। বিশ্বভারতীর কর্মীবৃন্দ সমবেত হয়েছেন এক আনন্দোৎসবে। শ্রীনিকেতনের পুষ্করিণীর চারিধারে ব'সে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কর্মীরা মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করলেন। কলকাতা থেকে গ্রন্থনবিভাগের কয়েকজন কর্মীও উপস্থিত হয়েছেন। সন্ধ্যায় নাটক অভিনীত হল। উপলক্ষ ছিল তাঁদের সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ হল। পুত্রের আয়ু ও কল্যাণ কামনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ এক কবিতা লিখলেন—

মধ্যপথে জীবনের মধ্যদিনে উত্তরিলে আজি···।

মানুষকে শতায়ু হতে কদাচিৎ দেখা যায়, কথাটা শুধু আশীর্বাণীতেই রয়ে গিয়েছে। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ পিতার বয়সও পেলেন না, পিতামহের তো নয়ই।

রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি সন্তান, দুই পুত্র ও তিন কন্যা। প্রথমে কন্যা বেলা, তার পর পুত্র রথীন্দ্রনাথ, এর পর রেণুকা ও মীরা দুই কন্যা, সবশেষে পুত্র শমীন্দ্রনাথ। দু'বছর অন্তর অন্তর এঁরা জন্ম-গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনটি সন্তানশোক সহ্য করতে হয়েছে। প্রথমে গেলেন দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা তেরো বছর বয়সে। তার পর ওই তেরো বছর বয়সেই গেলেন কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ। বেলা দেবীর মৃত্যু হয় তাঁর চব্বিশবছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম-শয্যার পাশে ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা দেবী।

শমীন্দ্রনাথ তো বাল্যকালেই গত হয়েছেন ; রথীন্দ্রনাথের কোনো সন্তান ছিল না, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বংশধারা রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হল। কন্যার দিকেও সেইরকম। বেলা ও রেণুকার সন্তান হয় নি। মীরা দেবীর একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র নীতীন্দ্র কুড়িবছর বয়সে জার্মানিতে মারা যান। কন্যা নন্দিতার বিবাহ হয় কৃষ্ণ কৃপালনির সঙ্গে। এঁদেরও কোনো সন্তান নেই।

রথীন্দ্রনাথ যখন বালক তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আদি ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতা বর্জন করেছিল, কিন্তু হিন্দু আচার রীতিনীতি মেনে চলত। ব্রাহ্মণের উপনয়ন হত, অসবর্ণ বিবাহ হত না, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির লোক পুরোহিত হত না। রথীন্দ্রনাথেরও যথাকালে উপনয়ন হল।

মহর্ষির অন্যান্য পুত্রেরা নিজেদের ইচ্ছামতো পুত্র-কন্যাদের বিভিন্ন স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু স্কুল সম্বন্ধে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকায় রবীন্দ্রনাথ বাড়িতেই তাঁর পুত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশোনার কাজে প্রেরিত হলেন। রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন দশ। রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে জমিদারিতে বাস করতে থাকলেন। লরেন্স নামে এক সাহেবকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে নিজের পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। সুফলও পেলেন।

কয়েক বছর এই রকম চলল। তখন একটা কথা তাঁর মনে জাগল। তাঁর পদ্ধতি কি নিজের পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে ? তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন।

এই সময় মহর্ষি শান্তিনিকেতনকে একটা ট্রাস্টির হাতে দেন। যে-কেউ ওখানে গিয়ে দু-তিন দিন বাস ক'রে সাধনা করতে পারেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল ওটা প্রায় খালি প'ড়ে থাকে। এখন রবীন্দ্রনাথ মহর্ষিকে জানালেন যে ওখানে তিনি একটা আদর্শ

বিদ্যালয় স্থাপন করতে চান। মহর্ষি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন, ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। যে ছয়জন ছাত্র নিয়ে এর আরম্ভ— তার মধ্যে রইলেন রথীন্দ্রনাথ।

রথীন্দ্রনাথ অন্য পাঁচজন ছাত্রের সঙ্গে ছাত্রাবাসেই থাকেন; সেখানেই একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন, তাঁর জন্য পৃথক ব্যবস্থা নেই। শুধু কবিজায়া প্রতিদিন বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা করতেন, আর তা সকল ছাত্রের জন্যই হত। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"এমন জায়গায় সুখী লোকের স্থান নেই। রথীও একখানা মোটা রুটি খাইয়া মানুষ হইয়া গিয়াছে। মেয়ে স্কুলে মীরাও সকলের সঙ্গে খায় থাকে।"

কিছুদিন এইরকম বেশ চলতে থাকল, কিন্তু কবিজায়া অসুস্থ হয়ে পড়লেন; অসুখ দিন দিন বেড়ে যেতে রইল, তাঁকে কলকাতায় আনা হল; তাঁর মৃত্যু ঘটল। রথীন্দ্রনাথের বয়স এখন চৌদ্দ।

কবিজায়ার অভাবে সংসারে সমস্ত দেখাশোনার ভার পড়ল রবীন্দ্রনাথের উপর। রথীন্দ্রনাথ এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। ১৯০৪ সালে ওই পরীক্ষায় পাস করলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কলেজে দিলেন না, বাড়িতেই পড়াশুনা চলতে লাগল। স্থির হল, শিক্ষার্থে তাঁকে বিদেশে পাঠানো হবে, সেই-মতো প্রস্তুত করা হতে থাকল। এই সময় রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েক-জন সাধু বদরি-কেদারনাথ তীর্থে যাত্রা করেন; ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে তাঁদের সঙ্গে দিলেন। মাসাধিক পরে রথান্দ্রনাথ ফিরলেন। রবীন্দ্রনাথ সেসময় তাঁর এক বন্ধুকে লিখছেন—

"রথী কেদারনাথ তীর্থ ঘুরিয়া কাল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তুমি বোধ হয় জান কেদারনাথ হিমালয়ের একটি দুর্গমতম তীর্থ।

সেখানে রথী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের মতো গিয়া সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখন আর সে কোথাও ভ্রমণ করিতে ভয় করিবে না।"

জমিদারিতে বাস করবার সময় রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন যে পল্লীর শতকরা প্রায় নব্বইজন লোক কৃষিকার্য ও গো-পালনের উপর নির্ভর করে। পল্লী-উন্নয়ন এখন রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিকল্পনা। তিনি পুত্রকে ইংলণ্ডে আই. সি. এস. বা ব্যারিস্টারি পড়তে পাঠাবেন না, পাঠাবেন আমেরিকায় কৃষিকার্য ও গো-পালন শিক্ষা করতে, দেশে ফিরে তা কাজে লাগাতে হবে। তখন আমেরিকার কলেজে কোনো ভারতীয় ছাত্রের প্রবেশপথে নানারূপ বাধা ছিল। শেষ অবধি ইলিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থা হল ; রথীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার জাপানের পথে আমেরিকায় যাত্রা করলেন। সেটা ১৯০৬ সাল।

ইলিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর প'ড়ে রথীন্দ্রনাথ সেখানকার বি. এস্‌সি. উপাধি লাভ করলেন। শেষে ইংলণ্ড ঘুরে দেশে ফিরলেন।

১৯১০ সালে প্রতিমা দেবীর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হল। প্রতিমা দেবী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়িনী দেবীর বিধবা কন্যা। ঠাকুরবাড়ির ও আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন সংস্কারগুলির মধ্যে একটি প্রথম ভাঙলেন রবীন্দ্রনাথ। বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা' উপন্যাস পুত্রকে উৎসর্গ করেন।

১৯১২ সালে পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে বোম্বাই-এর পথে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করলেন। বিলাতে পৌঁছবার পর স্থির হল সেখানে তাঁর ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হবে। সে ব্যবস্থা চলতে রইল। এখানে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতা নরেন্দ্র সিংহের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হল। স্যুরুলে নরেন্দ্র সিংহের একটা বাড়ি ও কিছু

জমি ছিল, তিনি বিক্রি করতে ইচ্ছুক। রবীন্দ্রনাথ সেটা কিনে ফেললেন। ইচ্ছা, সেইটেকে কেন্দ্র করে পল্লী-উন্নয়ন কার্য গ'ড়ে তুলবেন, আর তার ভার দেবেন রথীন্দ্রনাথের উপর।

ইংলণ্ডে চার মাস থেকে পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় গেলেন। পৌঁছে, ইলিনস স্টেটের আর্বানা শহরে গিয়ে উঠলেন। রথীন্দ্রনাথ এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাক্তন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-কার্যে রত রইলেন। কয়েক মাস ওখানে থেকে ইউরোপ ঘুরে দেশে ফিরলেন।

ফিরে এসে সুরুলের বাড়িতে বাস করেন, আর নিকটবর্তী গ্রামগুলির উন্নতিকল্পে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় পড়তে থাকলেন, শেষে বাধ্য হয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এখানে চুপচাপ না থেকে, মোটরের ব্যবসায়ে নামলেন। কিন্তু কিছু করতে পারলেন না। বেশ-কিছু টাকা দণ্ড দিয়ে ব্যাবসা গুটিয়ে ফেললেন।

১৯১৮ সালে পিতা পুত্রকে আনলেন শান্তিনিকেতনে তাঁর কাজে সহায়তা করবার জন্য। এখানে নতুন রকমের বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, নানা ধরনের নানা কাজ। পুত্র পিতাকে সব কাজে সহায়তা করতে থাকলেন।

আরও কয়েকবার কবির পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণে রথীন্দ্রনাথ সঙ্গী রইলেন। একবার তিনি ইউরোপে এসে দল থেকে সরে গেলেন, উদ্দেশ্যের কথা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখলেন। বার্লিনের এক নার্সিং-হোমে আশ্রয় নিলেন, বিশেষরকমের এক অস্ত্রোপচার হবে। দেখা গেল তাঁর বালিশের তলায় একখানা লেফাফা রয়েছে, তার মধ্যে আছে একখানা উইল ও তাঁর মৃত্যু ঘটলে কাকে কাকে সংবাদ দিতে হবে তার একটা তালিকা। অস্ত্রোপচারের সংবাদ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুনলেন; সকলে মিলে বার্লিনে ছুটলেন। রথীন্দ্রনাথ শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠলেন।

কবির মৃত্যুর পর বিশ্বভারতীকে অনেক ঝড়ঝাপ্টার মধ্যে দিয়ে চলতে হল, কিন্তু রথীন্দ্রনাথের সুদক্ষ পরিচালনায় সকল বাধা অপসারিত হয়ে ১৯৫১ সালে পার্লামেণ্টের আইন অনুসারে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-রূপে পরিগণিত হল। রথীন্দ্রনাথ হলেন ওই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। দু'বছর পর তিনি পদত্যাগ ক'রে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। তবে বিশ্বভারতীর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত রইলেন না। মৃত্যুর দিন অবধি তিনি বিশ্বভারতী-সংসদের সদস্য, 'বিশ্বভারতী সোসাইটি'র সম্পাদক ও রবীন্দ্রভারতীর ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর উইলে তিনি রবীন্দ্রভারতীকে বিশেষভাবে স্মরণ করে গিয়েছেন।

বিবিধ কাজের মধ্যে তিনি যতটুকু সময় পেতেন, কলাশিল্পের অনুশীলনে রত থাকতেন। চিত্রাঙ্কনে, চামড়া ও কাঠের কাজে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ব'লে পরিগণিত হয়ে থাকবেন।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে 'অভিব্যক্তি' ও লোকশিক্ষাসংগ্রহে 'প্রাণতত্ত্ব' দু'খানি সুখপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। ১৯০৯ সালে কাওএল সাহেব অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে'র এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্র-নাথ ওটি প'ড়ে প্রচুর আনন্দ পান ও বালক রথীন্দ্রনাথ আর তার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে ওই পুস্তকখানির বাংলা অনুবাদ করার ভার দেন। প্রথম তিন সর্গের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ দেখে দিয়েছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের নিকট সন্ধান পেয়ে, পরিষৎ-পত্রিকায় সেই সময় এই বঙ্গানুবাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, কিন্তু অনেকগুলি শব্দের যথার্থ অর্থবোধ না হওয়ায় অনুবাদটি তখন সম্পূর্ণ হয় নি। চল্লিশ বছর পরে অনুবাদটি শেষ করে রথীন্দ্রনাথ এটি প্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে এ এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল। ইংরেজিতে *On the Edges of Time* নামে

একখানি পুস্তক লিখেছেন, তা উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। 'বসুধারা' পত্রিকায় তিনি যে মনোজ্ঞ স্মৃতিকথা পরিবেশন ক'রে চলেছিলেন, হয়তো এই সংখ্যায় তা শেষ হল, হয়তো বা কিছু লেখা আছে— পরে তা প্রকাশিত হবে। কিন্তু তাঁর লেখনী স্তব্ধ।

পিছনের পর্দা এত বেশি উজ্জ্বল ছিল যে, রথীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভা জনগণের নিকট সেরকম সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। কেউ কেউ বললেন, দেহকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হোক; বেশির ভাগ লোক এতে সায় দিলেন না। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও দু'মত দেখা গেল— কেউ বললেন— Crematorium, কেউ বললেন— নিমতলা। এ সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথের ইচ্ছাই বলবৎ হবে, তাই ছোটো একটু চিরকুট লিখে তাঁর কাছে পাঠালুম। তিনি তিনতলার ঘরে, শোকে মুহ্যমান। চিরকুটের উপর তিনি ছোট্ট দুটি লাইন লিখে পাঠালেন—

শান্তিনিকেতনে নয়, কলকাতা।
Crematorium নয়, নিমতলা।

ডেরাডুনের সমস্ত বাঙালি সমবেত হয়ে রথীন্দ্রনাথের প্রাণশূন্য দেহের শ্মশানকৃত্য করল। ওই শ্মশানেই আর একজন বিশিষ্ট বাঙালির দেহ ভস্মীভূত হয়েছিল। তিনি হলেন— মানবেন্দ্রনাথ রায়।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার বহুবৎসরের আলাপ। গত কয়েক বৎসরে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ গাঢ় হয়ে উঠল। আমরা দুজনেই দেরাদুনে থাকতাম। তিনি থাকতেন রাজপুরে, আমি থাকতাম ডালানওয়ালার মোহিনী রোডে, মধ্যে পাঁচ-ছয় মাইলের তফাৎ। সপ্তাহে প্রতিদিন আমার বাড়ি আসতেন, এবং আমিও প্রতি রবিবার সকালবেলা তাঁর কাছে যেতাম। আমি ঘণ্টা দু'এক থাকতাম, তিনি থাকতেন এক ঘণ্টা। কখনও কখনও সকালে চলে আসতেন। দেরাদুনে আমার বন্ধুবান্ধব নিতান্ত কম, তাঁরও বেশি ছিল না। নিজের ছেলেবেলার গল্পের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে গল্পই বেশি হত। আমার স্ত্রী ও আমি সে সম্বন্ধে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। আমার স্ত্রী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিতান্ত উৎসুক ছিলেন, তাঁর পারিবারিক ঘটনা তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানতেন, কিন্তু রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাপারগুলি জানতে চাইতেন। রথীন্দ্রনাথ অকৃপণভাবে আমাদের কাছে এই-সব গল্প বলতেন।

মনে হয়, আমরা অতিশয় স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। এমন দিন নেই একটা-না-একটা উপহার নিয়ে না আসতেন। কখনও গন্ধদ্রব্য, ফল-ফুলের গাছ, কখনও চাটনী, খাবার জিনিস, কখনও নতুন বই। বাংলা বই, ইংরেজি বই তাঁর কাছে অনেক আসত, তার মধ্যে বেছে নিয়ে আমাদের পড়তে দিতেন। আমরাও দু-চারখানা বই সরবরাহ করতাম। বইগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। তাঁর রুচি ছিল চমৎকার। তাঁর বিজ্ঞানের বইয়ের আমি ছিলাম ভক্ত।

ততদিন পর্যন্ত তাঁর লেখা 'বুদ্ধচরিত' আমি পড়ি নি। তিনি বললেন, *'সে সম্বন্ধে অনেক কিছু গবেষণা হয়েছে, কিছু পড়েছি, কিছু পড়ি নি,* তাই নতুন করে লিখতে আর মন সরছে না।' নিজের রচনা কেন, প্রত্যেক বিষয়েই একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ ছিল।

দেরাদুনে বাড়ি করলেন এক অতিশয় সুন্দর জায়গায়, প্রায় তিনহাজার ফিট্ উঁচুতে। চারধারে ফুলফলের গাছে ভরা। বাড়ির ঠিক সামনেই একটা উপত্যকা। ঘর থেকেই দু'পাশে পাহাড় আর সামনে একটা বড়ো কিন্তু শুক্‌নো ঝরনা। বাড়িটা কিন্তু আমার ভালো লাগত না, অনেকটা শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণের মতন। দেখতে ছোটো যদিও একাধিক ঘর। বৈঠকখানাটি অত্যন্ত পরিপাটি, সামান্য একটু বেশি রকমের হয়তো। রবীন্দ্রনাথের ও নিজের অনেকগুলি ছবি টাঙানো। তারই পাশে এক ঘরে তাঁর যন্ত্রপাতি অতিশয় সুন্দরভাবে সাজানো। তার পরে একটু বড়ো ঘর, একদম দেশি ভাবে, অর্থাৎ তাকিয়া হেলান দিয়ে। তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের একটা ছবি বড়ো করে সাজানো, তার বেশি কিছু নেই। পাহাড়ের নীচের তোলায় আরেকটি ঘর, সেটা তাঁর সম্পূর্ণ নিজের। কিন্তু বেশিদিন ভোগ করতে পারেন নি।

তাঁর বাগানে অত্যাশ্চর্য রকমের ফলফুল ধরত। তাঁর সত্যই greenhand ছিল। শান্তিনিকেতনে, কালিম্পঙে ও দেরাদুনে কত-রকমের গাছ ও ফুল দেখেছি। অস্ট্রেলিয়া থেকে সাদা জবা এনে আমাকে দিলেন, আর অতি ক্ষুদ্র গোলাপের ঝোপ। দেশবিদেশ থেকে আহরণ করে আনতেন গোলাপ, সিমেন্ট দিয়ে তাকে কেয়ারি করতেন, বোধহয় বেশি জল থেকে রক্ষা পাবার জন্য। বিদেশি ফুলের ইয়ত্তা নেই। বাড়ির সামনে লতানে আমের বাগান, আর আঙুর। আমি অবশ্য শীতকালে গোলাপ দেখতে পেতাম না, আঙুরও ছিল টক। শীত ছাড়া অন্য সব সময় একটা-না-একটা ফুল লেগেই থাকত।

বাড়ির ভিতর ছিল একটি কারখানা। তাতে কী জিনিস ছিল না সেখানে! আমাদের সবচেয়ে ভালো লাগত তাঁর চামড়া, কাঠ, গন্ধ, আর চাটনীর সাজসরঞ্জাম। সারা ভারতবর্ষে শান্তিনিকেতনের চামড়ার বাহাদুরি। সেজন্য কৃতিত্ব সম্পূর্ণ রথীন্দ্রনাথের। একদিন দেরাদুনের এক নির্জন পল্লীতে একটা মরা গাছ পেলেন, বললেন এমন ভালো কাঠ আর হয় না, নিয়ে এসে পনেরো দিন পরেই বসবার টেবিল তৈরি করে ফেললেন। এই ধরনের অসংখ্য খুঁটিনাটি কাজ রয়েছে।

ইতিপূর্বে স্বাভাবিক সঙ্কোচের কথা লিখেছি। সঙ্কোচটা একটু অন্যধরনের ছিল। মহৎব্যক্তির আওতায় মানুষ একটু যেন নয় মুষড়ে পড়ে, আর নাহয় উচ্ছন্ন যায়। রথিদা আমাকে একদিন বলেছিলেন যে তিনি চিরকাল inferiority complex-এ ভুগছেন। গোপনে এই রোগে আক্রান্ত ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তার প্রধান প্রধান লক্ষণ আমি তো দেখি নি, কুত্রাপি কোনো প্রকারের অতিশয় উক্তি কি ব্যবহার তাঁর মধ্যে ছিল না। অল্প বয়সে যা শুনেছি, ব্রহ্মবান্ধব, সতীশচন্দ্র, সন্তোষ মজুমদার, প্রভৃতির সঙ্গে নিতান্ত সহজভাবেই ব্যবহার করতেন। স্বদেশী যুগে তিনি রীতিমত যোগ দেন। পরে সামলে যান— তা সেটা মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জন্যেই। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি রথীন্দ্রনাথকে লেখেন তাই থেকে অন্তত এইটুকু প্রমাণ হয় যে তিনি (রথীন্দ্রনাথ) তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) অগোচরে, গোপনে, নির্বিবাদে শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চালাতেন। হয়তো যেন রথীন্দ্রনাথের উপর সাধারণের ঈর্ষার ভাবটাই ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন বাঙালির পরশ্রীকাতরতা মজ্জাগত। তাহা যদি হয় তবে বড়লোকের এক ছেলের ওপর হিংসা হওয়াই স্বাভাবিক। জায়গা ছোটো আর একটা মানুষ বড়ো, এ ক্ষেত্রে া হয় সর্বত্র তাই হয়েছে। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে কিছু মানুষের সুবিধা

হয়েছিল, তার পরের যুগেও খানিকটা, কিন্তু এখন ? আমরা ছোটো জায়গার ছোট্ট মানুষ। নিতান্ত দুঃখের কথা।

খবরের কাগজের মারফৎ শুনতে পেলাম যে তিনি মহৎলোকের একজন ভালো লোক, অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তি। মহৎ ও ভালো, great এবং good, এই দুটোর পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেটা আমার ক্ষমতার বাইরে। খবরের কাগজের তরফ থেকে কিন্তু একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলা চলে। ব্যাপারটা হল arts এবং crafts-এর ঝগড়া। চতুর্দশ শতাব্দীর য়ুরোপে তার শুরু, এবং আজ এখন তার জের চলছে। আগে ছিল দুটো মিলে মিশে থাকা, বোধহয় ক্রাফ্‌টই প্রধান, কিন্তু এখন আর্টই সর্বেসর্বা। অবশ্য এরীক গীল থেকে পিকাসো পর্যন্ত আবার এক হবার চেষ্টা করছেন। পারবেন কিনা জানি না, কারণ ব্যাপারটা ধনতন্ত্রের অধীনে। ভারতবর্ষে কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চারুকলার ওপর জোর দিতে আরম্ভ হল। ক্রাফ্‌ট চারুকলার চাপে পড়ে গেল। ক্রাফ্‌ট হয়ে গেল শূদ্রের ব্যবহার। এখন ব্যাপার হল এই : রথীন্দ্রনাথ একজন ক্রাফ্‌টস্‌ম্যান, এবং বড়োরকমেই। Fine Art-এর শ্রদ্ধা এসে পড়লো সকলের ওপর ; রথীন্দ্রনাথের craftsmanship যেন চিমে পড়ে গেল। আমার মনে হয় রথীন্দ্রনাথের অবচেতনায় এই বস্তু এসে গেছে।

একটা কথা মনে উদয় হচ্ছে। দেরাদুনের বাড়ির সাজ-সরঞ্জাম বিশ্বভারতীতে নিয়ে আসাই উচিত। এই মহামূল্য জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে দেরাদুনের জলের তোড়ে, আর উইএতে। যত শীঘ্র বন্দোবস্ত করা যায় ততই মঙ্গল।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পাঁচটি মাত্র বালককে নিয়ে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শুরু। সেই পাঁচজনের একজন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এত ক্ষুদ্র আকারে যার আরম্ভ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হতে-না-হতেই সে বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল ; আর বিদ্যালয়ের সেই প্রথম ছাত্র রথীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রথম উপাচার্য। আজও মনে পড়ছে উপাচার্য হিসাবে তিনি প্রথম যে সমাবর্তন ভাষণটি দিয়েছিলেন তাতে বিদ্যালয়ের শৈশব থেকে তার ক্রমবিকাশের উল্লেখ করে বলেছিলেন— আমার আজকের এই ভাষণ বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্যরূপে ততখানি নয় যতখানি আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্ররূপে। এই সূত্রে আর-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। রথীন্দ্রনাথ তাঁর সমাবর্তন ভাষণটি দিয়েছিলেন বাংলায়। রথীন্দ্রনাথের পরে বিশ্বভারতীর আর-কোনো উপাচার্য বাংলায় ভাষণ দেন নি। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন রবীন্দ্রনাথকে সমাবর্তন ভাষণ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান তখন তিনি এই শর্তে রাজি হয়েছিলেন যে ভাষণটি তিনি বাংলায় দেবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই একবার নতুন ধারায়— বিশ্ব-ভারতীতেও ঐ একটিবার।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক ভাবনাচিন্তার শুরু বলতে গেলে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই। ইস্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষায় রবীন্দ্র-নাথের আস্থা ছিল না। বালক বয়সে নিজ স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে ছিল, সেজন্যে পুত্রকে আর স্কুলে পাঠান নি। গৃহে রেখে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার সূত্রপাত হল। শিক্ষা কিছুদূর

অগ্রসর হবার পরে কবির মনে হয়েছে যে আপন গৃহ-সীমানার মধ্যে থেকে যে শিক্ষালাভ তারও মধ্যে কিছু ঘাটতি থেকে যাবার আশঙ্কা আছে। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ না পেলে মনের গড়নে নানা খুঁত থেকে যায়, স্বভাবের সুসমঞ্জস পরিণতিতে বিঘ্ন ঘটে। ফলে অতিরিক্ত লাজুক, ঘরকুনো এবং অসামাজিক হওয়াটা খুব বিচিত্র নয়। এ-সব ভাবনাচিন্তার ফলেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। কাজেই বললে খুব ভুল হয় না যে রথীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সৃষ্টি।

বিদ্যালয়টি হবে গুরুগৃহে বাসের ন্যায়। প্রচীনকালে গুরুরা থাকতেন লোকালয়ের এক প্রান্তে, প্রকৃতির সন্নিধানে। লোকালয়ের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে সরল স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতেন। বিদ্যাদানের কাজটিকে গার্হস্থ্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হত না। এই বিদ্যালয় হবে সেই সরল সুন্দর জীবনচর্যার সাধনস্থল। গুরুগৃহের স্নেহ-ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত হবে বিদ্যালয়ের নিয়মনিষ্ঠা। বিদ্যালয়কে ঘিরে একটি আনন্দোজ্জ্বল পারিবারিক পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

আপন গৃহের সংকীর্ণ সীমায় থেকে যে শিক্ষা তা যেমন শীর্ণতা-দোষে দুষ্ট, স্কুলের পুঁথিগত শিক্ষাও তেমনি জীর্ণতাদোষে দুষ্ট। একটি একপেশে, অপরটি গতানুগতিক। হাতে-কলমে কোনো রকমের কাজ শিখি না বলে আমাদের বিদ্যাটা বুদ্ধির সঙ্গে ঠিক তাল রেখে চলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মতো শিক্ষিত মানুষদের বলতেন 'বোকা-হাতের মানুষ'। আমাদের বিদ্যাচর্চা পোশাকী মনোভাবকে একটু অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয়। শিক্ষার যে একটা করিত-কর্মা মূর্তি আছে সে কথা আমরা মনেই রাখি না। রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের শিক্ষাক্রমের মধ্যে নানারকম হাতের কাজের স্থান রেখেছিলেন— কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, সবজি বাগানের কাজ

ইত্যাদি। এ ছাড়া গান-বাজনা, ছবি আঁকা, অভিনয় ইত্যাদি কলাচর্চারও ব্যবস্থা ছিল।

এর ফলে গতানুগতিক শিক্ষার তুলনায় রথীন্দ্রনাথের শিক্ষাটা হয়েছিল ঢের বেশি ব্যাপক। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি বিদেশে বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কারুকলার চর্চা করেছেন বালক বয়স থেকেই। জোড়াসাঁকো গৃহে সংগীতচর্চা বংশগত। গান-বাজনায় রথীন্দ্রনাথের রুচি ছিল, পারদর্শিতা ছিল এমন কথা বলব না। অভিনয়াদিতেও অংশ গ্রহণ করেছেন। ছবি আঁকায় হাত ছিল। এঁকেছেনও বরাবর। এ ক্ষেত্রেও খুব মস্ত বড়ো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এমন কথা বলা চলে না। ফুল আঁকতেন ভালো। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ফুল আঁকায় ছেলের কাছে হার মানতে হল। ফুল আঁকায় যেমন পরিদর্শিতা ছিল, ফুলের বাগান রচনায় তেমনি দেখিয়েছেন অসাধারণ কৃতিত্ব। গাছপালা এবং নানাজাতীয় ফুল-লতাপাতার সম্ভারে উত্তরায়ণে রথীন্দ্রনাথের বাগান ছিল দেখবার মতো। উদ্যানরচনাকে তিনি একটি শিল্প হিসাবে দেখেছেন। সত্যি-কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন কারুকলার ক্ষেত্রে। হস্তশিল্পে— কাঠের কাজে, চামড়ার কাজে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতনে এবং কলকাতায় একাধিকবার তাঁর আঁকা ছবি এবং হাতের কাজের প্রদর্শনী হয়েছে। দিল্লীতেও একবার তাঁর কারুকৃতি এবং চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। স্বয়ং জওহরলাল তার উদ্‌বোধন করেছিলেন।

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। দেশবিদেশের সাহিত্যে অধ্যয়ন ছিল বিস্তৃত। ইংরেজি বাংলা— দু ভাষাতেই সমান অধিকার ছিল। যেটুকু লিখেছেন তাতেই সাহিত্যের স্বাদ এনেছেন। তাঁর প্রণীত 'প্রাণতত্ত্ব' এবং 'অভিব্যক্তি' বাংলা ভাষায় সুলিখিত বিজ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে লেখা—

On the Edges of Time— পিতার সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক স্মৃতিচারণ। চমৎকার ঝরঝরে ইংরেজি। অনূদিত হয়ে 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সংস্কৃতও শিখেছিলেন যত্ন করে। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ক্ষমতার তুলনায় লিখেছেন অতি কম। পিতার বিরাট প্রতিভায় এত বেশি অভিভূত ছিলেন যে অসংকোচ আত্মপ্রকাশের ভরসা পান নি। সব-ক'খানা বইই পিতার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

রথীন্দ্রনাথ বহুগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি। বাস্তবিকপক্ষে একাধারে এমন বহুবিধ গুণের সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিক্ষাধারার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মনকে বহুমুখী করা। দৃষ্টিকে স্বচ্ছ সতর্ক রাখা, কারুকলার চর্চায় শোভন সুন্দর রুচি গঠন করা। পুত্রের শিক্ষায় সে উদ্দেশ্য বহুলাংশে সার্থক হয়েছে বলতে হবে। রথীন্দ্রনাথের নিকট-সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে তাঁর সকল কাজে, আচারে-ব্যবহারে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এ-সব গুণের একটি সহজ সুন্দর প্রকাশ দেখা যেত।

বলা আবশ্যক, যে কালে অভিজাত সমাজের ছেলেদের অক্সফোর্ড-কেমব্রিজে পাঠানোই রেওয়াজ ছিল, সেকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেকে পাঠালেন আমেরিকায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য। তাও আবার ভবিষ্যৎ জীবনে চাকুরির উদ্দেশ্যে নয়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ ; রবীন্দ্রনাথ আপন মনে যে স্বদেশী-সমাজের পরিকল্পনা করছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আপন পুত্রকে এবং বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন, পরে জামাতা নগেন গাঙ্গুলিকেও। উদ্দেশ্য ছিল ফিরে এসে এঁরা গ্রামাঞ্চলে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র তৈরি করে গ্রাম্য চাষীদের উন্নত প্রণালীতে চাষবাসের শিক্ষা দেবেন।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯০৯ সালে যখন দেশে

ফিরে এলেন তখন শিল্পে সাহিত্যে নব নব সৃষ্টির উদ্যমে জোড়াসাঁকো গৃহ রোমাঞ্চিত-কলেবর। অবনীন্দ্র গগনেন্দ্র দেশে রীতিমত এক শিল্প-বিপ্লবের সূচনা করেছেন; স্বদেশী যুগের কাব্যে সংগীতে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দেশের মন কেড়ে নিয়েছেন। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমেরিকা থেকে ফিরে এসে দেখি জোড়াসাঁকো বাড়িতে সাহিত্য ও ললিতকলার মহোৎসব বসে গেছে।' তিনিও সেই মহোৎসবে ভিড়ে গেলেন। অবশ্য হাতে কলমও নিলেন না, তুলিও না। রথীন্দ্রনাথের মনটা ছিল গঠনমূলক। ভাবলেন শিল্পী-সাহিত্যিকের মন উপ্চে-পড়া মন, সেখানে অপচয় অনিবার্য। এঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে একটা কোনো সংস্থার আওতায় এনে যদি নিয়ম-শৃঙ্খলার বশে রাখা যায় তা হলেই কাজটা অধিকতর ফলপ্রসূ হবে। এই ভাবনা থেকেই সৃষ্টি হল জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত বিচিত্রা ক্লাব প্রধানত রথীন্দ্রনাথের উদ্যোগে। কলকাতার জ্ঞানী-গুণী সমাজের অনেককেই রথীন্দ্রনাথ বিচিত্রার আঙিনায় এনে জড়ো করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গল্প প্রবন্ধ বিচিত্রা ক্লাবে প্রথম পড়ে শুনিয়েছেন। অন্যান্য যাঁরা লেখা পড়ে শুনিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্যের আসর ছাড়া সংগীতের আসরও বসত যথারীতি, অভিনয়াদিও লেগেই থাকত। বিচিত্রা ক্লাবের কার্যক্রম ছিল যথার্থই বিচিত্র। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন— সকাল বেলায় ক্লাব পরিণত হত কলাভবনে— অসিত-কুমার হালদার, নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ কর নিজ নিজ স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকতেন; মুকুল দে এচিং-এর কাজ করতেন। কিছু ছাত্র-ছাত্রীও জুটে গেল, তাঁদের জন্যে ছবি আঁকার ক্লাস খুলতে হল। ছাত্রীদের মধ্যে রথীন্দ্রনাথের সদ্য-বিবাহিতা পত্নী প্রতিমা দেবীও ছিলেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা হয়েছে। পিতার আহ্বানে

রথীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে চলে আসতে হল। প্রধান উৎসাহী এবং কর্মকর্তার অভাবে বিচিত্রা ক্লাবের কাজ ক্রমে নিস্তেজ হয়ে গেল এবং এক সময়ে ক্লাব বন্ধ হয়ে গেল। ক্লাবের আর্টিস্টদের মধ্যে অসিত হালদার, নন্দলাল বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ কর একে একে এসে শান্তিনিকেতনের কলাভবন গড়ে তোলার কাজে লেগে গেলেন। দেখা যাচ্ছে বিচিত্রা ক্লাবেই শান্তিনিকেতন কলাভবনের সূচনা হয়েছিল।

অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন জাগবে যে বিদেশ থেকে তিনি যে বিদ্যা শিখে এসেছিলেন তার কোনো ব্যবহার কি তিনি করেন নি? করেছিলেন বৈকি। শিলাইদহে তিনি একটি ফার্মের পত্তন করেছিলেন। অনেকটা জমি নিয়ে ক্ষেত-খামার তৈরি হল, উন্নত ধরনের লাঙল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি করালেন; এমন-কি, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য ছোটোখাটো একটি ল্যাবরেটরিও গড়ে তুলেছিলেন। খুব উৎসাহের সঙ্গেই কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু বেশিদিন সে কাজ নিয়ে থাকতে পারেন নি। শান্তিনিকেতনে পিতার কাজে সাহায্য করা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সেই শিলাইদহ—যার কুঠিবাড়ির চারদিকে গোলাপ ফুলের বাগিচা, একটু দূরে সুদূরবিস্তারী ক্ষেত, যা বর্ষার দিনে কচি ধানে সবুজ, শীতকালে সরষে ফুলের হলদে রঙে সোনালি; সেই পদ্মা নদী···এই সব যা-কিছু আমার ভালো লাগত—সেইসব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হল বীরভূমের উষর কঠিন লাল মাটির প্রান্তরে।'

পতিসরের চাষীদের সঙ্গে কিছু কিছু কাজ করেছেন। কালীগ্রাম পরগনায় ট্র্যাক্টরের সাহায্যে প্রজাদের জমি চাষ করে দিয়েছিলেন। নিজেই ট্র্যাক্টর চালিয়েছেন। যন্ত্রের হল-চালনা দেখে চাষীদের দারুণ উৎসাহ। অবশ্য চাষের দিক থেকে শিলাইদহে যতটা করেছিলেন, পতিসরে ততটা করতে পারেন নি। শিলাইদহে নিজের ফার্ম ছাড়াও চাষীদের মধ্যে আলু টমেটো এবং আখের চাষের প্রবর্তন করেছিলেন।

শান্ত প্রকৃতির লাজুক স্বভাবের মানুষটি— বাইরে থেকে দেখলে বোঝাই যেত না যে রথীন্দ্রনাথ বিচিত্রকর্মা মানুষ ছিলেন। অনেক কিছু করেছেন, মাথায় নানান রকম খেয়াল খেলত। কলকাতায় থাকতে এক সময়ে ব্যাবসাতেও নেমেছিলেন, মোটরের ব্যাবসা। বেশ ফলাও করে মোটরের কারখানা ফেঁদে বসেছিলেন। বলা বাহুল্য, ব্যাবসা বেশিদিন টেকে নি। নিজেই বলেছেন, 'ব্যাবসাতে ফেল পড়া ঠাকুর পরিবারে বংশের ধারা, আমার বেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না।' তবে বলেছেন, মোটর চালনা ছিল তাঁর বাতিক বিশেষ। কিছুদিন নূতন নূতন মডেলের গাড়ি কিনে, খুশিমত গাড়ি হাঁকিয়ে শখ মিটিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে এসে জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। যে বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রথম বিদ্যার্থী এখন তারই পরিচর্যা, পরিচালনার দায়িত্ব আংশিকভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে হল। শান্তি-নিকেতন তো শুধুই একটি বিদ্যালয় নয়, আবাসিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এ এক বৃহদাকার সংসার, এর দায়দায়িত্ব বহুবিস্তৃত। তার উপরে আবার রবীন্দ্রনাথ তখন বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার দেবার কথা ভাবছেন। শুধু সাংসারিক দিকটা দেখবার জন্যে সর্বক্ষণের জন্য একজন লোকের দরকার হল। রথীন্দ্রনাথের উপরে পড়ল সেই ভার। কিছুকাল পরে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হল তখন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং রথীন্দ্রনাথ হলেন তার যুগ্ম-সচিব। পরে দীর্ঘকাল একাই সে দায়িত্ব বহন করেছেন। মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ করের কাছে। আমরা এসে দেখেছি রথীবাবু বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, সুরেনবাবু শান্তি-নিকেতন-সচিব— দুয়ে মিলে শান্তিনিকেতনের সংসার প্রতিপালন করেছেন অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে। পরে এ দুজনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অনিলকুমার চন্দ। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় তিনিও

অনেকখানি দায়িত্ব বহন করেছেন। আর্থিক দিকটা প্রধানত রথীন্দ্রনাথকেই দেখতে হয়েছে, উদ্‌বেগ ভোগ করতে হয়েছে নিত্যদিন। কথা প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন— বাবা তো দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন। তাঁরাও একে একে আসতে লাগলেন। এলেন সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিজ, লেজনি ; এলেন ফর্মিকি, তুচ্চি ; কলিন্স, বেনোয়া, বোগ্‌দানভ, স্টেন কনো। এঁদের আসা যাওয়া, থাকার ব্যবস্থা করতে সে তুর্দিনে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছে। তুশ্চিন্তায় ভুগেছি, আবার আনন্দও পেয়েছি— একটা জিনিস গড়ে তোলবার আনন্দ।

এখানে একটি কথা বলব, কারণ আজ পর্যন্ত কাউকে এ কথাটি আমি বলতে শুনি নি। ১৯২১ সালে যখন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় তখন এত বড়ো একটা পরিকল্পনার জন্য রবীন্দ্রনাথের আর্থিক সংগতি কিছুই ছিল না। ঋণের দায়ে জমিদারি একরকম হাতছাড়া। কবি তখন তাঁর সমস্ত গ্রন্থের স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করেন। ঐ-সব গ্রন্থের রয়ালটিই ছিল বিশ্বভারতীর একমাত্র আর্থিক সংস্থান। পিতার সম্পত্তির উপরে পুত্রের কিছু অধিকার অবশ্যই ছিল ; কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে পিতা যখন গ্রন্থস্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করেন তখন পুত্র বা পুত্রবধূ তাতে কোনো আপত্তি জানান নি। অবশ্য ১৯২৩-এর পরবর্তী গ্রন্থাদির স্বত্ব রথীন্দ্রনাথ পেয়েছেন কিন্তু কবি আরো কুড়ি বছর বেঁচে থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃজনীশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে এমন কথা কারো জানা থাকবার নয়। রথীন্দ্রনাথের নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত এর আগেও পাওয়া গিয়েছে। নোবেল প্রাইজের টাকা কবি রেখেছিলেন তাঁর জমিদারি মহল্লায় একটি গ্রাম্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে— মহাজন-প্রপীড়িত গ্রাম্য চাষীদের উপকারার্থে। আত্মীয়-বন্ধুরা ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু কবি তাতে নিবৃত্ত হন নি। সেবারেও পুত্র এবং পুত্রবধূ সানন্দে পিতার মতেই

সায় দিয়েছেন। সকলেই জানেন, কয়েক বৎসর পরে ব্যাঙ্কটি উঠে গিয়ে গচ্ছিত অর্থ নষ্ট হয়েছিল। তবে যে-ক'বছর ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব ছিল, সে ক'বছর ঐ সুদের টাকাতেই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হয়েছে।

স্বার্থত্যাগ নানাভাবেই করেছেন। শেষের ক'টি বছর ছাড়া সুদীর্ঘকাল বিনা পারিশ্রমিকে শান্তিনিকেতনের সেবা করেছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল। সে উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথ দিয়েছেন যতখানি, নেন নি ততখানি— সেই কথাটি মনে রেখে স্নেহশীল পিতা বলেছিলেন, 'সেদিন ভোজের পাত্রে রাখ নি ভোগের আয়োজন, / ধনের প্রশ্রয় হতে আপনারে করেছ বঞ্চিত।'

এখানেও একটি কথা বলা আবশ্যক। অশনে আসনে বসনে গৃহসজ্জায় উদ্যান-রচনায় যে শোভন সুন্দর রুচির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে ভোগী পুরুষ ব'লে মনে করা অস্বাভাবিক ছিল না। অনেকে তাই মনে করতেনও। উত্তরায়ণে উদয়ন নামে তিনি যে সুরম্য গৃহটি নির্মাণ করেছিলেন সেটিকে আশ্রমবাসীরা অনেকেই সুনজরে দেখেন নি, ব্যঙ্গ করে বলতেন রাজবাড়ি। আসলে মানুষটি ছিলেন শৌখিন স্বভাবের। গৃহনির্মাণ-শিল্পের একটি সুরম্য নিদর্শন হিসাবেই গৃহটি নির্মাণ করেছিলেন। নিজ বাসগৃহরূপে সেটিকে বেশি দিন ব্যবহারও করেন নি। উদ্যান-সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি গৃহেই দিন কাটিয়েছেন। কাজেই উদয়ন গৃহ নির্মাণে আমি বলব, ভোগলিপ্সার চাইতে সৌন্দর্যলিপ্সাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। কবির মৃত্যুর পরে উদয়ন গৃহ রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা-রূপে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। একাংশ বিশ্বভারতীর মহামান্য অতিথিদের বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হত।

রথীন্দ্রনাথের বহুবিধ গুণপনার কথা আগেই বলেছি। অনেকেই জানেন না যে তিনি প্রথম শ্রেণীর একজন আর্কিটেক্ট ছিলেন ; অথচ

ইঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যা কখনো অধ্যয়ন করেন নি। বসে বসে নানারকম বাড়ির ডিজাইন করা তাঁর অন্যতম 'হবি' ছিল। রথীবাবু এবং সুরেনবাবুতে মিলে শান্তিনিকেতনে যে ছোটো ছোটো হস্টেল এবং বাসগৃহের পরিকল্পনা করেছিলেন তার বিশেষ একটা চেহারা এবং চরিত্র ছিল। এখানকার পরিবেশের সঙ্গে সে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল।

রথীবাবু সম্পর্কে একটা কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে— যা-কিছু করেছেন তাতেই নিজস্বতার ছাপ রেখেছেন। নতুনত্বের দিকে খুব একটা ঝোঁক ছিল। শ্রীনিকেতনে গ্রাম-সংগঠনের কাজের সঙ্গে শিল্পসদন নামে যে কারুশিল্পবিভাগ স্থাপিত হয়েছিল তা প্রকৃত-পক্ষে রথীন্দ্রনাথ এবং প্রতিমা দেবীর সৃষ্টি। গ্রাম্য কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এক সময়ে অল্প মূল্যে নতুন নতুন ডিজাইনের শাড়ি, বেড কভার, দরজা-জানলার পর্দা, কাঠের আসবাবপত্র, চামড়ার হ্যাণ্ড ব্যাগ, পোড়ামাটির কাপ ডিশ ইত্যাদি প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে দেশে বিদেশে যখনই ভ্রমণে গিয়েছেন, নানাবিধ কারুশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন এবং ক্রমে সে-সব শিল্প শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের অনুকরণে সে-সব শিল্পসামগ্রী এখন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। হস্তশিল্পের প্রসারে শ্রীনিকেতন শিল্পসদন এবং শান্তিনিকেতন কলাভবন (কারু-বিভাগ)-এর দান অপরিসীম। এ কথা অনেকে ভুলতে বসেছেন যে এ-সব হস্তশিল্পের প্রচলনে রথীন্দ্রনাথের হাত ছিল অনেকখানি।

সর্বোপরি যে কারণে রথীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্মরণীয়, সেটি হল বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন। এটি একান্তভাবেই রথীন্দ্রনাথের নিজের হাতে গড়া। বহু বৎসর ধরে বহু শ্রমে বহু যত্নে তিনি ঐ সংগ্রহশালাটি গড়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করেছেন; কবির লেখা অগণিত চিঠিপত্রের কপি, শত শত ব্যক্তির কাছ থেকে

বিনীত আবেদন জানিয়ে সংগ্রহ করেছেন। তারই ফলে অতি মূল্যবান চিঠি-পত্র-সিরিজ প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যখন দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেছেন তখন তিনি যে রাজকীয় সংবর্ধনা লাভ করেছেন, তার বিবরণ এবং তাঁর সম্বন্ধে যে-সব প্রবন্ধাদি লেখা হয়েছে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা থেকে রথীন্দ্রনাথ বহু ব্যয়ে তার 'কাটিং' সংগ্রহ করেছেন। গবেষণাকার্যের জন্য এ-সমস্তই মহামূল্য সম্পদ। এ-সব উপকরণের সদ্‌ব্যবহার হলে তবেই রথীন্দ্রনাথের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

আজীবন নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করেছেন। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব হিসাবে তিনিই ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ কিন্তু এত নিঃশব্দে কাজ করতেন যে তিনি শান্তিনিকেতনে আছেন কি না-আছেন তাও সব সময় টের পাওয়া যেত না। শান্তিনিকেতন জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডেরই পরিকল্পনা করতেন রথীবাবু এবং সুরেনবাবু। উভয়েই নেপথ্যচারী মানুষ। কাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে দুজনেই বেমালুম সরে পড়তেন। সুরেনবাবুকে তবু দেখা যেত কারণ তাঁর একটা আপিস ছিল। রথীবাবুর আপিস ছিল না; তিনি আপন ঘরে বসে কাজ করতেন। হাতুড়ি বাটালি নিয়ে কাজ করতেন, তারই ফাঁকে আপিসের কাজও চলতে থাকত, যাকে যা নির্দেশ দেবার দিতেন। উপাচার্যের পদে বসেও এ রীতির কোনো পরিবর্তন করেন নি। কাজ নিয়ে আমাকেও অনেক সময় তাঁর কাছে যেতে হয়েছে। দিব্য র‍্যাদা ঘষতে ঘষতে কাজের কথা বলতেন, একটুও বেখাপ্পা লাগত না। আসল কথা, মানী ব্যক্তিকে সকল কাজেই মানায়। হাতুড়ি হাতেও তাঁকে খাঁটি অভিজাত বলেই মনে হত। একজন বিদেশী সাহিত্যিকের একটি উক্তি মনে পড়ছে— To work for love of the work is aristocratic। রথীবাবু ছিলেন সেই অভিজাত কারিগর। ভালোবেসে কাজ করতেন বলেই যা-কিছু করতেন তারই গৌরব বাড়ত। মনে আছে

শিল্পকর্মে রত রথীন্দ্রনাথ

একবার তাঁর চামড়ার কাজ আর কাঠের কাজের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন— জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের ; কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের। কথা ক'টি শুনতে বড়ো ভালো লেগে-ছিল। এমন সুন্দর করে যিনি কথা বলতে পারতেন তাঁর লেখক হবার পথে কোনোই বাধা ছিল না অথচ কত সামান্যই তিনি লিখে গেলেন।

লাজুক স্বভাবের মানুষ বলে খুব একটা মিশুক প্রকৃতির ছিলেন না। কর্মীদের বেশির ভাগই তাঁকে দূরে থেকে সমীহ করে চলেছেন, আপনজন বলে ভাবতে পারেন নি। তিনি কিন্তু সকলের খবরই রাখতেন, কারো বিপদে-আপদে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন ; কিন্তু এতই গোপনে যে অপর কেউ তা জানতে পারত না। ডান হাতে যা দিয়েছেন, বাঁ হাতও তা জানতে পারে নি। অপর একটি জিনিসও লক্ষ্য করেছি। তাঁর নিজস্ব একটি গাড়ি ছিল। শান্তিনিকেতনে তখন ঐ একটিই গাড়ি। মহামান্য অতিথিদের জন্যেই সেটি ব্যবহৃত হত, নিজে পারতপক্ষে ব্যবহার করতেন না। আশ্রমবাসী কারো বাড়িতে যেতে হলে হেঁটেই যেতেন, কখনো রিক্‌শ করে। এটিও তাঁর সেই স্বভাব-সৌজন্যের নিদর্শন। সকলেই অল্পবিত্ত কর্মী, দরিদ্র সংসারী— পাছে বড়োমানুষি প্রকাশ পায়, এই বোধটি মনে গাঁথা ছিল। আমার দরিদ্র গৃহেও কতদিন তিনি পায়ে হেঁটেই চলে এসেছেন। আমি একটু অতিরিক্ত চা-বিলাসী, এসে দেখেছেন আমি একটি চায়ের কাপ সুমুখে নিয়ে বসে আছি। ঘরে ঢুকেই বলতেন— That inevitable cup of tea! চা খেতে ভালোবাসি বলে যখনই কোনো কাজে আমাকে ডেকেছেন তখনই চা-জলখাবার এসেছে, নিজে হাতে চা করে খাইয়েছেন। শেষদিকে বছরতিনেক তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে হয়েছিল। তাঁর অসামান্য সৌজন্য, কর্মদক্ষতা এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তা দেখে কত সময়ে চমৎকৃত হয়েছি। সত্যি বলতে কি, তাঁর সঙ্গে কাজ করে যেমন আনন্দ পেয়েছি, তেমন আর কখনো পাই নি।

এমন নীরবে, এত কম কথা বলে কোনো মানুষকে আমি কাজ করতে দেখি নি। অতি বৃহৎ কাজও অতি নিঃশব্দে সম্পন্ন হত। হাঁক-ডাক তো দূরের কথা তাঁকে কখনো উঁচু গলায় কথা বলতে শুনি নি। এমন নিখুঁত ভদ্রতাও আমি আর কোনো মানুষের মধ্যে দেখি নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সহজাত সৌজন্য পরিচিত মহলে প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছিল। এই যে স্বভাবের শোভনতা এও তাঁর স্বভাবগত রুচিবোধ এবং সৌন্দর্যপ্রিয়তারই অঙ্গ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর স্নেহপ্রীতি-সৌজন্যের কত যে পরিচয় পেয়েছি তা বলে শেষ করতে পারব না। একবার কোনো উপলক্ষে তাঁর একটি ভাষণ আমাকে লিখে দিতে বলেছিলেন। দিয়েছিলাম; দুদিন পরে তাঁর এক চিঠি পেলাম: আপনার দৌলতে অনেক প্রশংসা অর্জন করা গেল। আজ দুদিন ধরে ভাষণটির জন্যে অনেকে এসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছেন। আমি যে কী ভয়ানক লজ্জিত বোধ করছি কী বলব। মনে হচ্ছে আপনার প্রাপ্য প্রশংসা আমি অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিচ্ছি... ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্তাব্যক্তি এবং কর্মীর মধ্যে এরূপ প্রীতির সম্পর্ক একমাত্র শান্তিনিকেতনেই সম্ভব। যাক, এ প্রসঙ্গে অধিক না বলাই ভালো। কারণ আমার স্বভাব রথীন্দ্রনাথের বিপরীত— তিনি আত্মগোপনে সিদ্ধহস্ত, আমি আত্মপ্রচারে।

সর্বময় কর্তা হয়েও কর্তৃত্ব না করা একটা মস্ত বড়ো গুণ। রথীন্দ্রনাথের সে গুণটি ছিল। বিশ্বভারতী ঠিক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়, এখানে বহু বিচিত্র কাজের সমাবেশ। অ্যাকাডেমিক বিভাগ ছাড়াও আছে সংগীতভবন, কলাভবন, গ্রাম-সংগঠন, শিল্পসদন, ডেয়ারি ফার্ম, পোলট্রি ফার্ম ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে বারো মাসে তেরো পার্বণ। রথীন্দ্রনাথের মস্ত বড়ো সুবিধা ছিল যে এর কোনো ব্যাপারেই তিনি নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন না, কোনো কোনো বিষয়ে তাঁকে বিশেষজ্ঞই বলা যেতে পারত। তথাপি কোনো বিভাগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন না।

ছ' বছরের জন্য উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু দুবছর যেতে-না-যেতেই তিনি কাজে ইস্তফা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যে কাজ দীর্ঘ দিন ধরে করে আসছিলেন স্বেচ্ছাসেবায় বিনা পারিশ্রমিকে এখন বেতনভুক কর্মী হিসাবে সে কাজে আর আনন্দ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। দেখাই যাচ্ছিল কাজ থেকে তাঁর মন উঠে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি এর স্বভাবচরিত্রটা মোটামুটি বুঝে নিয়েছিলেন। কালের পরিবর্তনে বিশ্বভারতীরও পরিবর্তন হবে সেটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। তবে রথীবাবুর সময়ে যে পরিবর্তন হয়েছে তা বিশ্বভারতীর স্বভাবধর্মের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে হচ্ছিল। নবপর্যায়ে যখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে কাজ শুরু হল তখনো বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং জীবনধারা কিভাবে পরিচালিত হবে তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। সে আলোচনার ভিত্তিতে একটি খসড়াও তৈরি হয়েছিল কিন্তু বৎসর-কাল যেতে-না-যেতেই পরীক্ষা এবং ডিগ্রি ডিপ্লোমা সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে এমনভাবে পেয়ে বসল যে আর-সমস্তই চাপা পড়ে গেল। আমাদের সেই পরিকল্পনা কোথায় গেল ভেসে। পরে উক্ত খসড়ার দুর্গতি নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে মাঝে মাঝে হাস্য-পরিহাস হত। বলা বাহুল্য, সে পরিহাস কিঞ্চিৎ করুণরসমিশ্রিত। এর অনতিকাল পরেই তিনি কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন। এ কথা আজ আর কারোই বুঝতে বাকি নেই যে তিনি চলে যাওয়াতে শান্তিনিকেতনের অশেষ ক্ষতি হয়েছে। শান্তি-নিকেতন জীবনে ক্রমেই নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল। তিনি কতখানি কর্মদক্ষ এবং বিচক্ষণ অধিনায়ক ছিলেন তাঁর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা আরো সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল।

আত্মপ্রচারের যুগে আমাদের বাস। নিজেকে জাহির করবার নির্লজ্জ প্রয়াস সুসভ্য সমাজের এতই গা-সহা, মনে হয় শিক্ষিত

মানুষদেরও এ জিনিস তেমন আর শিষ্টাচারে বাধে না। এক রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই দেখলাম বহুগুণে গুণান্বিত একজন মানুষ সারাজীবন লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গেলেন। পারতপক্ষে লোকসমক্ষে আসেন নি, নিজের কথা বলেন নি, অপর কেউ তাঁর সম্বন্ধে বলে তাও চান নি। নিজেকে এমন ভাবে বিলোপ করে দেওয়ার দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। এক সময়ে আত্মকথা লিখতে বসেছিলেন কিন্তু সেখানেও স্বভাবকুণ্ঠা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। গোড়ার দিকে নিজ বালক বয়সের কথা, ছাত্রজীবনের কথা কিছু বলেছেন, তার পরে সমস্তই পিতার কথা। আত্মকথা হল পিতৃকথা, জীবনস্মৃতি হয়েছে 'পিতৃস্মৃতি'। বাস্তবিক পক্ষে পিতার কাজে নিজেকে এমন একান্তভাবে নিয়োজিত করেছিলেন যে নিজস্ব জীবন বলে বলতে গেলে কিছু তাঁর ছিল না। এই আত্মবিলোপের মর্যাদা অপরে কতখানি বুঝেছে জানি না— কিন্তু স্নেহশীল পিতা অবশ্যই তা বুঝেছিলেন। পুত্রের জন্মদিনে যে কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন তাতে বলেছেন :

'কর্মের যেখানে উচ্চ দাম
সেখানে কর্মীর নাম
নেপথ্যেই থাকে এক পাশে।'

রবীন্দ্রনাথের চতুষ্পার্শ্বে বহু মানুষ এসে জড়ো হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির দীপ্তি সকলের উপরেই অল্পবিস্তর পড়েছে, কিন্তু সব চাইতে কম পড়েছে রথীন্দ্রনাথের উপর। কারণ তিনি থাকতেন সকলের পিছনে, লোকচক্ষুর অগোচরে। পিতৃপরিচয়ের কোনো সুযোগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কখনো নেবার চেষ্টা করেন নি। রবীন্দ্রঅনুগামীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বলতে পারতেন,

'আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।'

রথীন্দ্রনাথ

অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আত্মীয় হয়ে রথীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে সংকোচ বোধ হয়, …তাই আমি যেটুকু জানি সংক্ষেপে লিখতে রাজি হয়েছি। আমার অক্ষমতার ত্রুটি পাঠকবর্গ আশা করি মার্জনা করবেন।

রথীন্দ্রনাথকে আমি শিশুকাল থেকেই দেখে আসছি। প্রথমে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এবং তার পর বাল্যকালে সৌভাগ্যবশত শান্তিনিকেতনে চ'লে আসার জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, বয়সে আমি তাঁর পুত্রতুল্য। এই বয়সের ব্যবধানের জন্য এবং আমার অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের জন্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমি তাঁর সঙ্গে মিশি নি, তাই তাঁর কর্মজীবনই আর পাঁচজনের মতো আমার চোখে পড়েছে।

তাঁর পিতার মতো বিরাট ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হলেও এটা ঠিক যে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রবণতা ও অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ছেলেবেলায় তাঁকে মোটরের কারখানা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। কল-কারখানা সম্বন্ধে তাঁর স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ও সাধারণ জ্ঞান ছিল।… রথীন্দ্রনাথের এ বিষয় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পেয়েছি।

জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা-ভবনে তাঁর একটি ছোটোখাটো ল্যাবরেটরিও ছিল। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ ও অনুরাগ ছিল। যদিও তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছানুসারে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের জন্যই আমেরিকায় গিয়েছিলেন ও সে বিষয় কৃতকার্যতা লাভ করে বি. এস্‌সি. ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছিলেন।

তার পর বলতে হয় ঘর-সংসারের কাজ— যাকে আমরা গৃহিণী-পনা বলি, সে কাজেও তিনি আশ্চর্যরকম পারদর্শিতা দেখাতেন। আচার চাটনি জ্যাম জেলি করা থেকে রান্নার বিষয়ও তাঁর প্রচুর উৎসাহ ছিল এবং তিনি সে-সবও গতানুগতিকভাবে করতে ভালোবাসতেন না বলে কিছু কিছু নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করতেন। খুব ভালো দই পাততে পারেন বলে তাঁর নাম ছিল। সাধারণ পুরুষদের এ-সব ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে করলেও অত্যন্ত আনাড়িপনারই পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বহু সুগৃহিণীকেও হার মানাতে পারতেন।

তার পর ঘর সাজানো ও বাগান করার মধ্যেও তিনি তাঁর শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের এবং অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন। যে-কোনো রকমের ব্যবস্থাপনা— সে বাড়িরই হোক আর বাইরেরই হোক খুব চমৎকার ভাবে করতে পারতেন।

বাড়ি তৈরির বা আসবাব তৈরির নকশার কাজেও তিনি পটু ছিলেন। সব ছাপিয়ে গিয়েছিল তাঁর অপূর্ব সুন্দর কাঠের কাজ। কাঠের কাজে তিনি একজন সুনিপুণ শিল্পী ছিলেন। নানা রঙের কাঠ সংগ্রহ করে, অন্য কোনো রঙ তাতে না দিয়ে কাঠেরই স্বাভাবিক রঙ রেখে তিনি ছবি তৈরি করেছেন দেখেছি। ছবি আঁকাতেও তিনি পিছিয়ে যান নি। তিনি যে একজন বড়ো আঁকিয়ে ছিলেন তা বলছি না, কিন্তু ফুলের নানারকম স্টাডি (study) ও প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে অনেক ছবি তিনি এঁকেছেন। তার পর এদেশে চামড়ার কাজের প্রবর্তকও তিনিই।

আজ শান্তিনিকেতনে এত সুন্দর সুন্দর চামড়ার কাজের ও বাটিকের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়, এর মূলে সেই রথীন্দ্রনাথ। তাঁর হাতে সত্যই যাদু ছিল, কী সুন্দর করে কী নিপুণতার সঙ্গে যে

তিনি হাতের কাজ করতে পারতেন তার পরিচয় আপনারা এই প্রদর্শনীতে কিছু কিছু পাবেন।

লেখবারও তাঁর ক্ষমতা ছিল। তিনি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন। এ ছাড়া বিজ্ঞানের উপর 'প্রাণতত্ত্ব' ও 'অভিব্যক্তি' বই দুখানিও তাঁর লেখা। শেষবয়সে ইংরাজিতে লেখা 'অন দি এজেস্ অব টাইম' (*On the Edges of Time*) বইখানি বহুলোকের প্রশংসা অর্জন করেছে। বিচিত্রা পত্রিকায় তাঁর গদ্য-কবিতা ও বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

এবার তাঁর প্রশাসনিক কাজের কথা বলি। দীর্ঘকাল তিনি এই বিশ্বভারতীর কাজে লিপ্ত ছিলেন। শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত ছিল। তখন অর্থ আজকের মতো এমন সুপ্রচুর ছিল না। এমন এক সময় গেছে যখন অর্থের নিদারুণ সংকট উপস্থিত হয়েছিল। সে সময় তিনি হাল ধরে থেকে একেবারে বানচাল হতে দেন নি। তাঁর সে সময়কার সহকর্মীরা নিশ্চয় এ-বিষয়ে ভালো করে জানেন।

লোক তৈরি করে নেবার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কি সংসারের কাজের জন্য কি অফিসের কাজের জন্য তিনি খুব চমৎকার-ভাবে লোক তৈরি করতে পারতেন।

এখানে বিভিন্ন দেশের বহু মান্যগণ্য ও ধনী ব্যক্তি এসেছেন বিশ্বভারতীর অতিথি হয়ে, তাতে প্রচুর ব্যয় হয়েছে ও নানারকম ব্যবস্থাদি করতে হয়েছে। সে-সব ভার সম্পূর্ণভাবে রথীন্দ্রনাথের উপরেই ছিল। প্রথম দিকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার যাবতীয় ব্যয়ভারও বহন করেছেন। বিশ্বভারতীকে তিনি সত্যই দীর্ঘকাল নানাভাবে সেবা করেছেন সে-কথা বিশ্বভারতী আশা করি ভবিষ্যতে ভুলবেন না। কোনো কিছু নিয়ে হৈচৈ করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। তিনি খুব ধীর গম্ভীর ও পরিচ্ছন্ন ভাবে সব কাজ করে যেতেন।

একসঙ্গে বহু কাজ তাঁকে করতে দেখেছি নিরলসভাবে ও বিনা উত্তেজনায়। আলস্য তাঁর একেবারেই ছিল না।

পৃথিবীতে কোনো মানুষই নিখুঁত নয়, অল্পবিস্তর সকলেরই দুর্বলতা ও অক্ষমতা থাকে, সেটাকেই বড়ো করে দেখলে মানুষকে অপমান ও তার শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। প্রত্যেক মানুষের গুণের দিকটা দেখতে পারলে আমরাই লাভবান হই।

এক কথায় রথীন্দ্রনাথের বহুমুখী শক্তি ছিল। যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা তাঁর একাধিক গুণের ও বিভিন্ন কর্মশক্তির পরিচয় পেয়েছেন। সর্বোপরি তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ছিল। কেউ বোধহয় কখনও বলতে পারবেন না যে তাঁর সৌজন্য ও ভদ্রতাবোধের অভাব তাঁর আচরণে দেখেছেন। এটাও কম গুণের কথা নয়।

…তাঁর অনেক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার প্রায় সবটুকুই তাঁর পিতার বিরাট ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার আড়ালে পড়ে গেছে। অন্যান্য কারণ বাদ দিলেও তার আরো একটা কারণ হচ্ছে তাঁর একেবারেই আত্মপ্রচার ছিল না। আমি তাঁর সম্বন্ধে একেবারেই অত্যুক্তি করি নি।

রথীন্দ্র-স্মৃতি

অমিতা ঠাকুর

আমি যখন বাবার মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে যাই তখনই প্রথম রথীন্দ্রনাথকে দেখি। ওই দেখা পর্যন্তই। উনি আমায় কখনও কাছে ডাকেন নি, আর আমিও স্বভাবতই ওঁর কাছে যাই নি।

ওঁর চেহারা ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের মতোই— লম্বা, বড়ো বড়ো চোখ, খাড়া নাক। মুখশ্রী ভালো, তবে রঙ শ্যামবর্ণ ছিল। ওঁর পিতার চেহারার সঙ্গে কিন্তু কোনো সাদৃশ্য ছিল না বরং আমার মনে হয় ওঁর মামার কিছুটা আদল পাওয়া যেত। ওঁকে দূর থেকেই দেখতাম সাইকেল চড়ে ঘুরতে। তখন ওঁরা কোথায় থাকতেন মনে পড়ছে না। উত্তরায়ণ তখনও হয় নি— ঐখানে মাটির বাড়ি খড়ে-ছাওয়া একটা ছিল মনে হচ্ছে, যেখানে পিয়ার্সন সাহেব থাকতেন। গুরুদেবও সে বাড়িতে অল্পদিন ছিলেন। শ্রীনিকেতনের দোতলায় একবার রথীন্দ্রনাথদের থাকতে দেখেছি। তখন শ্রীনিকেতন হয় নি, সুরুলের কুঠিবাড়ি নামেই ছিল। দেহলিতে দোতলায় থাকতেন গুরুদেব আর নীচে একতলায় দিনেন্দ্রনাথরা। 'শান্তিনিকেতন' বাড়ির একতলায় দ্বিপেন্দ্রনাথ। নিচু বাংলায় দ্বিজেন্দ্রনাথ থাকতেন সামনের ঘরটায় ও ভিতরবাড়িতে এক সময় বড়মা হেমলতা দেবী। বেণুকুঞ্জে গুরুদেবের থাকা ও দিনেন্দ্রনাথদের থাকাও মনে পড়ে আলাদা আলাদা সময়ে। হয়তো তখন রথীন্দ্রনাথরা বেণুকুঞ্জেই ছিলেন।

তখন বিশ্বভারতী হয় নি ; হবার সূচনা হচ্ছে মাত্র। কাজেই বিশ্বভারতীর কর্মভার রথীন্দ্রনাথের উপর পড়ে নি তখনও। আর

বিদ্যালয়ের কাজে মাস্টারমশায়রাই ছিলেন— যেমন নেপালবাবু, প্রমদাবাবু, জগদানন্দবাবু, হরিবাবু প্রমুখ। তখনও ইলেকট্রিসিটি আসে নি যতদূর মনে পড়ে— প্রেস একটা হয়েছিল মনে আছে। কাজেই কী কাজের ভার নিয়ে উনি ওখানে ছিলেন বলতে পারব না। বিদ্যালয়ের অর্থসচিব হতে পারেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই রথীন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর জন্মের আগে ভাইপো-ভাইঝিরা তাঁদের পারিবারিক খাতায় রবিকাকার ছেলে হবে না মেয়ে হবে— দেখতে কেমন হবে— স্বভাব কেমন হবে এ-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী লিখতে লাগলেন। সব ভাইপো-ভাইঝিদেরই প্রিয় ছিলেন তাদের রবিকাকা। এ-সব কথা রথীন্দ্রনাথ তাঁর *On the Edges of Time* বইটিতে লিখে গেছেন, কাজেই অনেকেরই নিশ্চয় জানা আছে। রথীন্দ্রনাথের জন্মের সময় মহর্ষি বেঁচে, খুব সম্ভব তিনিই ওঁর নামকরণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেন নি। শিলাইদহে শিক্ষক নিযুক্ত করে পড়িয়েছেন যতদিন না শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রদের অন্যতম রথীন্দ্রনাথ। সংস্কৃতও খুব ভালো করে শিখতে হয়েছে বোঝা যায়, কারণ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ওঁর লেখা প্রথম অনুবাদ পুস্তক। এ ছাড়া বিজ্ঞানের উপর প্রাণতত্ত্ব ও অভিব্যক্তি বই দুখানিও তাঁর লেখা। পিতার ইচ্ছাতেই উন্নতমানের কৃষিবিদ্যা ও গো-পালন শিক্ষার জন্য আমেরিকা গেলেন ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে এলেন ; বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকেও একই সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন একই বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে। তখন রবীন্দ্রনাথ পল্লী সংগঠন ও কৃষি ইত্যাদির উন্নতির চিন্তা তো করছিলেনই, কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন জমিদারিতে, রথীন্দ্রনাথরা দেশে ফেরবার আগেই। বিজ্ঞান-সচেতন রবীন্দ্রনাথ তাই পুত্র, বন্ধুপুত্র ও জামাতা

নগেন্দ্রনাথ— সকলকেই এ বিষয়ে শিক্ষার জন্যই বিশেষ করে পাঠিয়েছিলেন কেবলমাত্র পল্লীর সর্ববিষয়ে উন্নতির কথা ভেবেই যে কৃষিপ্রধান দেশে আমাদের কৃষির উন্নতির প্রয়োজন। তা ছাড়া পল্লীর সবরকম উন্নতির কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁদের এই কাজেই লাগাবার ইচ্ছে গোড়া থেকেই ছিল।

আমেরিকা থেকে ফেরার পর রথীন্দ্রনাথের বিয়ে হল গগনেন্দ্র-নাথদের অল্পবয়সে-বিধবা ভাগ্নী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম বিধবা বিয়ে দিলেন নিজে অগ্রণী হয়ে।

ক্রমে ক্রমে রথীন্দ্রনাথের অনেক গুণের পরিচয় পেয়েছি। ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও হয়তো ওঁর সব গুণের কথা জানতেন না ; কারণ উনি একদিকে খুব চুপচাপ মানুষ ছিলেন— দিনেন্দ্রনাথের মতো মজলিশি তো একেবারেই নয়। অসম্ভব দায়িত্বজ্ঞান ছিল। কখনও ওঁকে খুব উত্তেজিত হতে দেখি নি— সব কাজই বেশ ধীরে-সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় করে যেতেন। ওঁর একটা মস্ত গুণ ছিল, ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ। এটা ঠাকুরবাড়ির অধিকাংশের ছিল, কিন্তু ওঁর ছিল খুব বেশি মাত্রায়। পরবর্তী কালে হীরেন্দ্রনাথ দত্তমশায় ওঁর কথা লিখতে গিয়ে এ বিষয় বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলেন। যাঁরা ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাঁরা ওঁকে ভালো না বেসে থাকতে পারেন নি ; অন্তত খুব গুণমুগ্ধ হয়েছেন।

যখন ওখানে ইলেক্‌ট্রিসিটি এল তার কিছু পরে আমার স্বামীকে power house-এর দেখাশোনার ভার দিয়েছিলেন। উনিও মনের মতো কাজ পেয়ে খুব খুশিতে ছিলেন। রথীন্দ্রনাথ ওঁকেও স্নেহ করতেন।

উত্তরায়ণ আমাদের চোখের সামনে গড়ে উঠল ধীরে ধীরে। প্রথমে যেটা এখন রান্না ভাঁড়ার ও লোকজন থাকার বাড়ি— নিচু একতলা, সেখানেই ওঁরা থাকতে লাগলেন। যেখানেই থাকুন তাকে

সুন্দর করে তোলার চেষ্টা সবসময় থাকত, তাই ওখানকার দেয়ালে fresco করা হল। ওখানে থাকতে থাকতেই উদয়নের plan হতে লাগল ও কাজ শুরু হয়ে গেল। একেবারে এক নাগাড়ে ও-বাড়ি হয় নি, খানিকটা খানিকটা করে হয়েছিল। ইতিমধ্যে কোণার্ক বাড়িটি হল— চার দিক খোলা মাঝখানে উঁচু বড়ো চাতালের মতো, চারধারে সিঁড়ির ধাপ— একটা stage মতো হল। পাশে ছোটো ছোটো অনেক ঘর তাতে গুরুদেব থাকতেন— বদলে বদলে। ঐ বাড়ির একটা বিশেষত্ব ছিল— বাড়ির সংলগ্ন কাঁকর দিয়ে মস্ত উঁচু একটা চাতাল করা হয়েছিল তার গায়ে ক্যাকটাস গাছ ধারে ধারে। সবই রথীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার ইচ্ছে মতন করে দিতেন। বিকেলে গুরুদেব ঐ কঙ্কর চাতালে বসতেন, মাস্টারমশায়রা যেমন ওঁর কাছে আসতেন তেমনি আসতেন। ওখানে নাচ গান সবই হয়েছে। তার পর বেশ-কিছুদিন পর সাপ বিছে এ-সবের জন্যই শুনেছি ওটা ভেঙে ফেলা হল। আগেই বলেছি রথীন্দ্রনাথ তাঁর বাবার ইচ্ছা সবসময় পালন করতেন ও পূর্ণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তাঁর নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করতে শুনি নি। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বিনা প্রতিবাদে গুরুদেবকে মেনে চলেছেন সারা জীবন। একবার গুরুদেবের ইচ্ছে হল গাছের উপরে ঘর বানিয়ে থাকবেন। হলও তাই, শ্রীনিকেতনে জাপানি মিস্ত্রি কাসাহারাকে দিয়ে কাঠের ঘর মায় ওঠবার সিঁড়ি সব তৈরি হল। গুরুদেব কিছুদিন রইলেনও ; কিন্তু যাকে দিয়েই করান রথীন্দ্রনাথ সাহায্য না করলে, সব দেখেশুনে না করালে কিছুই সম্ভব হত না।

গুরুদেবের মুখেই শুনেছি, একবার বিলেত যাচ্ছেন, টাকার খুব টানাটানি, তাই উনি জাহাজে প্রায় কিছুই খেতেন না— একটু টোস্ট বা সামান্য ঐরকম কিছু খেতেন। যা না খেলেই নয়। জাহাজের ডিনার, লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট সব বাদ। পরে শুনলেন যে খরচ তো পুরো

দিতেই হয়েছে টিকিট করার সময় ; তার পর যা উনি মেন্যুর বাইরে খেয়েছেন, অতি সামান্য হলেও তার জন্য special charge বেশ লেগেছে। অথচ যদি একটু আভাসেও রথীন্দ্রনাথকে জানাতেন তা হলেই না খেয়ে টাকা গুনতে হত না। এইরকম মানুষটিকে নিয়ে রথীন্দ্রনাথ দেশবিদেশ ঘুরে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিলেন। আশ্চর্য যে কত বড়ো বড়ো মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন কিন্তু কখনও সে-সব কথা গল্পচ্ছলেও বলতে শুনি নি স্বামী-স্ত্রী কাউকেই। কখনও কোনো বিষয় নিয়ে জাঁক করা বা বড়াই করা একেবারেই ছিল না।

বিদেশী যে কত এসেছেন শান্তিনিকেতনে! তাঁদের সমস্ত ব্যবস্থা রথীন্দ্রনাথই করতেন। ঐ ডাঙা-মাঠে বিদেশীদের অভ্যাসমত ব্যবস্থাদি করা খুব সহজ ছিল না। রথীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেই বা করতে পারত, কারণ এ-সব অভিজ্ঞতা তো আর কারো ছিল না। এ-সব খুঁটিনাটি কথা বলছি এই কথাটা বোঝাবার জন্য যে শান্তি-নিকেতনে তথা বিশ্বভারতীতে রথীন্দ্রনাথের অবদান তুচ্ছ থেকে বৃহৎ, সব বিষয় যে কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না। সেটা আজ তাঁর শতবর্ষপূর্তিতে সকলেরই জানা দরকার। পিতার ব্যক্তিত্বের আড়ালে সবই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ রথীন্দ্রনাথের আত্ম-প্রচার বা প্রকাশ কোনোটাই ছিল না।

নিঃসন্তান দম্পতি শেষকালে গুজরাটি একটি ফুটফুটে শিশুকে গ্রহণ করলেন। নিশ্চয়ই গুরুদেবের মত নিয়ে নাম রাখলেন নন্দিনী, ডাকতেন পুপে বলে। সুন্দর নাচতে শিখল। বিদেশে যখন গেল ওঁদের সঙ্গে, তখন ফরাসী ভাষা বেশ একটু শিখল— আর বলতেও পারত।

তারই উপর গান রচনা করলেন গুরুদেব "তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধুকূলে", "অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি / তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।"

প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজস্ব পথ আছে যাতে সে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে তা পায় না। জীবনের তাগিদে তাকে অন্য পথে চলতে হয় যাতে তার আনন্দ নেই রুচি নেই— এ তো আমরা সবসময়ই দেখতে পাচ্ছি।

রথীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যদিও ঠিক তা হয় নি, তবু পিতার ইচ্ছামতই তাঁকে চলতে হয়েছে গোড়া থেকে। বিশ্বভারতীর বিরাট দায় তাঁকে বহন করতে হয়েছে। আমি অনেক সময় ভাবি, আমেরিকা থেকে ফেরার পর পল্লী-সংগঠন কাজে কেন জমিদারিতে তাঁকে বসালেন না। সুরুলের কুঠিবাড়ি কিনে সেখানে অবশ্য কিছুদিন ছিলেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সেখানে তখন থাকা গেল না— যতদূর জানি। যাই হোক, শ্রীনিকেতনের পত্তন হতে সেখানকার কাজের ভারও পড়েছিল তাঁর ওপর।

রথীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতীর কাজে ছিলেন তখন অত্যন্ত অর্থ-সংকট। একেক সময় এমনও হয়েছে যে মাইনে দেওয়া যাচ্ছে না, প্রায় অচল অবস্থা। সেইরকম একসময় পূর্বপল্লীর জমি বিক্রি করতে হয়েছে সুলভে অর্থাৎ life member করে জমি দিয়ে দিয়ে। ঐ দুর্দিনে রথীন্দ্রনাথকেই হাল ধরে থাকতে হয়েছে।

রথীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। পারিবারিক ভদ্রতা যে কী জিনিস তা তাঁর আচরণে অত্যন্ত পরিস্ফুট ছিল তা আগেই বলেছি। সংসারের কাজেও তাঁর দক্ষতা কম ছিল না। দেশবিদেশ থেকে অতিথি-অভ্যাগত আসতেন ; তাঁদের ব্যবস্থাপনার ভার সম্পূর্ণ ওঁর উপর ছিল। স্থানীয় লোকজনকে এমন আশ্চর্যরকম তৈরি করেছিলেন যে বিভিন্নজনের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য পানীয় তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করতে পারত। দই খুব ভালো পাততে পারতেন। নানারকম জ্যাম জেলি ইত্যাদি দিয়ে experiment করে নতুন স্বাদ-গন্ধের জিনিস তৈরি করতেন। রান্নারও experi-

ment করতেন। ঘরদোর সাজানো, দিশিভাবে এবং বাড়ি তৈরির plan করা স্থরেন কর মশায়কে নিয়ে; সেইভাবে তৈরি হল উত্তরায়ণের উদয়ন বাড়ি, তৈরির সময় দেখেছি।

বাগান নিয়েও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত। যেমন আতা-গাছকে লতানো গাছ করা, পেয়ারা আম ইত্যাদিও লতানো করার চেষ্টা। তা ছাড়া ফুলবাগানেও দুষ্প্রাপ্য গাছ এনে লাগানো ও তাকে বাঁচিয়ে রাখা। ভিতরের ফুলবাগান তৈরিতে প্রতিমা দেবীরও হাত ছিল। দুজনেরই মার্জিত রুচির ও শিল্পীমনের মিল ছিল।

রথীন্দ্রনাথ হাতের নানারকম কাজ জানতেন। ছবি আঁকতে পারতেন, তবে তা বেশিরভাগ ফুলের study বলা যায়। চামড়ার কাজ শিখে তা বিশ্বভারতীতে সকলকে শেখালেন— সেটা তাঁরই অবদান। বাটিকের কাজও যতদূর জানি তিনিই প্রচলন করেন।

সবচেয়ে চমৎকার ছিল তাঁর কাঠের কাজ। কাঠের যে নিজস্ব এত রঙ আছে তা জানা ছিল না, ওঁর কাছেই দেখলুম ও জানলুম। স্বাভাবিক কাঠের রঙ রেখে রেখে কী চমৎকার সব কাঠের জিনিস তৈরি করেছেন তা না দেখলে বোঝা যায় না। এমন নিরলস কর্মী ছিলেন যে অবাক লাগত। Recreation বলতে একটু ইংরিজি detective story বা ঐ জাতীয় কিছু বই পড়তেন, তার পরই উঠে কাঠের কাজ নিয়ে বসতেন।

রথীন্দ্রনাথের লেখার হাত বেশ ভালো ছিল। শেষ জীবনে যে *On the Edges of Time* বলে পিতৃস্মৃতি লিখেছিলেন তা তো সবাই জানেন। তা ছাড়া পত্র-পত্রিকায়ও লিখেছেন। এস্রাজ বাজিয়ে গান করতেন সময়ে সময়ে। তাঁর বহুমুখী শক্তি ছিল আর বিশেষত্বও ছিল, কিন্তু পিতার প্রতিভার ছটায় তা প্রকাশ হবার স্থযোগ হয় নি।

প্রতিভাবান পিতাকে নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট তাঁকে পোহাতে হয়েছে। বিদেশযাত্রা তাঁকে নিয়ে যাঁরাই করেছেন তাঁরাই এ কথা

ভালোভাবে জানেন। তিনি নিজেও এ কথা জানতেন। এমনও বলতে শুনেছি, "বাবার যদি আর একটি ছেলে থাকত তো সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতাম।"

একবার আমায় গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কোথায় যাচ্ছে জানিস?" আমি বললাম, "না তো!" তখন বললেন, "আমাকে কি জানিস? আমায় নিয়ে মুশকিলও আছে যে।"

রথান্দ্রনাথকে দেখেছি পারতপক্ষে বাবার কাছে যেতেন না। প্রতিমা দেবীকে বা সুরেন কর মশায়কে ঠেলে দিতেন কিছু বলবার বা জানবার থাকলে।

রথীন্দ্রনাথ ঠিক নিজের ইচ্ছেমত সব সময় চলতে ফিরতে পারেন নি। আমার বিয়ের ঠিক আগে জয়পুর অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন, গাড়ি নিয়ে— সেরকম কখনো যে যেতেন না তা নয়, তবু তা খুব কমই। খুব ভালো গাড়ি চালাতে পারতেন। একবার কোথায় বেড়াতে গিয়ে দিনেন্দ্রনাথ বলেন যে 'রথী খানিকটা পথ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভাগ্যিস কিছু হয় নি!' কুকুর পুষতেন বরাবর। কুকুর ভালোবাসতেন। ছেলেপিলে ভালোবাসতেন, তবে দিনেন্দ্রনাথের মতো শিশুমাত্রকেই নয়। বিশেষ বিশেষ কাউকে হয়তো ভালোবাসতেন।

একটি জিনিস খুব ভালোবাসতেন— তাস খেলা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে ব্রিজের আড্ডা বসত, সেখানে লোকের অভাব হত না। গুরুদেব এ বিষয় খুব বিরক্তি প্রকাশ করলেও এটা বন্ধ হয় নি। শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে ওঁকে রাগ করতেও দেখেছি। একটা কথা মনে হয় ঠিক, স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছেলে-বউকে দেন নি। ওঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই পিতার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে তাকিয়ে চলতেন। নিজেদের ভালোলাগা মন্দলাগা বাদ দিয়ে চলেছেন আগাগোড়া।

স্ত্রী প্রতিমা দেবী অত্যন্তই অসুস্থ ছিলেন আগেই বলেছি, রথীন্দ্রনাথ খুবই কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন— একবার প্রতিমা দেবী খুব অসুস্থ

হয়ে উদয়ন বাড়ির দোতলায় আছেন— সন্ধেবেলা আমি দেখতে গেছি। একতলার হলঘরে তখন তাসের আসর বসেছে— কেউ উপরে উঠলে বা নামলে চোখে পড়ে। আমি যখন নেমে আসছি আমায় দেখতে পেয়ে রথীন্দ্রনাথ বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "প্রতিমা কেমন আছে? কেমন দেখলি।" খেলার মধ্যেও স্ত্রীর অসুস্থতার চিন্তা রয়েছে মনের মধ্যে। প্রতিমা দেবীকে সুস্থ রাখার জন্যই গুরুদেব বাড়ি করে দিলেন কালিম্পঙে। সে বাড়িও মনের মতো করে তুললেন রথীন্দ্রনাথ। পরিশ্রম করতে পারতেন খুব। সময় পেলেই কাঠের কাজ আর বাগান নিয়ে পড়তেন।

গুরুপল্লীতে মাস্টারমশায়দের জন্য বাড়ি তৈরি হচ্ছে— ঐখানেই একটু জমি দিলেন মাকে ঘর করতে। আমার ঠাকুমা যেই বললেন, রথী, তুমি থাকতে কি অজিতের ছেলেমেয়েরা ভেসে যাবে? শুনেই তৎক্ষণাৎ জমিটুকুর বন্দোবস্ত করে দিলেন মাকে।

আর একবার জোড়াসাঁকো বাড়িতে থাকতে খুব সংকটের মধ্যে পড়েছিলাম— আমায় লিখে পাঠালেন, "তোর যদি টাকার দরকার হয় তো জানাস।" আমি খুবই অভিভূত হয়েছিলাম তাঁর এই মনোভাবে। তাঁর কাছে কেউ সাহায্য চাইলে তাকে কখনোই বিমুখ করতেন না ওঁর সাধ্যে থাকলে। খেলাধুলার মধ্যে টেনিসটা খেলতেন। গান বেশ গাইতে পারতেন আর অভিনয়ের ক্ষমতা তো ছিলই। কোনো বড়ো অভিনয় হলে তার দায়িত্বও ওঁকে নিতে হত। বিশেষ, বাড়িতে হলে স্টেজ তৈরি থেকে সব-কিছু। আলোর ব্যবস্থাও নিজে করতেন। সুরেন কর মশায় অবশ্য সর্বদা সহযোগিতা করতেন।

রথীন্দ্রনাথের যে নাম ও প্রশংসা প্রাপ্য ছিল তা কিন্তু তিনি পান নি। পিতার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের আড়ালে পড়ে গেলেও— বিশ্বভারতীতে তাঁর যে অবদান কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য! সে স্বীকৃতিটুকু তিনি পেলেন কই! আগাগোড়া

জীবন তো তাঁর পিতার কর্মভার বহন করতে ও তাঁর ইচ্ছাকে রূপ দিতেই কেটে গেছে— এই যে ত্যাগ এটা কেউ কি বোঝে নি। গুরুদেব কিন্তু বুঝেছিলেন ; তাই মনে হয় তাঁর জন্মদিনেই তাঁর উদ্দেশে একটি কবিতার মধ্যে সেই ত্যাগের স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

এমন নীরব কর্মী বলেই বোধহয় সকলের চোখের আড়ালে রয়ে গেলেন কিন্তু যাঁরা তাঁর সহকর্মী তাঁরা তো জানেন। অসাধারণ পরিচালন-ক্ষমতা ছিল দেখেছি।

বোধহয় সারা জীবন একটা চাপের মধ্যে থেকে শেষটা স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাবার ইচ্ছে হল, তাই বিশ্বভারতী ছেড়ে চলে গেলেন দেরাদুনে। সেখানে পূর্ব পরিধান জোব্বা ইত্যাদি ফেলে শার্ট শর্টস্ পরে বয়সও যেন অনেক কম দেখাতে লাগল। শরীরও ভালো হয়ে গেল। ইতিমধ্যে পিতার শতবার্ষিকী উৎসবের আমন্ত্রণ এল রাশিয়া থেকে, কিন্তু তিনি কি পিতার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সেখানে যোগ দিতে যাবেন! তাই চলে এলেন শান্তিনিকেতনে শতবর্ষ উৎসব পালন করবেন। কিন্তু বিশ্বভারতী থেকে কোনো আহ্বান পেলেন না তিনি। শুধু রবীন্দ্র-পুত্র নন, রথীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র, তার পর কর্মী ও সর্বশেষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চান্সেলার! প্রচণ্ড আঘাত নিয়ে ফিরে গেলেন। কেউ কি জানে দেশ স্বাধীন হবার পর ছুটে গিয়েছিলেন পণ্ডিতজীর (নেহরু) কাছে দিল্লীতে, যাতে 'জনগণমনঅধিনায়ক' গানটি জাতীয় সংগীত হয়। সে কার্যোদ্ধার করে ফিরে এলেন।

আজ তাঁর শতবর্ষের দিনে বিশ্বভারতী তাঁর অবদানের স্বীকৃতি দেবার আয়োজন করেছেন জেনে ভালো লাগছে। সাধারণ মানুষ নিশ্চয় তাঁর বিষয় জানতে উৎসুক হবেন ও তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। আমি আজ তাঁর উদ্দেশে নিবেদন করলাম আমার বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বাচ্চু

বারেও বসন্ত এসেছিল বটে; ঠিক করে বলব না,
শালফুলের তীব্র গন্ধ — পাগল করেছিল মৌমাছিদের,
পলাশের উৎকণ্ঠে রঙে লাগিয়ে দিল আগুন চারদিকের বনে
দখিন বাতাস তাও দুলেছিল দারুণ উৎসাহে,
দিনে, জ্যোৎস্নায় (?) রাতে, ~~[illegible]~~, রাতে সমারোহ উঠল দিনে।
দু চার দিনে গেল সব ফুল ~~[illegible]~~ ধুলোয় লুটিয়ে,
শুকনো পাতা — নিল কুড়িয়ে সাঁওতালমেয়েরা এসে পোড়াবার তরে,
গাছের পাতা-ডাল-পালা রইল না কিছু বাকী।
দখিনে বাতাস ঘুরে গেল পশ্চিমে,
তখন দেখি হাওয়ায় ~~[illegible]~~ খেলে সুর।
পোড়াদেশ থেকে গেলুম চলে, হিমালয়ের স্নিগ্ধ আশ্রয়ে
সুদূর আলমোড়া প্রদেশে।
সেখানে দেখি কেদার, বদরি, নন্দাদেবী — হিমগিরিশ্রেণী —
রয়েছে তাকে ঘিরি।
বাংলামুলুকবাসী, দেহে লাগে কাঁপন,
বের করি কাঁথাকম্বল, সম্বল যা ছিল।
সাহেব সাজে ঘেরা এক বাড়ীতে ~~নিলুম~~ আস্তানা,
রাখলুম পাহাড়ী-চাকর, কথা যায় না বোঝবার।
তাদের মধ্যে সেরা ছিল বাচ্চু, — হাসিখুসী মুখ,
খাসা দেহখানি, বলিষ্ঠ; ঋজু,

বাচ্চু

রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র

বাবার প্রসঙ্গে

শ্রীনন্দিনী দেবী

আমার বয়স যখন সবে মাত্র দশ মাস তখন আমার বাবা ও মা গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীর নিকট আমায় রেখে যান। তখন আমায় পেয়ে ওঁরা উভয়েই অত্যন্ত খুশি হন ও আমাকে মানুষ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ কাঁচা বয়সে দিনের পর দিন কিভাবে বড়ো হয়ে উঠেছি তা আজ আমার খুব একটা মনে পড়ে না! তবে কিছু কিছু ঘটনা যা জ্ঞান হওয়ার পর বাবা (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) মা'র (প্রতিমা দেবী) কাছে শুনেছি তা হল : ছোটোবেলায় শারীরিক গঠনে আমি অত্যন্ত দুর্বল ছিলাম। তাতে আমার হাঁটতে খুব অসুবিধা হত। এ নিয়ে বাবা ও মা খুব চিন্তায় পড়েছিলেন। ঠিক সেই সময় ১৯২২ সালে নভেম্বর মাসে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও নির্মলকুমারী মহলানবিশ বিবাহের পর এখানে দাদামশায়কে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) প্রণাম করতে আসেন। দাদামশায় নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন। আমার হাঁটাচলা করতে খুব অসুবিধা দেখে দাদামশায় চিন্তিত হয়ে রানী কাকীমাকে (নির্মলকুমারী মহলানবিশ) বললেন— রানী, নাতনীর এক বছর বয়স হতে চলল এখনো হাঁটতে শিখল না। তাই তোমাকে ওর হাঁটাচলা করার ভারটা নিতে হবে। তখন রানী কাকী আমাকে ওঁর কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যান। রোজই আমাকে বাড়ির বাইরের বারান্দায় লোহার রেলিং ধরে হাঁটা শেখাতেন। যেদিন আমি কোনো কিছুর সাহায্য না নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম ঠিক সেদিনই রানীকাকী দাদামশায়কে খবর

পাঠালেন, ইউরেকা ! কবি-নাতনী হাঁটতে শিখেছে। আমার দায়িত্ব পূর্ণ হল।

আমাকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়ির মধ্যেই রাখা হত। বাইরে কোথাও যেতে দেওয়া হত না। হয়তো আমার শারীরিক অক্ষমতার দরুনই। সকাল বা সন্ধ্যার দিকে বাগানে বেড়াতে গেলে পরিচারিকা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। তখন বাইরের অর্থাৎ উত্তরায়ণ-বাগানের প্রাকৃতিক আকর্ষণের মধ্যে ছিল দুটি ময়ূর-ময়ূরী, সারস-সারসী, কোণার্কের পিছনের পুকুরে কিছু রাজহাঁস, ও রান্নাঘরের চিমনির নানান খোপের মধ্যে কিছু সাদা পায়রা। পায়রাগুলি মাঝে মাঝে আমার ঘরে ঢুকত। তাদের আমি নানান খাবার খাওয়াতাম। বাগানের শোভাবৃদ্ধির জন্য বাবা বিভিন্ন রঙের খরগোশ ছেড়ে দিতেন। তারা নানা দিকে ঘুরে ঘুরে খেলা করত। আমার বাবা ও মা আশ্রমের নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় আমাদের বাড়ির পরিচারিকাই আমার সব-কিছু দেখাশুনা করত। আমার শরীরের গঠন ভালো না থাকায় খাওয়া-দাওয়ার উপর মা ও বাবা বিশেষ নজর রাখতেন। তাঁদের নির্দেশ অনুসারেই আমার খাবার তৈরি হত। সে সময় উত্তরায়ণে অনেকগুলি গোরু ছিল। সব সময় ক্ষীর, সন্দেশ, ছানা, এই-সব মানান জিনিস তৈরি হত। দাদামশায়ও এ-সব খাবার পছন্দ করতেন। বাবা বিশ্বাস করতেন, খাওয়া-দাওয়া সময়মতো হলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। তাই আমাদের ঠিক সময়মতো খাওয়া-দাওয়া হত। প্রায় রোজই আমাদের খাবার-টেবিলে বাইরের কেউ-না-কেউ অতিথি থাকতেন। যাঁরা বাবা ও দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাঁরা প্রায় সকলেই আমার জন্য কিছু-না-কিছু নিয়ে আসতেন। তার মধ্যে বিভিন্ন রকম বিদেশি-খেলনাই বেশি থাকত। চাবি দিয়ে দিলে তারা নিজেরাই নিজের রূপে খেলা করত। আমি তখন বাবাকে বলতাম, দেখো দেখো বাবা— কিরকম

খেলা হচ্ছে ? তখন বাবা আমাকে খেলনাগুলো সম্বন্ধে বোঝাতেন। বলতেন, ওটা ভালুক, ওটা খরগোশ, ওটা বাঘ, ওটা হাতি, ইত্যাদি। আমার ঐ অল্প বয়সে জন্তুগুলোকে আমার জ্ঞানের মধ্যে ঢোকানোর জন্য খেলনা দিয়েই ওগুলোর পরিচয় করিয়ে দিতেন। এতে এক দিক দিয়ে আমার খেলাও হত এবং জ্ঞানলাভও হত। এগুলি দিয়ে বিশেষ করে শিশুদের মনের চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলা হয়, এটাই বাবা বলতেন।

আমার মনে পড়ছে না কে আমায় বর্ণপরিচয় ও ইংরেজি পড়া শেখান। তবে বাবা প্রায়ই দুপুরে খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক আমাকে পড়াতেন। পড়ার কোনো নির্ধারিত বিষয় ছিল না! বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয় সংক্ষেপে আমায় বুঝিয়ে দিতেন। বাবা তখন অফিসের কাজ, বাড়ির কাজ, বাগানের কাজ, দাদামশায়ের সব-কিছু দেখাশুনা ইত্যাদি খুব সুচারুরূপে করতেন। সময়ের কোনো অপব্যবহার করতেন না, বা কেউ করলে তা পছন্দ করতেন না। মায়ের শরীর অসুস্থ থাকার জন্য খানিকটা সাংসারিক দায়-দায়িত্বও বাবাকে নিতে হয়েছিল। বাবা খুব ভোরে উঠতেন। প্রথমেই কাঠের কাজ করতেন। প্রায় সকালে আশ্রমের অনেকেই, যেমন— ধীরানন্দবাবু সুরেন্দ্রনাথ কর মশায়, বীরেন্দ্রমোহন সেন প্রমুখ বাবার কাছে আসতেন। তাঁর কাঠের কাজ করার সময় যাঁরা কথাবার্তা বলতেন সেগুলো বাবা শুনতেন। কিন্তু কোনো মন্তব্য করতেন না। কাঠের কাজ শেষ হওয়ার পরে আলোচনায় যোগ দিতেন। তার পর তিনি বাগানে টহল দিতে বের হতেন ও মালীদের বাগানের কাজ বুঝিয়ে দিতেন। বাবা বাগান খুব ভালোবাসতেন। উত্তরায়ণের বাগানের প্রতিটি গাছের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ নজর থাকত। বাগান ছিল তাঁর প্রাণ। তার পর বাবা অফিসের কাজে বসতেন।

জীবনে প্রথম— বাবা, মা, দাদামশায়, প্রশান্তকাকা ও রানী-

কাকীমার সঙ্গে ১৯২৬ সালে বিদেশে যাই। বোম্বাই থেকে একটি বড়ো জাহাজে করে ইউরোপ-অভিমুখে যাত্রা। দাদামশায় বিভিন্ন দেশে নানান বক্তৃতার আমন্ত্রণ পাওয়ায় আমার এই সুযোগ ঘটে। আমার বয়স তখন আনুমানিক পাঁচ বছর। আমি বাবা-মার সঙ্গে প্রথম প্যারিসে যাই। শারীরিক দুর্বলতার জন্য প্যারিসে কয়েকজন ডাক্তারকে আমাকে দেখানো হয়। বাবা-মাও নিজেদের চিকিৎসা করান। ঠিক এই সময় স্থির হয়, ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য ছ'মাস সেখানে থাকতে হবে। তাই ছ'মাস মতো আমরা সবাই ইউরোপে থাকি। ফরাসী দেশের চিত্রশিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেসের বাড়িতে আমাকে রেখে বাবা ও মা ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও জার্মানি বেড়াতে যান। যে ছ'মাস মতো ইউরোপে ছিলাম তার বেশির ভাগ সময়ই আঁদ্রে কার্পলেসের বাড়িতে কাটিয়েছি। তাঁরা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। খুবই ঘরোয়া পরিবেশে ছিলাম। ফরাসী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গেই খেলাধুলা করতাম। ফরাসী ভাষা তখন তাঁদের কাছেই আমার শেখা। ভালো বাংলা বলতে পারতাম না, বরং তুলনামূলকভাবে ঐ বয়সে ফরাসী ভাষাটা ভালো বলতে পারতাম। এর পর কিছু দিন বাবা-মা'র সঙ্গে লণ্ডনে 'হোটেল রেজিনা'তে ছিলাম। দাদামশায়ও আমাদের সঙ্গে ঐ হোটেলে ছিলেন। হোটেলটি ছিল বাঙালি ভদ্রলোকের। এই সময়েই বাবা হঠাৎ অসুস্থ হওয়াতে আমি বাবা-মা'র সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে যাই। কিছুদিন ওখানে চিকিৎসা চলে। তার পর আমি বাবা-মা'র সঙ্গে দেশে ফিরে আসি।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমাকে বাংলা, ইংরাজি, অঙ্ক ইত্যাদি পড়াবার ব্যবস্থা বাড়িতেই করা হয়। আমার যখন বয়স সাত-আট তখন আমাকে বাবা শান্তিনিকেতনে পাঠভবনে ভর্তি করেন। বিভিন্ন সময়ে আমাদের মাস্টারমশায়দের মধ্যে ছিলেন জগদানন্দ রায়, গুরুদয়াল মল্লিক, তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র-

নাথ দত্ত, ক্ষিতীশ রায় প্রমুখ। দু-এক বছর অধ্যয়নের পর অনেক বিষয়ে আমি কাঁচা থাকায় বাবা— গুরুদয়াল মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়কে আমায় বাড়িতে পড়ানোর ভার দেন। তাঁরা যা পড়াতেন তা আবার আমায় না দেখে লিখতে হত। ঠিক ঠিক লিখতে পারছি কিনা সেগুলো বাবা ভালো করে দেখতেন। ঐ ভাবেই আমার অধ্যয়ন শুরু হয়।

যখন আমার বয়স প্রায় দশ বছর তখন মা আমাকে বাড়ির অনেক জিনিস বোঝাতেন এবং একটু একটু করে কাজ শেখাতেন। এমন-কি অতিথিদের কেমনভাবে আপ্যায়ন করতে হয় সেটাও বাবা-মা ঐ ছোটোবয়সে শিখিয়েছিলেন। বাবা কুকুর খুব ভালো-বাসতেন। নানান সময় নানান দেশ হতে নানান জাতের কুকুর আনিয়েছিলেন এবং নিজেই তাদের শিক্ষা দিতেন। কুকুরের অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসা ও সেবা নিজেই করতেন। চেনা-অচেনা ব্যক্তি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁদের সব কথা মন দিয়ে শুনতেন। কিন্তু নিজে খুবই কম কথা বলতেন। বেশি কথা বলা বাবার পছন্দের বাইরে ছিল। তিনি নিজে খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দাদামশায়ের থেকেও বাবাকে বেশি গম্ভীর বলে আমার মনে হত।

বাবা বিভিন্নরকম বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন। দুপুরে খাওয়ার পর ও রাত্রিতে খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে বই পড়তে দেখতাম। বই পড়াটা একটা নেশার মতো ছিল। তার মধ্যে লেখার কাজও করতেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে খুব ভালো লিখতে পারতেন। একজন সুলেখক হিসাবেও বাবার পরিচিতি ছিল। বাবার গুহাবাড়িতে যাঁরা ঢুকেছেন তাঁরা নিশ্চয় দেখে থাকবেন তাঁর ব্যবহৃত মশারি, লাইট ও নানান আসবাবপত্রে একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তিনি ঐ ছোট্ট ঘরটিতেই পশ্চিম দিকটা কাঠের কাজের জন্য

সীমাবদ্ধ করেছিলেন। বাবা কাঠের কাজ এত বেশি পছন্দ করতেন ও এত সুন্দর করতে পারতেন, যা না দেখলে ঠিক বোঝা যাবে না। কাঠের কাজের যন্ত্রপাতি, যেমন স্ক্রু, নাট, বোল্টস ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে বিভিন্ন খোপে রাখা থাকত। যে-কেউ অনায়াসে সেগুলো খুঁজে বের করতে পারত। ঘরের পূর্ব-উত্তর কোণে একটি ছোট্ট টেবিল ও চেয়ার থাকত। সেইসঙ্গে ছিল একটি দেয়াল আলমারি। ঐ গুহাঘরটিই তাঁর অফিস ঘর ছিল। সমস্ত বিশ্বভারতীর প্রশাসনিক কাজকর্ম ও শ্রীনিকেতনের কাজকর্ম এই ঘরটিতে বসেই করতেন। বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য হিসাবে ঐ গুহাঘরেই তাঁর প্রথম অফিস শুরু হয়।

বাবা নিজে রন্ধনশাস্ত্রেও বিজ্ঞ ছিলেন। আধুনিকভাবে Steam Boiler-এর সাহায্যে বিভিন্ন রকম জিনিস কী করে কম সময়ে তৈরি করা যায় তা তিনি শেখাতেন। জেলির আচার ও সুগন্ধী পাউডার এবং বিভিন্ন রকম সেণ্ট খুব ভালো তৈরি করতে পারতেন। শেষের দিকে Arty Perfumes বলে কিছু সাজসজ্জার জিনিস বাজারে ছেড়েছিলেন। সারাদিন সমস্ত রকম কাজ করার পর সন্ধ্যার দিকে মাঝে মাঝে বিশিষ্ট বন্ধুদের নিয়ে তাসের ব্রিজ খেলতেন। মাঝে মাঝে মজলিসে কম লোক উপস্থিত হলে বাবা তাঁদের এসরাজ বাজিয়ে শোনাতেন। তাঁকে এসরাজ বাজাতে খুব কম লোকই দেখেছেন। দাদামশায়ের গানও গাইতেন। আমার খুব ভালো মনে পড়ছে, বাবা কোনো পুরানো জিনিস ফেলে দেবার আগে—যেমন পুরানো শিশি, ফুটো পাইপ, চামড়ার কোনো জিনিস ইত্যাদি, নূতন কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা ভেবে দেখতেন এবং তার দু-একটা নমুনা উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে এখনো এদিক-ওদিকে দেখতে পাওয়া যায়। বাবা যেমন চিত্রশিল্পে পারদর্শী ছিলেন তেমনি কৃষিবিজ্ঞানেও তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল। আপনারা অনেকেই জেনে

থাকবেন, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, সে কারণ দাদামশায় বাবাকে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান পড়তে পাঠিয়েছিলেন। উদয়ন বাড়ির দক্ষিণে যেমন পেয়ারা, লেবু, আম, আতা ইত্যাদি গাছের সাহায্যে একটি লতা বাগান তৈরি করেছিলেন, যা এখনো দৃষ্টিগোচর। বাবা-মার কাছ হতেই শোনা যে, শান্তিনিকেতনে গোলাপ গাছ হত না বললেই চলে। কিন্তু উদয়ন বাড়ির পূর্বে বাবা একটি সুন্দর গোলাপ বাগান তৈরি করে দেখিয়েছিলেন যে এখানেও গোলাপ বাগান হতে পারে। বাগানটিতে প্রথম গোলাপ ফোটার পর বাবা দাদামশায়কে ডেকে দেখান। দাদামশায় দেখে খুবই খুশি হন এবং বলেন, 'রথী, গোলাপফুল কবির কল্পনাতেই ছিল। এই মাটিতে তোমার ফোটানো বাস্তব গোলাপ দেখে কবির কল্পনা সার্থক হল।'

বাবার অদম্য উৎসাহে আমি কলাভবনে কিছুদিনের জন্য গৌরীদি ও যমুনাদির কাছে 'কাঠিয়াবাড়ী' ছুঁচ সেলাইয়ের কাজ শিখেছিলাম। বাবা আরো চাইতেন আমি যেন কোনো বাদ্যসংগীত শিখি। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ভঞ্জ মহাশয়কে সেতার শেখাবার ভার দিয়েছিলেন। সুশীলদা রোজ সন্ধ্যাবেলা আমায় সেতার শেখাতে আসতেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়ির অনেকে এখানে একত্র হলে বাবা আমাকে সেতার বাজিয়ে শোনাতে বলতেন। তাতে আমিও খুব উৎসাহ পেতাম। ছোটোবেলাতে আমার নাচের দিকে ভীষণ ঝোঁক ছিল। মণিপুরী শিক্ষকের কাছে নাচ শিখতাম। আমার বেশ মনে পড়ছে দাদামশায়ের সঙ্গে যখন দ্বিতীয়বার বিদেশে গিয়েছিলাম তখন জাহাজে দাদামশায় গাইতেন আর আমি নাচতাম। সম্ভবত ১৯৩০ সালে, সঙ্গে ছিলেন বাবা মা ও অমিয় চক্রবর্তী।

বাবা বাড়ির প্ল্যান ও মডেল খুব ভালো দিতে পারতেন, তা উদয়ন বাড়ি দেখলেই বোঝা যায়। রতনপল্লীতে আমার 'ছায়ানীড়' বাড়ি-টার সমস্ত-কিছু পরিকল্পনা বাবারই দেওয়া। দাদামশায় কালিম্পঙ,

মংপু— এই-সমস্ত পাহাড়ি জায়গায় থাকতে খুব ভালোবাসতেন। কালিম্পঙ গেলে গৌরীপুর মহারাজার বাড়িতে উঠতেন। আর মংপুতে শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে থাকতেন। তাই বাবা কালিম্পঙে একটি জমি কিনে নিজের প্ল্যান মাফিক পাহাড়ি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দাদামশায়ের থাকার জন্য ছোট্ট একটি একতলা বাড়ি তৈরির কথা ভাবলেন। তৈরিও করেছিলেন। বাড়িটি খুব সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিটি ঘরের মেঝে ছিল কাঠের। রান্নাঘর আসল বাড়ি থেকে পনেরো-কুড়ি ফুট দূরে করেছিলেন। ঢাকা বারান্দা দিয়েই রান্নাঘরে যাওয়া যেত। ঘরের দরজা-জানালাগুলি ছিল খুবই আকর্ষক। জানালা-দরজার ছিটকিনি, হ্যাণ্ডেল, কড়া সবই ছিল তাঁর নিজস্ব ডিজাইনের। রান্নাঘরের উনুনগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। সাড়ে চার ফুট উঁচু, ছ ফুট লম্বা ও তিন ফুট চওড়া, তিনটি উনুনের ব্যবস্থা ছিল। পাহাড়ি জায়গায় গরম জল পাওয়ার সুবিধার জন্য— উপরের ট্যাঙ্ক থেকে জলের পাইপ নামিয়ে এই তিনটি উনুনের আশেপাশে ইংরেজি সংখ্যা 'আট' ডিজাইনের চারটি স্তরে পাইপের সাহায্যে বাথরুম ও রান্নাঘরে গরম জল অনায়াসে পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। বাবা এই বাড়িটিতে একটি সুন্দর বাগানও তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে একটি জলাশয়ও ছিল। বাড়ির উত্তর দিকে খোলা বারান্দা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, তারও উত্তরে উপরের পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যেত। এর উপর সূর্যের আলো পড়লে দারুণ ভালো দেখাত। এই বাড়িটির 'চিত্রভানু' নামকরণ করেছিলেন আমার মা প্রতিমা দেবী। মায়ের শারীরিক অসুস্থতার জন্য বহুদিন এই বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। আমিও মায়ের সঙ্গে অনেক সময় থেকেছি। পরে মা এই বাড়িটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে তুলে দেন।

বাবা শিকারও খুব ভালোবাসতেন। তাই মাঝে মাঝে শিকার

করতে বাইরে যেতেন। আমার একবার সুযোগ ঘটেছিল বাবার সঙ্গে শিকারে যাওয়ার। জায়গাটার নাম ছিল ভীমবাঁধ, বিহারে বাবার সঙ্গে ছিলেন মুকুল দে, অমিত ঠাকুর, ধীরেন সেন, জ্যোতি সরকার প্রমুখ। একটি বড়ো শম্বর শিকার করলেন। অনেকটা হরিণের মতো দেখতে।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে দাদামশায়ের কাছ হতে যা পেয়েছি তা এই মুহূর্তে না লিখে আর থাকতে পারলাম না। দাদামশায় যখন শ্যামলীতে থাকতেন তখন রোজ ভোরবেলায় আমি দাদামশায়ের কাছে চলে যেতাম। সারা উত্তরায়ণ বাড়ির মধ্যে আমি আর দাদামশায় সবার প্রথমে উঠতাম। দাদামশায়ের কাছে গেলেই বলতেন 'বনমালী, খাবার নিয়ে এসো, পুপে দিদি এসেছে।' অনেক সময় দেখতাম, দাদামশায় খুব ভোরবেলাতেই আপন মনে কবিতা লিখছেন। আমার দেখা পেলেই কবিতা লেখা বন্ধ করে আমার সঙ্গে গল্প করতেন— বলতেন তোমার হাঁসগুলো কোঁ কোঁ করলে বোঝা যায় এবার ভোর হয়েছে। দাদামশায় আমায় কী পরিমাণ ভালোবাসতেন তা ঠিক লিখে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। আজও তাঁদের কথা মনে পড়লে চোখে জল আসে। আমার প্রতি তাঁর কিরকম ভালোবাসা ছিল তা— কবিতায়, গানে, গল্পে ও তাঁর লেখা চিঠিপত্রে প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর ভালোবাসার কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল যে, একবার তিনি বনমালীকে ডেকে বলছেন— 'বনমালী, দেখো পুপে দিদির হাঁস, খরগোশ, পায়রা ও কুকুরগুলো যেন ঠিক ঠিক থাকে। যেন কোনো শিয়ালে টেনে না নিয়ে যায়। হিসেব ঠিক রেখো। যদি ওগুলোর ভিতরে কিছু খোয়া যায় তা হলে আমার দাড়ি ও মাথার চুল থাকবে না।' রোজ সন্ধ্যাবেলায় ডেকে আমায় ভূতের গল্প, রূপকথা ও ঐতিহাসিক গল্প শোনাতেন। তখন আমি বেশ বড়ো হয়ে গেছি। সব-কিছু বুঝতে পারতাম। আমার এই

'নন্দিনী' নামটি দিয়েছিলেন স্বয়ং দাদামশায়। এ ছাড়া তিনি আমায় নিত্য নূতন নামে ডাকতেন। যেমন পুপে, পুপশী, রূপশী, উর্বশী, রম্ভা এরকম আরো অনেক নামে। আমারও খুব ভালো লাগত এই নিত্য নূতন নাম পেতে। দাদামশায়ের আমায় দেওয়া ছোটোবেলাকার পুতুল, বাসনপত্র, জাপানি লাক্‌সারি ওয়ার্ক কাপ-ডিশ এখনো আমি যত্নসহকারে রেখে দিয়েছি। সেগুলো দেখলেই দাদামশায়ের স্নেহ ও ভালোবাসার কথা বার বার মনে পড়ে।

আমার জীবনে বাবাই ছিলেন আমার সর্বস্ব। জীবনে যা পেয়েছি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। আমি দু'বার ভীষণ অসুখে পড়ি। দুটোতেই অপারেশন করতে হয়। আমার চিকিৎসার জন্য বাবা যা করেছিলেন তা জীবনে আর কারো কাছ থেকে পেতাম বলে মনে হয় না। এক্স-রে থেকে আরম্ভ করে ডাক্তার, নার্সিংহোম, খাওয়া-দাওয়া, সেবাযত্নের যা ব্যবস্থা করেছেন তা আমার জীবনে আজও স্মরণীয়। বাবা শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কাজ ছেড়ে দিয়ে দেরাদুনে চলে যান। আমার রতনপল্লীর ছায়ানীড়ে বাড়ি শুরু করার আগে এখানে একবার বাবা এসেছিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'পুপে, তোমার বাড়ির পশ্চিম দিকে আমার জন্য দুটি ঘর করে দিয়ো। একটি আমার জীবনে সবচেয়ে ভালো লাগা কাঠের কাজের জন্য। আর একটি হবে আমার থাকার ঘর। আমার এখন আর উত্তরায়ণ ভালো লাগছে না।' বাবা গুহাবাড়িতেও অনেকদিন কাটিয়েছেন। ১৯৬১ সালে দাদামশায়ের শতবার্ষিকী সারা দেশ জুড়ে হবে— বাবাও ঐ উৎসবে খুব ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৬১ সালের ৪ মার্চ দুপুরে আবার দেরাদুন-অভিমুখে রওনা হন। আমি ও আমার স্বামী (ডাঃ গিরিধারী লালা) তাঁকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য হেঁটে কথা বলতে বলতে যাচ্ছি— হঠাৎ গাড়িতে ওঠার আগে বাবার চোখে জল দেখলাম। বাবার সঙ্গে ছোটোবেলা হতে বহু বছর কাটিয়েছি,

কোনোদিনই কোনো কাজে মুষড়ে পড়তে দেখি নি। নানান ঝুঁকি নিয়ে তিনি আশ্রমের ও বিশ্বভারতীর অনেক কাজ করে গেছেন। কিন্তু চোখের জল কখনো দেখি নি। সেই আমার বাবাকে জীবনের শেষ দেখা। ১৯৬১ সালের ৩ জুন দেরাদুনেই বাবা দেহত্যাগ করেন। কে জানত দাদামশায়ের শতবার্ষিকীতেই বাবা আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে যাবেন।

রথীন্দ্রনাথ

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

বিশ্বভারতী থেকে রথীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে বলা হয়েছে। বন্ধুবর ক্ষিতীশ রায় মহাশয়ও লিখেছেন। তাঁর অনুরোধ এড়াতে চাই না। তা না হলে এই বয়সে এবং এই যুগে সেই মনোরম পলাতকা স্মৃতির পিছনে ছুটতে ইচ্ছে করে না। সেই সভ্য ভদ্র মানুষদের আকৃতি-প্রকৃতি মনে হয় যেন এখনকার মানুষরা বুঝতেই পারবে না।

রথীদাকে বোধ হয় প্রথম দেখেছি ১৯২৬ সালে। তখন উনি সবে ইউরোপ থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে এসেছেন হৈমন্তী দেবী, তাঁর কন্যা নন্দিনীর শিক্ষিকা হিসাবে। তার পর শান্তিনিকেতনে অনেক-বার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে বটে, কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় নি। কারণ রথীদা ছিলেন খুবই স্বল্পভাষী মুখচোরা মানুষ, আর আমরা তখনকার দিনের মেয়েরা খুব সহজভাবে আলাপ করতে অভ্যস্ত ছিলাম না। তাঁকে ভালো করে দেখলাম ও পরিচিত হলাম ১৯৩১ কিংবা ১৯৩২ সালে দার্জিলিঙে। গ্লেন ইডেনে একটা বাড়ি তাঁরা ভাড়া করে মনোমত করে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। আমরাও তখন ম্যালের কাছে মন্টিভিয়ট নামে একটা বাড়িতে ছিলাম। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠে আমি গ্লেন ইডেনে চলে যেতাম এবং সেখান থেকে প্রায়ই রথীদা আমাকে সঙ্গে করে মর্নিং ওয়াকে বেরুতেন। এক-একদিন ম্যাল পর্যন্ত এসে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে যেতেন। কোনো কোনো দিন বা ম্যালের ডান দিকে ক্যালকাটা রোড ধরে হাঁটা হত। ক্যালকাটা রোডের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে বসে

একদিন বিশ্রাম করছি এমন সময় খুব কুয়াশা নীচের থেকে উঠে এসে চার দিক অন্ধকার করে দিচ্ছে। রথীদা হঠাৎ বললেন: এইখানে এই রকম সময়ে এই কুয়াশার মধ্যে বাবার সঙ্গে বদরাউনের রাজকুমারীর দেখা হয়েছিল।

বদরাউনের রাজকুমারী! আমার ভাবতে একটু সময় লাগল। তার পরেই গল্পটা মনে পড়ল। সেই মুসলমান নারী যে ব্রাহ্মণ-কুমারকে ভালোবেসে তার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের সাধনা করেছিলেন। তার পরে এখানে এক ভুটিয়া পল্লীতে সেই ব্রাহ্মণকে পতিত ব্রাত্য অবস্থায় দেখে ভগ্ন-মনোরথ হয়ে এইখানে বসেছিলেন। আর তখনই তাঁর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। আমি বললুম: রথীদা, গল্পটা তো আর সত্য নয়। উনি বললেন: গল্পটা সত্য নয়, কিন্তু এর ভিতরের কথাটা সত্য। সেটা কি তুমি বুঝেছ?

আপনি বলুন—

উনি বললেন: সেই কথাটা না বুঝলে তুমি বাবার লেখার মর্ম বুঝতে পারবে না। তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে প্রধান কথাটা এই যে ধর্ম, সম্প্রদায়, আচার মানুষকে পৃথক করে রাখে, সেটা তার বাইরের জিনিস। কিন্তু অন্তরে সব মানুষ এক— এই কথা তুমি 'গোরা' বইতে পাবে; তা ছাড়া বড়ো হয়ে যখন ন্যাশানালাজিম্ বইটা পড়বে তখন আরো বুঝতে পারবে।— সেই প্রভাতের কথাটি কোনোদিন ভুলি নি, কারণ তখন আমার সতেরো-আঠারো বছর বয়সেই অনেক পড়া হয়ে গিয়েছিল। 'ন্যাশানালিজম্' আমি পড়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারি নি। রথীদার সেদিনের কথাটা যেন সার্চ লাইটের মতো প'ড়ে রবীন্দ্রচিন্তার একটা উদ্ভাস আমার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে গেল। এই কথাটা এত সহজ সরল করে আমাকে আগে কেউ বলে নি। 'গীতাঞ্জলি'র ঐ কবিতাটি আমার

মুখস্থই ছিল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেটা মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকল—

'মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।'

রথীন্দ্রনাথ ছিলেন মনেপ্রাণে আর্টিস্ট। তিনি যেখানেই থাকতেন সেইখানটি পরিপাটি ও সুন্দর করে সাজিয়ে নিতেন। দার্জিলিঙে একটি ছোট্ট ঘরকে তাঁর চামড়ার কাজের ল্যাবরেটরি করেছিলেন। ঘরটির মাপ এতই ছোটো যে নড়াচড়া শক্ত, তবু দেয়ালে দেয়ালে তাক ঝুলিয়ে সমস্ত-কিছু হাতের কাছে গুছিয়ে নিয়েছিলেন। ঐখানে আমি তাঁর কাছে চামড়ার কাজ শিখি। আজকে চামড়ার কাজ ভারতবর্ষ জুড়ে চলেছে, কিন্তু অনেকেই জানেন না যে এই শিল্প রথীদাই প্রথম বিদেশ থেকে শিখে এসে প্রচলন করেছিলেন। সম্ভবত ১৯২৬ সালে মিলান থেকে চামড়ার কাজ শেখেন। কিন্তু রথীদার শিল্পকৌশল ছিল অন্য রকম, তিনি সম্পূর্ণ দেশীয় ডিজাইনে কাজ করতেন। এখন যে-সব ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চামড়ার কাজ চলেছে তার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের শিল্পের কোনো তুলনাই হয় না। আমি অনেক শিল্পী দেখেছি যাঁরা ছবি আঁকেন ভালো কিন্তু তাঁদের চার পাশের ব্যবহার্য জিনিসপত্র সম্বন্ধে তাঁদের কোনো চেতনাই নেই। রথীদা এই ধরনের শিল্পী ছিলেন না, তাঁর চারি পাশের প্রত্যেকটি জিনিস ছিল সুন্দর। তাঁর উদয়ন বাড়িটির তুলনা বোধহয় কোথাও নেই। স্যার মরিস গয়ার বলেছিলেন, "There is thought in every corner।" সত্যি প্রত্যেকটি আসবাব, দরজা, জানালা, থাম, বাগান সর্বত্র কী বৈশিষ্ট্য না রচনা করতে পারতেন। তাঁর মনোরম গুহাঘরটি ভুলবার নয়। রথীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের এক-একটা পর্ব চলত। আমি চামড়ার কাজের পর্বের কথা লিখলাম। দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে অতি নিপুণতার সঙ্গে তিনি সে কাজ করে

যেতেন। তার পরে হল ছবি আঁকার পর্ব। আমাদের ওখানে বা কালিম্পঙে যখন ছিলেন তখন ছবি আঁকা চলত। মংপুর বাড়িতে থাকাকালীন একবার একগুচ্ছ 'জেরবেরা' ফুলের ছবি এঁকেছিলেন —এত নিপুণ ছিল তার রেখা ও বর্ণ যে কবি খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : রথীর মতো এত নিপুণ করে আমি ফুলের ছবি আঁকতে পারি না। সে সময় আমার বাড়িতে সবাই ছবি আঁকছিল— পিতাপুত্র তো বটেই, আমার মাসী যাকে কবি বলতেন মাতৃস্বসা এবং আমিও। সবাই যে যার সাধ্যমত সারাদিনই অঙ্কন পর্ব করে চলেছেন। তার পর পরস্পরের দেখা ও তারিফ করা। সেই আনন্দের দিনগুলো একে একে ছায়াবাজির মতো মিলিয়ে গেল। রথীদার সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর পিতার মতে মিলত না ঠিকই, কিন্তু পুত্রের শিল্পদৃষ্টি সম্বন্ধে পিতা ছিলেন খুবই আগ্রহী।

একবার কবি আগেই এসেছেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে নিয়ে। ইতিমধ্যে ঘরের একটু টানাটানি হওয়ায় একটা নূতন শোবার ঘর করা হয়েছে। রথীদা আসবেন, ঠিক হয়েছে রথীদা সেই ঘরে থাকবেন। ঘরটা অবশ্য নূতন বলে তখনো একটু ভেজা— ঘরে তিন-চারটে হিটার জ্বালিয়ে দিয়ে, ফায়ারপ্লেসে কাঠের আগুন দিয়ে ঘর গরম করা হচ্ছে— ঘরটা শুকোনো চাই। পরের দিনই রথীন্দ্র-নাথ আসবেন। সকালবেলা উঠেই কবি সে ঘরে গিয়েছেন দেয়ালে হাত দিয়ে দেখছেন দেয়াল ভিজে আছে কি না। তার পর আমাদের বলেছেন : এই ঘরটা একটু ভিজে আছে ; রথীর তো শরীর ভালো নয়, ওকে আমার ঘরে দিয়ে দাও, আমি এই ঘরে থাকব। যাই হোক, তা অবশ্য করা হয় নি। সেবার অনেকদিন পিতাপুত্র দুজনেই একসঙ্গে আমাদের কাছে ছিলেন। একদিন কবি আমাকে বলেছেন : তুমি যে আমার খাওয়ার কাছে বসে আছ, রথীর কাছে কে আছে ? আমি বললাম : রথীদা তো এখন খাচ্ছেন না, এসরাজ বাজাচ্ছেন।—

এসরাজ বাজাচ্ছে! সে তো আরো ভালো, যাও, এসরাজ শোনো গে যাও। শ্রোতা না থাকলে কি বাজানো যায়? অবশ্য আমাদের বাড়িতে রথীদার একজন প্রিয় শ্রোতা ছিলেন। তিনি হচ্ছেন, আমার স্বামী মনোমোহন সেন। তুজনেই খুব ধীর স্থির, আস্তে আস্তে কথা বলেন— ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। ওঁরা তুজনে কাছাকাছি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন গল্প করতেন, বেশ কাছে থেকেও কেউ শুনতে পেত না কী বিষয়ে গল্প হচ্ছে। খুবই জমত ওঁদের।

কবির মৃত্যুর পরও রথীদা-প্রতিমাদি অনেকবার মংপুতে এসেছেন। এই কথা বলতেই মনে পড়ল আমি 'প্রতিমাদি' বলতাম বলে রথীদা ভারি রাগ করতেন, বলতেন: দাদার বৌ তো বৌঠান হয়। সারা শান্তিনিকেতন তো প্রতিমাকে বৌঠান বলে, তুমি আবার দিদি বার করলে কোথা থেকে— সম্পর্কটা তো আমাকে দিয়ে, তাই নয়! যদিও তাই বটে, তবু প্রতিমাদির সঙ্গে আমার আগে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। দিদি বলতাম বটে, কিন্তু উনি আমার মা-ই ছিলেন। মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ এই অতুলনীয়া নারীর কথা মনে পড়লে আজও চোখে জল আসে। একবার আমাকে কাজে কলকাতায় আট্‌কে যেতে হয়, তখন প্রায় মাসখানেক রথীদা-প্রতিমাদি মনোমোহনের কাছে মংপুতে ছিলেন। জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সময়ে আমরা এক পরিবারের মতো প্রীতি সৌহার্দ্য ও ভালোবাসায় এক হয়ে ছিলাম। কালের প্রবাহ কোনো বন্ধন রাখতে দেয় না— তার ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে সব গ্রন্থি এলিয়ে পড়ে। ক্রমে আমরা পরস্পর দূরে চলে গেলাম।

১৯৫৯ সালে রবীন্দ্রভবনে বসে একটা বই লেখবার জন্য reference খুঁজতাম, প্রায় তুমাস ধরে কাজকর্ম চলেছিল। আমি যখন কাজ করতে আসি তার অল্প পরে রথীদা এসে তাঁর গুহাঘরে আশ্রয় নিলেন। একদিন পথের মধ্যে দেখা হয়ে গেল— অনেকদিন পরে।

বন্ধুপত্নী শ্রীমতী প্রতিমা দেবী

দেবী প্রতিমাসু

আজি যে হয়েছে তাই বন্ধুবর রথী

যে তাদের পতি—

যে রথীর বর—

দুটি চক্ষে শুধু যাঁর সবই সুন্দর—

তাঁর পাশে করে

পরম আদরে

THE TEMPEST

চির পরিচিত এই পরী-নাট্যখানি

অর্পিলাম আনি।

মৃদু উপহার

প্রীতির প্রতিভূ তবু শ্রদ্ধা ও আদর!

ইতি

আপনার স্বামীর সাথি

সত্যেন্দ্র —

১২-৮-২২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -রচিত কবিতা : প্রতিমাদেবীর উদ্দেশে

ছদ্মনামে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত -রচিত কবিতা : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রেরিত

আমাদের উপরও অনেক ঝড়-ঝাপটা চলে গেছে। রথীদা জিজ্ঞেস করলেন: কেমন আছ? আমি বললাম: চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ।— রথীদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন: সুখানি আর কোথায় ভাই, দুখানিই তো দেখছি! তখন থেকে প্রায় রোজই একবার গুহাঘরে একবার কোণার্কে যেতাম। কোণার্কে তো যেতেই হত খাওয়া-দাওয়ার কারণে। রথীদা বোধ হয় তখনো কাঠের কাজ করতেন। আমার ঠিক মনে পড়ছে না গুহাঘরে কী করতেন, তবে সব সময়ই তাঁর একটা-না-একটা কিছু শিল্পকাজ হাতে থাকত।

রবীন্দ্রভবনের লেখাপড়া আমার শেষ হয়ে আসছিল। ভাবলুম, যাঁরা এখানে আমাকে পড়াশুনা করতে সাহায্য করেছেন তাঁদের একদিন চা খাওয়াব। রথীদাকে বললুম: রথীদা, আমি সবাইকে একটু চা খাওয়াব, আপনি কী খাবেন? রথীদা বললেন: তুমি খাওয়ালে আর খাব না? কোথায় নিমন্ত্রণ করবে? আমি বললুম: এখানে আর আমার কী আছে ব্যবস্থা— ঐ কোণার্কের বারান্দাতে করব। রথীদা একটু চুপ হয়ে গেলেন। আমি খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। তখন রথীদা বললেন: আচ্ছা। আমি বললুম: দেখুন ঠিক আসবেন, আমার যজ্ঞ পণ্ড করবেন না। প্রতিমাদিকে এসে ক্ষিতীশবাবু আর আমি বললাম। তখন তিনি কী বলেছিলেন আমার মনে পড়ে না, শুধু মনে পড়ে বিকেলবেলা বারান্দার সাজসজ্জা দেখে কিরকম অবাক হয়েছিলাম। ভালো ভালো টেবিলের চাদর বেরিয়েছে, ভালো ভালো টি-সেট কাটলারি সাজানো হয়েছে। খাবার এল। কিছু কালোর দোকান থেকে, কিছু বাড়িতে তৈরি হল। অতিথিরা সব এলেন, কে কে এলেন এখন সব মনে পড়ছে না। তবে মনে হয় শোভনলাল, চিত্তরঞ্জন দেব এঁরা তো ছিলেনই। ক্ষিতীশ-বাবু আর আমি অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছি রথীদা আসবেন কিনা। শেষটায় ক্ষিতীশবাবু বললেন: যাই আমি ধরে নিয়ে আসি। একটু

পরে দেখি দুজনে আসছেন। রথীদা বেশ একটা জমকালো বক্কু চাপিয়েছেন।

১৯৬১ সালে রাশিয়াতে রবীন্দ্রজন্মশতাব্দীর উৎসবে গিয়েছিলাম। আমার যেতে একটু দেরি হয়েছিল। সেটা বোধ হয় ছিল জুনের শেষ দিকে, কিংবা জুলাইয়ের প্রথম দিকে। তখন ওখানে যে-কয়েকটি বাঙালি ছিলেন রোজ দেখা হত। সেদিন সমর সেন আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। খাবার-সাজানো টেবিলের সামনে বসে আছি, এমন সময় বিশ্বজিৎ এসে ঘরে ঢুকল। সে বলল, একটা খবর শুনলাম, রথীদা নাকি মারা গেছেন? আমরা চমকে উঠলাম, আমার মুখ দেখে সমর সেন বুঝতে পারলেন এক্ষুনি এ কথাটা বলা উচিত হয় নি। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন: কে বললে তোমাকে, আমি তো এক্ষুনি শুনেছি উনি অসুস্থ। রাত্রে হোটেলে ফিরে লিফ্‌টে ঢুকেছি, আর-একটি ভারতীয় এসে ঢুকলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: আপনি কবে এসেছেন? তিনি বললেন: আজই।— দেশের খবর কিছু বলুন— তিনি বললেন: Poet's son is dead।

সেদিন হোটেলে একলা ঘরে বসে বুঝতে পারলাম রথীদাকে কত ভালোবাসতাম। মতের অনেক অনৈক্য সত্ত্বেও তিরিশ বছর ধরে তিনি আমার দাদাই ছিলেন। আমার নিজের কোনো বড়ো ভাই নেই। আমাদের সংসারের সুখে-দুঃখে আমাকে ও মনোমোহনকে তিনি অনেক সদুপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। তিল তিল করে দিনে দিনে যে সম্পর্ক তৈরি হয় এক মুহূর্তে তা কি ছিন্ন হয়ে যায়? জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে এই বাড়ির আশ্চর্য মানুষগুলির স্নেহ পেয়েছিলাম, যাঁদের ভালোবাসতে পেরে কৃতার্থ হয়েছিলাম। তাঁদের সঙ্গে কি আজ আর কোনো যোগ নেই? কি জানি!

কর্মের দাম ও ত্যাগের ক্ষেত্র

শ্রীক্ষিতীশ রায়

শুরুতেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবৎকালে বিশ্বভারতী থেকে তাঁর বহুবৎসরব্যাপী কর্মের কোনো মূল্য পান নি— প্রত্যাশাও করেন নি। তাঁর পিতার ভাষায় বিশ্বভারতী ছিল তাঁর 'ত্যাগের ক্ষেত্র'।

রথীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনের একটি বৃহৎ অংশ উৎসর্গ করেছিলেন বিশ্বভারতীর সেবায়। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল, তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব। বিশ্বভারতীর বহু বিভাগের সূচনা হয়েছে তাঁর হাতে। বহু বিচিত্র কাজে তাঁর সুদক্ষ পরিচালনার সাক্ষ্য এখনো এখানে-ওখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আকারে দেখা যায়, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে।

১৯৫১ সালে মূলত তাঁরই উদ্‌যোগে বিশ্বভারতী ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতি পায়। প্রথম উপাচার্যরূপে নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের কাজ তিনি অগ্রসর করে দেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রী কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তিনি আনন্দ পান নি, বরঞ্চ গ্লানি অনুভব করেছিলেন। সেই কারণে ও অন্যান্য কতকগুলি পারিবারিক কারণে দু-তিন বছর বাদেই বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন। শান্তিনিকেতনের বসবাস তুলে দিয়ে নির্বান্ধব দেরাদুনে রথীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

১৯৬১ সালে পিতা রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তির সূচনায়, দেরাদুন-রাজপুরের 'মিতালি' বাড়ি থেকে রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী প্রতিমা

দেবীকে একটি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন তাঁর স্বল্প সাধ্য ও সামর্থ্য অনুসারে, কিভাবে তিনি দেরাদুন, মুসৌরি ও রুড়কি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করেছিলেন। শোনা যায়, এ কাজে অত্যধিক পরিশ্রম ও উদ্‌বেগের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যহানি হয় হয় ও তিনি শয্যা নিতে বাধ্য হন। স্ত্রীকে লেখা তাঁর এই শেষ চিঠির তারিখ ছিল ১৯ মে, পক্ষকাল পরে ৩ জুন তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর আজীবন সম্পর্ক ছিল সেই শান্তি-নিকেতনে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা যে হয় নি, এতে তাঁর অনেক গুণগ্রাহী ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করে থাকেন। সেই কথা মনে রেখে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের 'পরিচয়' অংশে 'রথীন্দ্রস্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন : "রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার স্পষ্ট ব্যবস্থা বিশ্বভারতীতে না হয়ে থাকলেও বিশ্বভারতীর একটি সদন বিশেষভাবে তাঁর স্মৃতি অদৃশ্যে বহন করছে সে কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি— সেটি রবীন্দ্রসদন।"

রবীন্দ্রসদন (ভবন)-এর জন্মকথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করলে বুঝতে পারি প্রভাতকুমার কী কারণে বলেছেন, রবীন্দ্রসদন এক হিসাবে রথীন্দ্রনাথেরও স্মারণিক।

অবেক্ষকরূপে আমি বহুকাল রবীন্দ্রভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। সেখানকার স্মারণিক সামগ্রী নাড়াচাড়া করার ভিত্তিতে আমার অনুমান করতে ভালো লাগে যে, কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর একটি খাতা ও তাঁর শেষ ব্যবহৃত একজোড়া চটিজুতো দিয়ে সম্ভবত রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার সূত্রপাত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্নীকে বলেছিলেন সংস্কৃত ভাষায় মূল রামায়ণ পড়ে তিনি যেন ছেলেমেয়েদের জন্য সংক্ষেপে বাংলায় তার তর্জমা করেন। দেবনাগরী হরফে সদ্য যখন সংস্কৃত ভাষায় বর্ণপরিচয় শুরু

করেছেন— মৃণালিনী দেবীর খাতাখানি সেই সময়ের। পরে একটি যে বাঁধানো খাতায় রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তন ও সংশোধনাদি সহ মৃণালিনী দেবী তাঁর তর্জমার কপি রেখেছিলেন— সেটি আর পাওয়া যায় নি।

১৯০২ সালে ২৩ নভেম্বর তারিখে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল। সমবেদনা জানাবার জন্য সেদিন রাত পর্যন্ত লোকের ভিড়। যখন সকলে চলে গেল, রথীন্দ্রনাথকে ডেকে নিয়ে তাঁর মায়ের সর্বদা-ব্যবহৃত চটিজুতো জোড়াটি তাঁর হাতে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বললেন, "এটা তোর কাছে রেখে দিস্। তোকে দিলুম।" রথীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই দুটি কথা বলেই নীরবে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। মায়ের চটি এখন রবীন্দ্রসদনে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।"

মায়ের মৃত্যুর সাত বছর পরে, সদ্য-আমেরিকা-ফেরত রথীন্দ্রনাথ অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর নিজের জন্মদিনে ভগ্নীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "এই মাসটা এলেই সেই সব কথা মনে পড়তে থাকে। সাত বৎসর হল এই সময়তেই মা আমাদের ছেড়ে যান। আবার শমীরও এই মাসেতে জন্ম ও মৃত্যু দিন।... বাবাকে যত দেখছি ততই কষ্ট হচ্ছে— তিনি অবিশ্যি কিছু বলেন না— কিন্তু স্পষ্টই দেখছি তাঁর মনে আর কোনও সুখ নেই। আমার কষ্ট আরও বেশী হয় এই জন্যে যে তাঁকে সুখী করতে পারব এ বিশ্বাস আমার নেই। এখন থেকে নিজেকে যদি একটু কাজের মানুষ গড়ে তুলতে পারি— তা হলেই বা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারব একটু।..."

পিতার কাজে সহায়তা করার বাসনা থেকেই রথীন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের মৃত্যুর কিছুকাল পর থেকেই দিনপঞ্জি রাখার অভ্যাস করে-ছিলেন। বলেছেন: "এমন কি, বাবামশায়ের কথাবার্তার অনু-লেখন রাখবার চেষ্টা থেকেও বিরত হই নি— যদিও তা নিতান্তই দুঃসাহসিকতা বই কিছু না।"

এই শেষোক্ত কাজে তাঁর সহযোগী হয়েছিলেন সন্তোষচন্দ্র

মজুমদার। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের মুখের কথার অনুলেখন সংরক্ষণে ইনিই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯০৬ থেকে ১৯০৯ সাল অবধি রথীন্দ্রনাথ ছিলেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দেশে ফিরে আসার পর জমিদারি-পরিচালনায় পিতার কাছে হাতে-কলমে শিক্ষানবিশি করার পর স্বয়ং পরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নেন। এই সময়েই পিতার অভিপ্রায়-ক্রমে জোড়াসাঁকো বাড়ির ছন্নছাড়া সংসারের শ্রী ফিরিয়ে আনার জন্য পিতা কর্তৃক নির্বাচিত কন্যা বালবিধবা প্রতিমাকে বিবাহ করেন ১৯১০ সালের গোড়ায়। পরবর্তী বছরে পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল বিলাত ও আমেরিকা ঘুরে আসবেন ও সেই সুযোগে পুরাতন ব্যামো অর্শের চিকিৎসা করাবেন।

বিদেশযাত্রার সুযোগ শেষ পর্যন্ত ঘটল ১৯১২-১৩ সালে। এবার নিজেকে কাজের মানুষরূপে গড়ে তোলবার একটা সুযোগ পেলেন রথীন্দ্রনাথ। বিদেশে পিতার সেক্রেটারির তাবৎ কাজ তিনি একপ্রকার একা হাতে সম্পাদন করে যেতে লাগলেন। সে খুবই গুরুভার কাজ ; কারণ সেইসময়ে তাঁর গীতাঞ্জলি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদের সূত্রে বিলাতের মনীষী ও প্রকাশন -মহলের সঙ্গে ভারতীয় কবির নিত্য নূতন নূতন সংযোগ ঘটছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে প্রতিভাধর পিতার খামখেয়াল সংযত রেখে রথীন্দ্রনাথ এমন একটি কাজের সূত্রপাত করেছিলেন যার জন্য রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠক ও গবেষকমণ্ডলী এখনো মুক্তকণ্ঠে তাঁকে সাধুবাদ ও ধন্যবাদ দেন।

দূরদশী তরুণ লণ্ডনের খবর কাগজ পাড়ার সবচেয়ে নামী International Newspaper Clipping Service-এর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হয়ে এমন এক ব্যবস্থা করে আসেন যার ফলে পৃথিবীর যাবতীয় পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত সকল রকম উল্লেখ কর্তিকা আকারে তাঁর হস্তগত হতে থাকে। এই-সব কর্তিকা বিভিন্ন দেশে

বিভিন্ন কালে রবীন্দ্রনাথের ক্রিয়াকলাপ, রচনা ও মুখের ভাষণের ঐতিহাসিক দলিল। সেইসঙ্গে তিনি এমন ব্যবস্থা করেন যাতে রবীন্দ্রনাথের তাবৎ রচনা বা চিঠিপত্রের কপি সংরক্ষিত হয়।

পিতার দৈনন্দিন জীবনযাপন ও কর্মকাণ্ডের আনুপূর্বিক ইতিহাস যাতে রক্ষা পায় তার জন্যে রথীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে যত্নবান হন, বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন ও পিতার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর।

১৯২১ সালে বিশ্বভারতী পত্তন হবার কাছাকাছি সময়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের (তিনি তখন যুগ্ম কর্মসচিব) সঙ্গে মিলিত উদ্‌যোগে রথীন্দ্রনাথ পিতার আবাসের সন্নিহিত কোনো স্থানে একটি বিশেষ দপ্তর স্থাপনের ব্যবস্থা করেন, তার নাম দেন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের দপ্তর। রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বভারতী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য অর্থাৎ Founder President। সূচনায় এই দপ্তরে থাকত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যবহারের পুস্তক ও পত্রিকা ছাড়া তাঁর পাণ্ডুলিপি ও চিঠিপত্রের কপি এবং তাঁর কার্যকলাপ-সম্পর্কিত দেশী বিদেশী খবর কাগজের কর্তিকা। কর্তিকাগুলি সন তারিখ অনুসারে বিন্যাস করে নথিভুক্ত করার প্রাথমিক ও পরিশ্রমসাধ্য কাজটুকু স্বয়ং রথীন্দ্রনাথ করতেন। পরে এই কাজের জন্য তিনি সহকারীরূপে কয়েকজনকে তালিম দিয়ে তৈরি করে নেন। কর্তিকা সংরক্ষণের কাজ ছাড়াও তাঁরা কপি করতেন, টাইপ করতেন ও দপ্তরের অন্যান্য কাজ সামলাতেন— কবির প্রাইভেট সেক্রেটারির নির্দেশ অনুসারে। প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের দপ্তরে নিযুক্ত ছিলেন এমন কয়েকজনকে আমিও পরে সহকর্মীরূপে পেয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধীন্দ্রকুমার সেন, সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ, সুধীরচন্দ্র কর ইত্যাদি।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের দপ্তর পরিণত হয় প্রথম রবীন্দ্রপ্রদর্শশালা এবং তৎপরে রবীন্দ্রভবনরূপে।

১৯৪০ সালের শেষ পাদে কলকাতায় দুই মাস কাল রোগশয্যায় কাটাবার পর রবীন্দ্রনাথকে ১৮ নভেম্বর তারিখে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনা হয়। এর পর ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই তারিখে কলকাতায় তাঁকে অস্ত্রোপচারের জন্য না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বৌমা প্রতিমা দেবীর তত্ত্বাবধানে উদয়ন বাড়ির দক্ষিণ দিকের ঘরেই বসবাস করেছেন— প্রথমে একতলায় ও শেষদিকে দোতলায়। রোগীর পরিচর্যা ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করার সুবিধা ছিল উদয়নের এই অংশে। তখন একতলাতেই বসত প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের দপ্তর।

১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (বাইশে শ্রাবণ) তারিখে পিতার মৃত্যুজনিত মর্মন্তুদ শোকের উপর কলকাতার শোকযাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল জনতার আচরণে রথীন্দ্রনাথ গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর সেই বিহ্বল অবস্থায় এই দপ্তরের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছিল। অনতিকাল পরে বছরের শেষ দিনে কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ মনস্থির করে সংবাদপত্র মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে অতঃপর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের দপ্তর পরিণত হবে রবীন্দ্র-প্রদর্শশালা রূপে এবং তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের তাবৎ স্মারণিক সামগ্রী বিশ্বভারতীর হাতে সমর্পণ করবেন রবীন্দ্রজিজ্ঞাসুদের ব্যবহারের জন্য। তদনুসারে বাইশে শ্রাবণের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে গুরুদয়াল মল্লিকের মতো একজন একনিষ্ঠ রবীন্দ্রসাধক প্রদর্শশালার প্রথম অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতীর মুখপত্র 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এর ১৯৪২ আগস্ট সংখ্যার মল্লিকজীর প্রতিবেদন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রভবনে পরিণত হবার পথে Rabindra Museum ছিল প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর প্রতিবেদনের শেষ অংশে মল্লিকজী স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় একটি আশা প্রকট করে বলেছিলেন : "আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি প্রদর্শশালায় গুরুদেবের এই শিল্পসাহিত্যের তীর্থক্ষেত্রে নানা দিগ্‌দেশ থেকে বহু তীর্থযাত্রী

রবীন্দ্রপ্রতিভার শিখায় তাঁদের নিজ নিজ দীপবর্তিকা জ্বালিয়ে নেবার জন্য সমবেত হবেন।”

এই সদন সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারের মুখবন্ধের জের টেনে এই লেখা শেষ করছি—

“আমাদের দেশে বরেণ্য লেখকদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতির ধারণা নেই। রবীন্দ্র-পূর্ব স্মরণীয় লেখকদের পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র সামান্যই পাওয়া যায়। রথীন্দ্রনাথ যৌবনকাল থেকেই পিতার পাণ্ডুলিপি চিঠিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহে তাঁর কর্মময় জীবনের অবকাশে বিশেষভাবে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন— যে-সময় এসবের চল ছিল না। কবির বন্ধু ও অনুরাগী যাঁরা তাঁর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের অনেকের কাছ থেকে ও পরে অনেক চেষ্টা করে সেগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র কপি করেছিলেন, যার ফলে বহু চিঠি রক্ষা পেয়েছে এবং অনেকটা তারই ফলে চিঠিপত্র গ্রন্থমালা প্রকাশিত হতে পারছে। তাঁর নির্দেশেই রবীন্দ্রনাথের রচনা একসময় থেকে কপি হয়ে প্রেসে যেতে আরম্ভ করে— যার ফলে এককালের বহু পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হয়ে আজ বিচিত্র গবেষণার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমার যৌবনকালের কথা মনে আছে, পৃথিবীর যেখানে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে যত বিবরণ প্রকাশিত হত রথীন্দ্রনাথ তার কর্তিকা সংগ্রহ ও রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করে দেন। এগুলি বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হত। এগুলি ছিল বলে রবীন্দ্রজীবনীর অনেক অংশ লেখা সহজ হয়েছিল। এ যখনকার কথা তখন রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের নিদারুণ অর্থকষ্টের কাল— তার মধ্যেও রথীন্দ্রনাথ এ সকল ব্যবস্থা করতে অবহিত ছিলেন। তার পর রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর পিতার স্মরণে রবীন্দ্রভবন সংগঠনে রথীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছিলেন এবং বিশ্বভারতীর সেই আর্থিক সংকটের

মধ্যে যতটা সম্ভব তাঁর উদ্‌যোগ সফল হয়েছিল। তাঁর সারাজীবনের পাণ্ডুলিপি, ফোটোগ্রাফ, চিত্রসংগ্রহ তিনি এখানে দান করেন। পরে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী ও অন্যান্যের অনুরূপ পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহ ইত্যাদির দানে তা পুষ্ট হয়। ভবিষ্যতে যদি রবীন্দ্রভবন রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্যের তাথ্যিক গবেষণার প্রধান কেন্দ্র হতে পারে তবে যেন আমরা স্মরণ রাখি যে রথীন্দ্রনাথই এর মূলে। এই ভবনের সার্থকতার দ্বারাই অলক্ষ্যে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা হবে।"

রথীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরাও অনুরূপ আশা পোষণ করি।

রথীন্দ্রস্মৃতি

শ্রীললিতকুমার মজুমদার

আমি যখন ১৯৪১ সালের গোড়ায় ছাত্রাবস্থায় শান্তিনিকেতন দেখতে আসি তখন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাব এই আশা ছিল, কিন্তু সে সৌভাগ্য হয় নি। বেলা দশটা বেজে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ, তখন তাঁর বিশ্রামের সময়। ঘুরতে ঘুরতে চৈত্যের সামনে যখন এলাম তখন দেখলাম এখন যেখানে পাঠভবন অধ্যক্ষের অফিস, সেখান থেকে দুই-তিনজন ব্যক্তি বেরিয়ে আস্তে আস্তে উত্তরায়ণের দিকে যাচ্ছেন। আমি যাঁর সঙ্গে এসেছিলাম তিনি একজনের দিকে ইশারা করে বললেন, "ওই দেখ্, রথী ঠাকুর।" দেখলাম সাদা ঢিলে পাঞ্জাবি পাজামা পরা লম্বা মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, মাথায় সোলা টুপি। মুখ পরিষ্কার কামানো। রঙ ফর্সা নয়, চাঁছা মাজা। ছবিতে রবীন্দ্র-নাথের চেহারা যা দেখেছি তার সঙ্গে কোনো মিল চোখে পড়ল না। রবীন্দ্রনাথের শ্মশ্রুমুণ্ডিত মুখ একটিই দেখা যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তোলা একটি মস্ত পারিবারিক ফোটোতে। রবীন্দ্রনাথকে তার মধ্যে থেকে চিনিয়ে না দিলে কজন লোক তাঁকে চিনতে পারবেন জানি না। সেই ফোটোর সঙ্গে মেলালে রবীন্দ্রনাথের মুখের আদল রথীন্দ্রনাথের মধ্যে খানিকটা পাওয়া যায় মনে হয়। রথীন্দ্র-নাথ তখন উত্তরায়ণ থেকে আসতেন সেগুনতলার ঐ ঘরটিতে অফিস করতে। তিনি তখন বিশ্বভারতীর কর্মসচিব, অর্থাৎ প্রধান কর্মকর্তা।

এর তিন বছর পরে যখন শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করতে এলাম তখন রবীন্দ্রনাথ নেই। কিন্তু সূর্যাস্তের পরে যেমন আকাশে সূর্যের আভা বেশ কিছুক্ষণ রয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও তেমনি

শান্তিনিকেতনের হাওয়ায় যেন তাঁর উষ্ণশ্বাস অনুভব করা যেত। অন্তত আমার মতো নবাগতের তাই মনে হত। রবীন্দ্রনাথকে শুধু তাঁর রচনায় নয়, শান্তিনিকেতনে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহরু উভয়েই এটা বুঝেছিলেন। তাই জেল থেকে বেরিয়েই তাঁরা একে একে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে এলেন, রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে গেলেন। পিতার অবর্তমানে রথীন্দ্রনাথ বছর দশেক বিশ্বভারতীর হাল ধরে বসেছিলেন। দশটি বছর তিনি যেন পিতৃদায় বহন করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, সুরেন্দ্রনাথ কর, অনিলকুমার চন্দ, কলকাতায় রবীন্দ্র-অনুরাগী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং বিদেশের বন্ধু এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেব সে সময়ে রথীন্দ্রনাথের সহায় হয়েছিলেন, তা না হলে হয়তো তিনি বিশ্বভারতীকে ধরে রাখতে পারতেন না। যাই হোক, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার বিশ্ব-ভারতীর ভার গ্রহণ করলেন। নবগঠিত বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য হলেন রথীন্দ্রনাথ। কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁর প্রস্থান ঘটল।

সাত-আট বছর ধরে আমি দূর থেকে রথীন্দ্রনাথকে যেটুকু দেখেছি এবং অতি অল্পদিন তাঁর কাছে সামান্য যেটুকু যাওয়া-আসা করেছি শুধু সে-কথাই আমি বলতে পারব। রথীন্দ্রনাথকে যতটুকু তুলে ধরতে পারব তার থেকে নিজের কথাই বেশি বলা হবে।

রথীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বভাবলাজুক। বিদেশে পড়াশোনা করেছেন, পিতার সঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরেছেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে বরাবর ভারি একটা সংকোচের ভাব ছিল। শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণের বাইরে তাঁকে বড়ো একটা দেখা যেত না। উৎসব-অনুষ্ঠান সমূহে তিনি যোগ দিতেন ঠিকই, কিন্তু লোকেদের সঙ্গে আলাপ করতে কোথায় যেন তাঁর বাধত। অথচ শান্তিনিকেতনের লোকেদের প্রতি প্রকৃত টান তাঁর ছিল। শান্তি-

নিকেতন ও শ্রীনিকেতনে কোথায় কী কাজকর্ম কিরকম চলছে তার খুঁটিনাটি খবর যেমন রাখতেন তেমনি কোনো কর্মীর পরিবারে হঠাৎ কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাঁর অর্থের বিশেষ প্রয়োজন, তখন খামে করে যৎসামান্য অর্থসাহায্য তাঁর কাছে এসে পৌঁছত। No one is a hero to his valet কিন্তু রথীন্দ্রনাথের valet স্বরূপ যারা ছিল তারা রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর অমায়িক ব্যবহার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করত।

শান্তিনিকেতনে চাকরি করতে এসে একটি রীতি দেখে যেমন বিস্মিত তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলাম। বোধ হয় মাস দুয়ের মধ্যে একটি চিঠি পেলাম রথীন্দ্রনাথ অমুক দিন উত্তরায়ণে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছেন। গিয়ে দেখলাম আমার মতো যাঁরা নতুন চাকরিতে বিভিন্ন ভবনে ঢুকেছেন তাঁরাও আমন্ত্রিত হয়েছেন। সে উপলক্ষেই আমার উত্তরায়ণে প্রথম প্রবেশ। সেদিনই দেখলাম রথীন্দ্রনাথ অতিশয় মৃদু স্বল্পভাষী। চায়ের আসর অনিলকুমার চন্দ মহাশয়ই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-প্রিয়তার দ্বারা জমিয়ে রাখলেন। প্রথমেই তিনি বললেন, "আপনারা যাঁরা ধূমপানে অভ্যস্ত তাঁরা সিগারেট খেতে পারেন, রথীদা এ ব্যাপারে খুব liberal। আমি তখন সভ্য সিগারেট ধরেছি। রথীন্দ্রনাথের থ্রি কাসল্‌সের টিন থেকেই একটা তুলে নিলাম। রবীন্দ্রনাথের পুত্রের সামনে সিগারেট খাওয়া! এখন ভাবলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়।

কি বংশগৌরবে কি পিতৃগৌরবে বাংলাদেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষে রথীন্দ্রনাথের মতো দ্বিতীয় ব্যক্তি আর ছিলেন না। তার উপর তিনি বিশ্বভারতীর কর্তা। কর্মক্ষেত্রে তাঁকে অনেক সময় কঠোর হতে হত, কিন্তু তাঁর ব্যবহারে কর্তৃত্বের পরুষ প্রকাশ আমরা কখনো দেখি নি। ছোটো বড়ো সকলের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন ছিল তাঁর পারিবারিক সূত্রে পাওয়া মজ্জাগত গুণ। তা না হলে আমার মতো একজন অতি সামান্য আনকোরা ইস্কুলমাস্টারকে নিজের বাড়িতে

চায়ে আপ্যায়ন করার কোনো দায় তাঁর ছিল না।

বিশ্বভারতীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করার যে গুরু দায়িত্ব রথীন্দ্রনাথের উপর ছিল, তার উপর ছিল দেশবিভাগ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে পৈত্রিক জমিদারি এস্টেটের দেখাশোনা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পরিচালনা, শ্রীনিকেতনের শিল্পসদন সংগঠন, উত্তরায়ণে রবীন্দ্রভবনে একটি উপযুক্ত সংগ্রহশালা গড়ে তোলা, বিশ্বের নানা স্থান থেকে রবীন্দ্র-অনুরাগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা, নিত্য অভ্যাগত গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের আদর-আপ্যায়ন করা ইত্যাদি বহু রকম কাজে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু এর বাইরেও তিনি যা করতেন, যা ছিল তাঁর আনন্দের খোরাক, তা হচ্ছে উদ্যানচর্চা এবং তার চেয়েও যাতে বেশি মগ্ন হয়ে থাকতেন তা হচ্ছে কাঠের কাজ। অবসর সময়ে তাঁকে দেখা যেত উত্তরায়ণের ছোট্ট গুহাঘরটিতে বসে নানারকম যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি আপন মনে কাজ করে যাচ্ছেন। এক রঙের কাঠের সঙ্গে আর-এক রঙের কাঠ মিলিয়ে চমৎকার সব নকশা বা ছবি সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। একবার তিনি কৌতুক করে বলেছিলেন, "আমি জন্মেছি জমিদারের ঘরে, কিন্তু কাজ করেছি ছুতোরের।"

রথীন্দ্রনাথের সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে একটা স্টাইল ছিল। তা হচ্ছে, সমারোহের ব্যাপারও বিনা আড়ম্বরে সমাধা করা। এই ধারাটি নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের আমল থেকেই চলে আসছে। এই যে বেশি হাঁকডাক না করে কাজ করা এটি এখনো শান্তিনিকেতনে রয়ে গেছে, সেটা এখানকার উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি দেখে বোঝা যায়। এগুলি যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়ে যায়।

পাঠভবন সম্পর্কে একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম, রথীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করতেন। এর একটা কারণ হতে পারে অন্য ভবনগুলির ভার নিয়েছিলেন দিকপাল ব্যক্তিগণ। যেমন, কলা-ভবনে নন্দলাল বসু, বিদ্যাভবনে ক্ষিতিমোহন সেন ও পরে প্রবোধচন্দ্র

বাগচী, সংগীতভবনে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শিক্ষাভবনে অনিলকুমার চন্দ প্রমুখ। আর আশ্রমের সবরকম গঠনমূলক কাজে পারঙ্গম শান্তিনিকেতন-সচিব সুরেন্দ্রনাথ কর ছিলেন রথীন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত। পাঠভবনই শান্তিনিকেতনের আদি প্রতিষ্ঠান, রথীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়েই পড়েছেন, তাই এর উপর তাঁর একটা বিশেষ মমতা থাকারই কথা। মাঝে মাঝেই তিনি পাঠভবনের শিক্ষকদের নিয়ে আলোচনায় বসতেন। উত্তরায়ণে ডাক পড়লেই আমাদের যে বুক দুর্ দুর্ না করত তা নয়। যাই হোক, রথীন্দ্রনাথ এটা হয় নি কেন, ওটা করতে হবে— এরকমভাবে কখনো কর্তৃত্ব জাহির করতেন না। আর আমাদের হয়ে কথাবার্তা যা বলবার তা তনয়দাই (তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ) বলতেন। তনয়দার ব্যক্তিত্বকে রথীন্দ্রনাথ রীতিমত মান্য করতেন। তখনকার দিনে যাঁরা চাকরিতে নতুন, তাঁরা ছুটিতে বাড়ি যেতাম এই আশঙ্কা নিয়ে যে কোন্ দিন চিঠি আসবে, "আশ্রমের কাজের দায়িত্ব হইতে আপনাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল", এই ব'লে। আমি আসার পরে দুই-একজনের চাকরিও গেল। রথীন্দ্রনাথের হাতেই চাকরি দেওয়া-নেওয়া ছিল। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ তাঁর আস্থাভাজন কয়েকজনের পরামর্শ না নিয়ে কাউকে বিদায় দিতেন না। এটা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি। আমার চাকরির দুই বছর পর confirmation হবার কথা, তার চিঠি আসছে না। শুনতে পেলাম আমার সম্বন্ধে রিপোর্ট ভালো নয়। চাকরির জন্য কারোর উমেদারি করব না এই একটা পণ ছিল। বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয়বার ডাক পেয়ে তবেই অন্য চাকরি ছেড়ে এসেছিলাম। এখন মানে মানে বিদায় নেবার চেষ্টা করছি, একটা ইন্টারভিউও দিয়ে এসেছি। কিছুদিন বাদে হীরেনদা (শান্তিনিকেতনে ইংরেজির অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) আমাকে এসে বললেন রথীন্দ্রনাথ তাঁদের দুই-একজনকে ডেকেছিলেন আমাদের দু-জন যাঁদের confirmation

আটকে ছিল তাদের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমার বিরুদ্ধে যাঁরা রায় দিয়েছিলেন তাঁরা ঠিক কথাই বলেছিলেন। শান্তিনিকেতনের উপযুক্ত শিক্ষক আমি কোনো-দিন কোনো দিক দিয়েই হতে পারি নি।

রথীন্দ্রনাথের ন্যায়বিচারের একটি দৃষ্টান্ত দিই যদিও ব্যাপারটি নিতান্ত তুচ্ছ। পাঠভবনে আমার পরে কাজে ঢুকে আমার চেয়ে কিছু বেশি বেতনে একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমার আত্মসম্মানে এটা লেগেছিল। আমি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখলাম। অল্পদিনের মধ্যেই দেখলাম ঐ বেতনবৈষম্য দূর করা হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৮ সালে পাঠভবন তথা সমগ্র বিশ্বভারতী সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন বসানো হয়েছিল সুধীরঞ্জন দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে। ঐ তদন্তের ফলে বিশ্বভারতীর কার্যক্রমে বেশ-কিছু রদবদল হল। আর ঐ তদন্তের সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষককে একটা bond সই করতে দেওয়া হল। Bond-এর অন্যান্য অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে একটি ছিল প্রতিদিন সকালবেলায় বৈতালিক এবং বুধবারের সাপ্তাহিক মন্দিরে যোগদান। আমি এই bond-এ সই করলাম, কিন্তু সেইসঙ্গে রথীন্দ্রনাথকে একটা চিঠি দিলাম যে একজন free thinker রূপে ঈশ্বর-উপাসনায় যোগদান বাধ্যতামূলক করাতে আমি বিচলিত বোধ করছি। বহুদিন বাদে আমার service book একবার আমার হাতে আসার সময় দেখতে পেলাম রথীন্দ্রনাথকে লেখা সেই চিঠিটা রাখা আছে। তখন রথীন্দ্রনাথ শুধু শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন নি, দেহত্যাগও করেছেন, না হলে তাঁর উদার মনোভাবের জন্য তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে আসতাম।

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবার আগে পর্যন্ত এখানকার কর্মব্যবস্থায় একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হত

যা দেশের আর কোনো প্রতিষ্ঠানে ছিল বলে আমার জানা নেই। সেটি হচ্ছে, এখানকার কর্মসমিতিতে শিক্ষক অশিক্ষক নির্বিশেষে কর্মীদের নির্বাচিত সদস্যদের স্থান। বিশ্বভারতীর সংসদ অর্থাৎ কার্য-নির্বাহক সমিতিতেও ঐ কর্মসমিতির সভ্যেরা প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাতেন। এই স্বায়ত্তশাসনের উৎকৃষ্ট নীতিটি রবীন্দ্রনাথই নিশ্চয় প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে রথীন্দ্রনাথ দশ বছর এই রীতি মেনে চলেছিলেন, নিজের হাতে সামগ্রিক ক্ষমতা গ্রহণ করবার জন্য তিনি নির্বাচন পদ্ধতিটি বিলোপ করে দেন নি। রথীন্দ্রনাথ যা চাইতেন তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতেন কিনা জানি না, কিন্তু নিজের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার নির্বাচিত সদস্যদের ছিল। বিশ্বভারতী Act প্রণয়নের সময়ে এই নির্বাচনের পদ্ধতিটি তুলে দিয়ে শান্তিনিকেতনের spirit-কে শোচনীয় আঘাত হানা হয়েছে।

আগে বলেছি রথীন্দ্রনাথ স্বভাবত লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের লোকেদের কাছে টানবার আগ্রহ তাঁর খুবই ছিল। শান্তিনিকেতনে তখন club বলতে কিছু ছিল না। আমি কাজে আসার কিছুদিন পর রথীন্দ্রনাথ উদয়নে কর্মীদের জন্য একটি মজলিসের ব্যবস্থা করলেন। বড়ো বড়ো তাকিয়া হেলান দিয়ে গল্পগুজব, তাস, দাবা, draughts খেলার ব্যবস্থা হল। বলা বাহুল্য তার সঙ্গে সান্ধ্য চা। রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থাকলে নিজে এই মজলিসে কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, খেলায় যোগ দিয়েছেন। কিন্তু কোথায় যেন একটা আড়ষ্টতা থেকে গিয়েছিল। সান্ধ্য মজলিসটি বেশিদিন টিঁকল না। রথীন্দ্রনাথকে কর্তাব্যক্তিরূপে সমীহ ও ভয় করা ছাড়া শান্তিনিকেতনবাসীরা তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি এটা তাঁর দুর্ভাগ্য। আর কোনো বড়োকর্তা বা বড়োসাহেব নিজের বাড়িতে কর্মীদের নিয়ে আসর বসাবেন এটা ভাবা যায়?

রথীন্দ্রনাথের কি বাংলা কি ইংরেজি লেখায় দস্তুরমত হাত ছিল,

লিখেছেন অতি সামান্য। বাবার লেখনী যেন তাঁর প্রতি নিষেধের তর্জনী নির্দেশ করত। তা হলেও যেটুকু তিনি লিখেছেন তার প্রধান গুণ ছিল চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য। মনে আছে যখন 'প্রাণতত্ত্ব' লিখছেন তখন চীনভবনে একদিন সকলকে ডেকে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে সভাপতি করে বইটির পাণ্ডুলিপি থেকে বেশ-কিছুটা প'ড়ে শোনালেন। এর অনেকদিন পরে যখন *On the Edges of Time* লিখছেন তখনো উত্তরায়ণে আমাদের ডেকে খাতা থেকে প'ড়ে কয়েক দফা আমাদের শুনিয়েছেন। আমার এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য এই যে রথীন্দ্রনাথ মুখচোরা স্বভাবের হলেও লোকের সঙ্গ বিশেষভাবে চাইতেন।

রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে তাঁর শান্তি-নিকেতন-বাসের শেষ দিকে অল্প কিছুদিনের জন্য। শান্তিনিকেতন কর্মীমণ্ডলীর সম্পাদকরূপে বছর খানেক ধরে আমি ওঁর কাছে যাওয়া-আসা করেছি। উৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন সম্বন্ধে পরামর্শ নেবার জন্য তাঁর কাছে যেতে হত। তখন তাঁর ব্যবহারের যে একটি মাধুর্য ছিল তার পরিচয় পেয়েছি। রথীবাবু সম্বন্ধে এখানকার অনেক লোকেরই একটা ভীতি ছিল, কিন্তু তা অমূলক। একবার একটি অনুষ্ঠানের কার্যসূচী তৈরি করে তাঁকে দেখাতে গেলাম। আমরা বিশ্বভারতীর দুই প্রধান ব্যক্তির একজনকে সভাপতি এবং অন্যজনকে প্রধান অতিথি করেছিলাম। রথীন্দ্রনাথ সেটি দেখে মুচকি হেসে বললেন, "এঁর নাম দেখলে উনি তো মুষড়ে পড়বেন, আসবেন কি ?" সত্যিই দেখা গেল তিনি আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন।

আমি কর্মীমণ্ডলীর সম্পাদক থাকা কালে general kitchen-এর কয়েকজন কর্মী একদিন এসে আমাকে অনুরোধ করল রথীবাবুর কাছে তাদের একটা আর্জি পেশ করে দিতে। তখনকার দিনে রান্না-ঘরের কর্মীদের বেতন ছিল যৎসামান্য। চারবেলা তারা রান্নাঘরের

খাবার পেত, এই যা। কিন্তু গ্রীষ্মের বা পুজোর ছুটি এই তিনমাস তাদের শুধু শুকো মাইনেটাই দেওয়া হত। আহারের পরিবর্তে ছুটির সময় তাদের জন্য যেন কিছু টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হয় তাদের এই প্রার্থনা আমি রথীন্দ্রনাথের কাছে জানালাম। তিনি তাদের টাকা মঞ্জুরও করলেন। কিন্তু "বাবু যত বলে পরিষদ দলে বলে তার শতগুণ।" সেই পারিষদগণ রথীন্দ্রনাথকে বোঝালেন ছুটির মাসে রান্নাঘরের লোকদের খাবার বাবদ টাকা দিতে হলে বিশ্বভারতী ফতুর হয়ে যাবে। একদিন আমি কর্মীমণ্ডলীর কাজে রথীন্দ্রনাথের কাছে গেছি তখন দেখলাম তাঁর মুখ গম্ভীর। আমাকে বললেন, "তুমি এখানে আবার Labour trouble আরম্ভ করবে না তো? আমি এবারের মতো ওদের টাকাটা দিচ্ছি, কিন্তু এটা যেন ওরা তাদের claim বলে মনে না করে।" আমার এ কথা বলার সাহস হয় নি যে ওদের দাবিটা ন্যায্য।

একবার পৌষ উৎসবের সময় উত্তরায়ণের বিশিষ্ট অতিথি-অভ্যাগতদের যথারীতি দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। সে সময় আমার ভাই রবীন্দ্রভবনে কাজ করতেন। রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। হঠাৎ আমার ভাই শুনতে পেলেন পাশের ঘরে রথীন্দ্রনাথ কাকে বলছেন, "মোহিতবাবুকে এখানে খেয়ে যেতে বলা হয়েছে তো?" এই সৌজন্যবোধ কি দুর্লভ বস্তু নয়?

১৯৬১ সালে রথীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মের ছুটিতে দেহত্যাগ করলেন। ছুটির পর তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কোনো কিছু করা হল না। আমার এটা ভালো লাগছিল না। আমি সেবারেও কর্মীমণ্ডলীর সম্পাদক। সাহস করে উপাচার্য সুধীরঞ্জনদাকে গিয়ে বললাম, "রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর প্রাক্তন প্রধান কর্মী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি শোকসভা করা কর্মীমণ্ডলীর কর্তব্য।" সুধীরঞ্জনদা সম্মত হলেন এবং তাঁর সভাপতিত্বে রথীন্দ্রনাথের শোকসভা অনুষ্ঠিত হল।

শিল্পীসত্তা ও আর-এক রথীন্দ্রনাথ

শ্রীকাঞ্চন চক্রবর্তী

যেমনতরো আন্দোলনই হোক, তা কিছু মেঘের সঞ্চার করে ; আর সেই মেঘের আড়ালে ছোটো মাপের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা ঢাকা পড়েন। রবীন্দ্রপ্রতিভা ঘিরে জাতীয় জীবনে যে সার্বিক আন্দোলন ব্যাপ্তি পেয়েছিল রথী ঠাকুরের মতো নাতিবৃহৎ অনেক প্রতিভাই সেই মেঘমণ্ডলে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথের নেপথ্যগামী প্রকৃতিও এই অন্তরাল তৈরিতে সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার কোনো সচেতন প্রয়াসে, নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে নিজেকে প্রকাশ বা প্রচার করা থেকে তিনি বিরত থাকেন নি। নিজের রুচি-প্রবণতাকে সন্তর্পণে সংগোপনে, অহেতুকী আনন্দে লালিত করাই ছিল তাঁর চারিত্র।

আমরা অনেকেই হয়তো এযাবৎ ভেবে দেখি নি যে কবির বহুধা-বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে সুগৃহিণীর মতো অন্তরাল থেকে নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেছিলেন যিনি তিনি রথীন্দ্রনাথ। স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি এ-কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আত্মপরিচয় বা আত্মপ্রকাশ তাই সহজেই তাঁর কাছে গৌণ হয়ে গেছে।

তাঁর লেখা 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের ভূমিকায় লিওনার্দ এলম্‌হার্স্ট অনেক সহজ করে এই স্মৃতিচারণ করেছেন—

> রথীদাকে আমরা যারা জানবার সুযোগ পেয়েছি তারা দেখেছি নিজের অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষাকে একধারে সরিয়ে রেখে তিনি তাঁর কবি-পিতার নব নব পরিকল্পনাকে রূপ দিতে ব্যস্ত।… আমাদের দুঃখ রয়ে গেল যে তাঁর বিচিত্র ক্ষমতা, ঐকান্তিক

নম্রতাবশত যার আড়ম্বর তিনি আমাদের কাছে কখনো করেন নি, তার পূর্ণ ব্যবহারের সময় ও অবসর তিনি পেলেন না।···শিল্পী রূপেই হয়তো তাঁর স্মৃতি সঞ্জীবিত থাকবে।

অনেকেই প্রশ্ন তোলেন পিতৃ আদর্শের প্রতি তাঁর এই-যে অনুরাগ ও আত্মোৎসর্গ, তা হলে শ্রীনিকেতন নিয়ে পল্লীসংগঠন ও রথীন্দ্রনাথকে তার প্রাণপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠা করার যে স্বপ্ন কবি দেখে-ছিলেন তা তেমন সার্থক রূপ পেল না কেন? এ কথা কি সত্য নয় যে এলম্‌হার্স্ট সাহেবের প্রস্থানের পর শ্রীনিকেতনের যেটুকু রমরমা রথীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পর্ব পর্যন্ত বেঁচে ছিল তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, শহরঘেঁষা একটা পোশাকি ফ্যাসনের তদারকি করেছে মাত্র। আদত কথা গ্রামজীবন বা গ্রামীণ সংস্কার ও অর্থনীতিতে তেমন কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে তিনি পিতার উদ্‌বেগ ও আকুতির অংশীদার ছিলেন না। এ কথা স্বীকার করে নিতে আমাদের বাধা কোথায়?

এ তর্কে যাওয়ার বাসনা আমার নেই। একটা কথাই বোধ হয় বলা হয়— রথীন্দ্রনাথের জীবদ্দশা ও মরণোত্তর পর্ব নিতান্ত অন্তরালেই থেকে গেছে। এই কালের যথার্থ অনুশীলন ও বিশ্লেষণ যা আজও হয় নি, ব্যতিরেকে আমরা বোধ হয় নিরপেক্ষ কোনো উত্তর খুঁজে পাব না।

বিজ্ঞান-মরমী, নিরলস সৃজনশীল, স্বল্পবাক রথীন্দ্রনাথকে সামনে রাখলে অন্যতর একটা উত্তরই মনে আসে। তাঁর প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও প্রবণতার প্রেক্ষাপটে তাঁকে নিয়ে পিতার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাটি মোহমুক্ত ছিল না বলেই সম্ভবত শ্রীনিকেতনের এই বিপর্যয়! পল্লী-সংগঠনের সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় গ্রামীণশিল্প ও কারুকৃতির মানোন্নয়ন ও প্রসারের ভূমিকাটুকু যদি তাঁর উপর ন্যস্ত হত শ্রীনিকেতনের বাতাবরণ হয়তো ভিন্নতর হত।

স্পষ্টত উচ্চারিত না হলেও এ কথা নিশ্চিত যে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক সম্পর্ক তাঁর সম্বন্ধে কতকগুলি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল। তাঁর স্বেচ্ছাদূরত্ব ও বাচনস্বল্পতা এক ধরনের বৈরিতাকে পুষ্টি দিয়েছে। বাইরে-ভিতরে তাই তিনি পূর্বাপর অপরিচিতই রয়ে গেছেন। রথীন্দ্রনাথের অসংখ্য গুণের কথা মনে রাখলে এটা কম বড়ো ট্রাজেডি নয়!

কিন্তু এ-সমস্ত বিচারের অতীত, রুচিনিষ্ঠ সৃজনশীল রথীন্দ্র-মানসটিকে বোধ হয় আর আমরা অবজ্ঞা-অবহেলা করতে পারি না। পুনর্বিবেচনা আজ নিতান্তই জরুরি। নানা প্রজাতির গাছপালা ফুলফল নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, লেখক হিসাবে তাঁর রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত মৌলিকত্ব, বিশ্বভারতীর কর্ণধার রূপে তাঁর নিঃশব্দ ও প্রত্যয়ী ভূমিকার কথা যদি একদিন আমরা ভুলেও যাই, সৃষ্টিমগ্ন চিত্রী ও কারুকুশলী রথীন্দ্রনাথকে বিস্মৃত হওয়া একেবারেই সহজ নয়।

রথীন্দ্রনাথের শিল্পজীবনের নির্ভরযোগ্য তথ্য বলতে আমাদের কাছে তেমন কিছু নেই। অবন-গগন-রবীন্দ্রনাথ সকলের ক্ষেত্রেই অনুমান ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা-কাহিনী-নির্ভর কতকগুলি তথ্যপরম্পরা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। বিনোদবিহারী থেকে শুরু করে সুখময় মিত্র, দিনকর কৌশিক পর্যন্ত চিত্রপরম্পরা উদ্ধারে এক ধরনের প্রয়াস চলেছে। কিন্তু তাদের সর্বৈব অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এঁরা সকলেই ছবি এঁকেছেন ছবি করার আনন্দে, উন্মাদনায় ও প্রেরণায়। সন তারিখ স্থান, এমন-কি নিজের নামাঙ্কন সম্বন্ধেও এঁরা অনেক সময়েই উদাসীন থেকেছেন। বহু কাজ বহু জনের কাছে বিতরিত হয়েছে এবং ঘনঘন হাতবদল হয়েছে। ইতিহাস নির্ধারণ তাই এঁদের সকলের ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞের দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। রথীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি এক ও অভিন্ন।

কালিম্পঙ, মংপু ও শান্তিনিকেতনে করা কিছু ছবির পরিচয় উদ্ধার করা গেলেও সামগ্রিক পারম্পর্য-নির্ণয়ের কাজটি দুরূহ।

রথীন্দ্রনাথের শিল্প-সংবেদন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় অভিব্যক্তি পেয়েছে। আবেগ-রঞ্জিত হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর চিত্রের জগৎ। রূপাকার-নিষ্ঠ, স্পর্শগুণধন্য চেতনা, বিপরীত মেরুতে থেকে সৃষ্টি করে চলেছিল বহু বিচিত্র কারুসম্ভার।

আমার পূর্বসূরীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর অসামান্য কারুদক্ষতায় অভিভূত হয়েছেন। তাঁর চিত্র-বিচারে তাঁরা তেমন মুখর হন নি। আমার মনে হয় চিত্রী রথী ঠাকুর কারুকুশলী রথীবাবুর চেয়ে মহত্তর ও উজ্জ্বলতর। এ পর্যন্ত তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে যে গোটা চার-পাঁচ বড়ো মাপের প্রদর্শনী হয়েছে তাতে কারুকৃতি নিদর্শনের সংখ্যা ছিল কমবেশি দেড়শো, যেখানে চিত্রকর্ম প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ পঞ্চাশোর্ধ্ব। রূপবৈচিত্র্য, উপাদান ও আঙ্গিকগত মুন্সিয়ানা, গৃহ-সজ্জায় সম্ভাব্য সমস্ত সরঞ্জাম-আসবাবের সম্ভার নিয়ে তিনমাত্রার আকার-আয়তন সর্বাগ্রেই দর্শকের মন কেড়ে নিয়েছে। আমাদের আটপৌরে জীবনে এমন দ্বিতীয় আর কোনো শিল্পীর আবির্ভাব তো দেখা যায় নি— বলা চলে অভূতপূর্ব। কিন্তু দিগ্‌বিজয়ী চিত্রীর তো অভাব ছিল না। তুলনামূলকভাবে, ফুল ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেই প্রধানত তাঁর ছবির বিষয়-বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ থেকেছে। হয়তো গাণিতিক ও বৈচিত্র্যগত স্বল্পতা এবং ইতিমধ্যেই দেশে চিত্র নিয়ে অতি চেনাজানা রথীন্দ্রনাথের ছবির প্রতি স্বচ্ছদৃষ্টিকে আবিল করেছে, মেদুর করেছে।

বাগান নিয়ে রথীন্দ্রনাথের শখ ও নেশা অভিজাত বাবুবর্গীয়দের থেকে একেবারে ভিন্নতর ছিল। রসিক ও বিজ্ঞানীর এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। স্বদেশ-বিদেশ, জংলি-পাহাড়ি শৌখিন, বুনো এবং পোশাকি নিত্য নতুন ফুলগাছের পারম্পরিক সম্মিলন

(hybrid) নিয়ে সারাজীবন ধরেই তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সন্তানস্নেহে তাদের লালন করেছেন। তাদের নিত্যনূতন অভিব্যক্তি তাঁকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, মাতিয়েছে। এরা তাঁর হৃদয় জুড়ে বসেছিল। এদের রূপছন্দ নানা আবেগ নিয়ে তাঁকে যেন হাতছানি দিত, যেন কথা-বিনিময় করত। এই দুষ্টু, মিষ্টি ফুলের দল আর কাউকে তাঁর ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিল না। গুটি গুটি এসে তারা একের পর এক তাঁর চিত্রপট জুড়ে বসল! ফুলের প্রতি রথীন্দ্রনাথের অপার মমত্ববোধ ও বাৎসল্য সোহাগ-জড়ানো তুলিকা-বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছে এবং বর্ণগুণ অনাবিল চিত্র-প্রাণনার সঞ্চার ঘটিয়েছে। তাঁর পুষ্পচিত্রাবলী তাঁর সমকালীন এবং সান্নিধ্যের সমস্ত শিল্পীদের থেকে রুচিমেজাজে একেবারে ভিন্নতর। বিদেশী-ঘরানায় ভ্যানগগের আকুতি, সেজাঁর বুদ্ধিমার্গিতা, মাতিসের 'শুদ্ধ' বর্ণবিভঙ্গ কিংবা তাঁর অন্তরঙ্গ শিল্পীদের কোমল-কঠিন রূপবন্ধ তাঁর মধ্যে নেই ঠিক, কিন্তু তারা যেন ভাষা-ভাব-ছন্দ নিয়ে টনটন করছে, আত্মীয়তার কবোষ্ণ আখর! তাই স্টেলা ক্রামরিশের মতো সংবেদন-শীল মন ও জহুরির দৃষ্টি একটি মাত্র কথায় তাঁর এই শ্রেণীর চিত্রের পরিচয়কে অবারিত করে দিয়েছে: '...he paints the portraits of many flowers.'

শুধু ছবির খাতিরে আকার-গঠনের পারিপাট্য, ছন্দ-বৈচিত্র্য, বর্ণমনোহারিত্ব, পেলবতা-কোমলতা কিংবা নামী-প্রজাতির প্রতি রথীন্দ্রনাথের রোমান্টিক দুর্বলতা ছিল না। ফুল ফুলই। তাই গোলাপ, লিলি, ম্যাগ্‌নোলিয়া, প্যাসন ফ্লাওয়ার যেমন চিত্রিত হয়েছে তেমনি কল্কেফুল, নয়নতারা, শিমুল, পলাশ, জংলি ও পাহাড়ি হরেকরকম ফুলের পাশাপাশি ডালিয়া, জিনিয়া, হলিহক, কাঞ্চন, কলাবতী সমান অনুরাগ নিয়েই চিত্রিত করেছেন। স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবির বিরতিকালে রঙ্‌দার নকশারও (sketch) সাক্ষাৎ মেলে। উপাদানের ব্যবহারও

ফুল
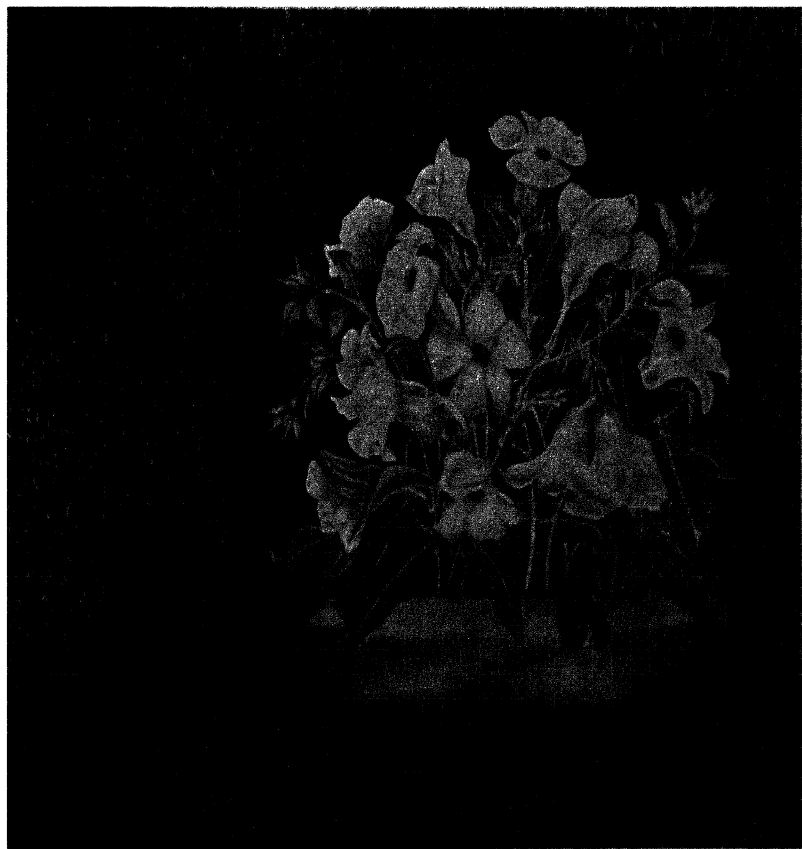
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

বিচিত্র। সাধারণ নিউজপ্রিন্ট যেমন দুর্লভ নয়, তেমনি কেন্ট, কার্ট্রিজ, হোয়াটম্যানও বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। মোটা জাপানি বোর্ড কিংবা অ্যাস্‌বেস্‌টস ক্ষেত্র তাঁর স্বচ্ছন্দ, সাবলীল পরীক্ষণের কাজে কোথাও বাধা হয়ে দেখা দেয় নি।

ক্ষেত্রবিন্যাস ও সজ্জীকরণে তাঁর চিত্রভাবনা ছিল সরাসরি, জটিলতা-বর্জিত এবং বস্তুসংক্ষেপ নিয়ে আশ্চর্যভাবে পরিমিত। অধিকাংশ রচনাই উপর-নীচে আয়তাকার। চারকোনা ও পাশঘেঁষা ক্ষেত্রভূমির সংখ্যাও একাধিক। আয়তনের দিক থেকে পোস্টকার্ডের মাপ (৭.৫ × ৫.৫ সে. মি.) থেকে বৃহদাকার (৬৭.৩ × ৫১.০ সে.মি.) ক্ষেত্রে তিনি অবলীলাক্রমে বিচরণ করেছেন।

বিশেষ করে ফুল-আশ্রয়ী ছবির ক্ষেত্রে তিনি একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। কখনো জলরঙ, কখনো টেম্পেরা, কখনো প্যাস্টেল, কখনো বা মিশ্রিত আঙ্গিক। মাধ্যমের এই স্বচ্ছন্দবিহার যেমন তাঁর ছবিকে অন্যতর এক বৈভব দিয়েছে তেমনি স্বচ্ছ ও ভারী রঙের বৈপরীত্যে উচ্ছল তাঁর অধিকংশ ছবি সাক্ষ্য দেয় যে স্বশিক্ষিত চিত্রী সৃজনকর্মে ছিলেন একেবারেই মুক্তমনা। স্বদেশ-বিদেশের কোনো পরম্পরা বা তাঁর নিকট-সান্নিধ্যের যুগন্ধর শিল্পীগোষ্ঠী কারো প্রভাবই তাঁকে স্পর্শ করে নি। নিজের অন্তর্লীন উপলব্ধি, আইডেন্‌টিটি ও ইমেজই তাঁর চিত্রসৃষ্টির নিঃসংশয় প্রেরণা থেকেছে।

রথীন্দ্রনাথের বর্ণপরিকল্পনায় সাম্প্রতিকতার যে গুণ ও মেজাজ যোজিত হয়েছে তা সহজেই তাঁর ছবিকে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিসীমার বাইরে নিয়ে গেছে— তাতে প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষ আন্তর্জাতি-কতার রূপ-রস। আরো সহজ করে বললে এই বোঝায় যে ভারতীয়-অভারতীয় সকলের কাছের তাঁর চিত্রভাষা সহজবোধ্য ও সহজগম্য। কারণ বর্ণ এখানে শুধু আবেগের বাহন নয়, তা নির্মাণ-ধর্মী ও আকারব্যঞ্জক। রঙের মোহ বা যাদুকরী বিদগ্ধ রসিককে

আপ্লুত করে কিন্তু রূপচ্ছটার আবেদন সার্বজনীন। তাই বর্ণকে যখন আকারানুগ করে তোলা হয় তখন মানুষের স্বভাবজ প্রবণতার সঙ্গে তার সাযুজ্য স্থাপিত হয়। কাজেই চিত্রভাষার দুর্বোধ্যতা কমে আসে। এখানেই রথীন্দ্রচিত্রের সর্বজনীনতা।

রথীবাবুর ছবিতে আর-একটা দুর্লভ গুণ ইমেজ ও ইমেজের বাইরে যে ক্ষেত্র তাদের পরস্পরনির্ভর নাটকীয় বুনোট্। ছবিকে তিনি নানান ছন্দেগাঁথা প্যাটার্ন বা ডিজাইন হিসাবেই দেখেছেন। তাই ফুলের পরিচয়-ধন্য, অভ্রান্ত আকার ও বিভাবকে পশ্চাৎপটে নানান আকার ও মাপের বিন্দু কিংবা স্ট্রোক দিয়ে একটা গভীর অথচ সঞ্চরণশীল একটা বর্ণদ্যুতি, ছন্দ-চেতনা ও প্রাণনার অভিব্যক্তি তৈরি করেছেন— যেন রূপ ও অরূপের সংঘাতে এক অনবদ্য চিত্রানুভূতি ; জানা-অজানা, চেনা-অচেনার অভিঘাতে একটা মূর্তামূর্ত কল্পময়তা। আবেগ ও স্পর্শগুণের এমন সম্মিলন, রূপাকার ও টেক্সচারের এমন নিশ্ছিদ্র বুনোট্ খুব বেশি শিল্পীদের মধ্যে আমরা পাই নি। ইংরেজিতে একটি কথা আছে : 'an identity for pictorial excellence'। রথীন্দ্রনাথের চিত্রমাহাত্ম্য এখানেই।

গভীর, ঘনীভূত, অসমতল ও চঞ্চল পটভূমির বৈপরীত্যে উজ্জ্বল, নির্মাণানুগ ইমেজের প্রবর্তনা ছিল রথীবাবুর পছন্দসই প্রক্রিয়া। নাটকীয় হেরফের কোথাও বা হয়েছে। তবে তা কখনোই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে নি। ভারমিলিয়ান, গোলাপী, গাঢ় নীল, হলুদ, সবুজ, খয়েরি, সাদা ও কালো— এই ছিল তাঁর বহুলব্যবহৃত রঙ। ক্রামরিশ যে বলেছেন তিনি ফুলের প্রতিকৃতি চিত্রণ করেছেন তার অর্থই হল বিজ্ঞানী ও বিশ্লেষণধর্মী মন নিয়ে প্রত্যেকটি ফুলের স্বভাব ও বিশেষত্ব অর্থাৎ নাড়ী-নক্ষত্র তিনি চিনে নিয়েছিলেন। ক্রামরিশের কথাতেও কিন্তু রথীন্দ্রনাথের চিত্রগুণ সম্পূর্ণত ধরা পড়ছে না। কেন বলছি। বিন্দু বা তুলির আঁচড়ে গড়ে-তোলা নানান বর্ণবিচ্ছুরণের গতিছন্দকে

বেমালুম বেপাত্তা করে দিয়ে প্রায় সমতল পটভূমির উপর তাঁর ফুলের জগৎকে যদি সংস্থাপন করে কল্পনা করা যায়, দেখা যাবে নিমেষেই তারা ম্লান-মেদুর হয়ে গেছে, চিত্রগুণও প্রায় উধাও। এখানেই তাঁর চিত্রীসত্তার মৌলিকত্ব, ক্রামরিশের কথার সঙ্গে এটুকু সংযোজন না করলে তাঁর ছবির চিত্রগুণ অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে। 'ফুলের ছবিতেই ওর বিশেষত্ব'— রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য ছোট্ট কিন্তু সমীচীন ও সম্পূর্ণ।

তুলনাগতভাবে দৃশ্যচিত্রের ক্ষেত্রে রথীন্দ্রনাথ তেমন তৎপর বা তন্নিষ্ঠ ছিলেন না বলেই মনে হয়। দেহমন উজাড় করা আকুতি সেখানে কম। প্রকৃতির মোহ ও মহিমায় পুলকিত বোধ করেছেন ঠিকই কিন্তু ভাসমান মেঘরাজির মতো তারা স্মৃতির রেশ রেখে গেছে মাত্র। তাই দার্জিলিং পাহাড়ের সূর্যাস্ত (০০'১২৮৩০১৮), কালিম্পঙ -এর চাঁদিনীরাত (০০'১৩১৮'১৮), বর্ষাভোরের শান্তিনিকেতন (০০'১৩১৪'১৮), পাবনা-শিলাইদহের (?) নদী-নৌকা-নাইয়া বা উত্তরায়ণশীর্ষ থেকে উত্তরায়ণ কুঞ্জের দৃশ্যবৈচিত্র্য (০০'১৬৫১'১৮) কিংবা পাহাড়ের নানান রূপ তাঁর শিল্পীসত্তাকে মুগ্ধ করলেও নির্বিশেষে আপ্লুত করেছে বলে দাবি করা যায় না। তাঁর পুষ্পচিত্রের ডালিকে অন্তরালে রেখে কেউ যদি দৃশ্যচিত্রগুলিকেই তুলে ধরেন তা হলে চিত্রীদের জাজিমে তিনি স্থান পেতেন কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলে মনে করি।

কাগজ, বোর্ড, কালিতুলি, বিরলবর্ণ-বহুবর্ণ, জলরঙ, ধোয়াট রঙ, ওজনদার অস্বচ্ছ রঙ, মিশ্রিত রঙ, নানান আয়তনের ক্ষেত্র এবং বস্তু-পুঞ্জ ও পটভূমি দুয়ে মিলে স্থির-অস্থির সুসমঞ্জসতা এরকম সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই দৃশ্যচিত্রে উপস্থিত। তবে মাত্রায়, গভীরতায় ও সৃজন-প্রাণতায় এরা তাঁর পুষ্পচিত্রের পাশে ভিটামিন বড়ির মতোই স্বাদ-সুবাস-বর্জিত বলে প্রতীয়মান হবে।

অধিকাংশ ছবিতেই রথী, রথীন্দ্র বা রথীন্দ্রনাথ নামে নামাঙ্কন আছে। শেষের দিকে অবশ্য চিত্রপটে নামাঙ্কনের স্থান নির্বাচন নিয়ে দূরপ্রাচ্যের শিল্পীদের মতো বিচার-বিবেচনা করেছেন অর্থাৎ স্পেস সম্বন্ধে ধারণার একটা সামগ্রিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন তাঁর চিত্রভাবনাকে প্রভাবিত করেছে এ কথা নিশ্চিত করেই বলা চলে। জাপানি ভাষায় (চীনা ভাষায় ?) নামাঙ্কিত সিলের ব্যবহারও আমরা দেখতে পাই। এগুলি অবশ্য ফুলের চিত্র। ছবির পিছন দিকে জাপানি (অথবা চীনা ?) ভাষায় কিছু লেখা বা কবিতা আছে। পাঠোদ্ধার হলে হয়তো কিছু নতুন তথ্যের উদ্‌ঘাটন হতে পারে।

রথীবাবুর ছবিতে মানুষের গতায়াত বড়ো কম। তবে মুখোশ-ধর্মী একটি মুখাকৃতি (২৪'১ × ২৭'৩ সে. মি.) একেবারেই ভিন্ন জাতের, ভিন্ন স্বাদের। অবনীন্দ্রনাথের মুখোশ বা যাত্রার নটনটীর চিত্রের মতো সংবেদন বা মুন্সিয়ানা নেই, তবে সংক্ষিপ্ততা ও পরিমিতিবোধ নিঃসংশয়ে তুলনীয়। ছবির চেয়ে রঙিন ড্রইং বলাই বোধ হয় সমীচীন। তিব্বতি-মোঙ্গল ধরনের এক কিশোরী একেবারে সরাসরি দৃষ্টি নিয়ে যেন দর্শকের সামনাসামনি উপস্থিত। জাপানি বোর্ডের স্বাভাবিক রঙ রেখে রেখাসীমা দিয়ে আঁকা একটি মুখ প্রায় কাট-আউট সিল্যুটের মতো ভাস্বর। নাক ও চোখের গড়ন চীন-জাপান-কোরীয়দের তুলনায় নতোন্নত ও বৃহদাকার। ওষ্ঠাধর বলিষ্ঠ, কপোলমধ্য বড়ো মাপের সিঁদুরের টিপে জ্বলজ্বল করছে, কেশদাম বেণী-বিনিন্দিত। তিব্বতি নেপালি বৈশিষ্ট্যটি শুধু বাঁধা পড়ে নি, প্রাণস্পন্দনে অধীর। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে মোট ছবির সংখ্যা বাহান্ন।

নির্মাণ ও নৈপুণ্যের এক ভিন্ন মেরুতে বিরাজ করছেন কারুশিল্পী রথীন্দ্রনাথ। ভারতীয় শিল্পের ইমারতীগুণ, নিঃসংশয় রূপাকার, ফর্ম ও টেক্সচারের স্পর্শধর্মিতা এবং অতিবিরল করণদক্ষতা ও অভিনবত্ব

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে তাঁকে অনন্য এক স্থান দিয়েছে। চিত্রে যেমন স্বদেশ-বিদেশের সীমাকে তিনি লঙ্ঘন করেছেন, কারুচর্চায় তেমনি তিনি পরম্পরা-অতীতকে বর্তমানের কাছে অর্থময়, যুক্তিগ্রাহ্য ও কাঙ্ক্ষিত করে তুলেছেন। কিন্তু অতিসচেতন জাতীয়তাবোধ বা পুনরুদ্ধারব্রতী দেশপ্রেমের দ্বারা তাড়িত হন নি। ভারতীয় কারু-মনীষার যে স্পন্দন আমাদের ধমনীতে আজও প্রবাহিত হচ্ছে রথীন্দ্রনাথ তা কান পেতে শুনেছেন। তাই প্রাচীনত্বের জড়তা থেকে কারুমানসটিকে মুক্তি দিয়েছেন, তার আধুনিক যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং শিক্ষিত, কর্মবিমুখ নগরমুখী মানুষের কাছে কারুচর্চার মর্যাদাময় স্থানটি চিহ্নিত করেছেন।

তাঁর কারুকর্মকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি দ্বিমাত্রিক, অন্যটি ত্রিমাত্রা-নির্ভর। উভয় মাত্রায় মিশ্রিত কাজের নমুনাও দুর্লভ নয়। চামড়ার কাজ বিশেষ করে তাঁর দ্বিমাত্রিক সৃষ্টির প্রায় সবখানি জুড়ে আছে। ত্রিমাত্রার বাহন হয়েছে হাজারো জাতের কাঠ। আকৃতি, উচ্চতা, আয়তন নিয়ে কাঠের কাজে বিচিত্রতার বোধ হয় শেষ নেই।

এদের সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত আলোচনার আগে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কারুকর্মের ভূমিকা মানুষের জীবনে বড়ো অন্তরঙ্গ। আবাস, বেশভূষা, পাত্র-তৈজস আমাদের গৃহ-পরিবেশে আনে সৌষ্ঠব, সৌন্দর্যরুচি ও শোভনতা। ব্যক্তিক জীবনের সংস্কৃতি-চেতনা, মন-মেজাজ-অভিরুচির দর্পণ হল ব্যক্তির কারু-চেতনা। কারুকলা তাই সভ্যতা, সংস্কৃতির সব স্তরেই নিবিড়ভাবে কাঙ্ক্ষিত—আমাদের প্রত্যহের গ্লানি থেকে সে মুক্তি দেয়।

তাঁর কারু-দুনিয়াটা যখের ধনের গুহাভ্যন্তরের মতো। ওখানে প্রবেশ না করলে গোটা রথীন্দ্র-ব্যক্তিত্বকে আমরা আবিষ্কার করতে পারব না। কারুকর্ম নিয়ে আজীবন নিবিষ্টতা ও নিরন্তর পরীক্ষণ

এবং রূপাকৃতির বিচিত্র বৈভব লক্ষ্য করে আমরা সহজ সিদ্ধান্ত করে নিই রথীন্দ্রনাথ সত্যিই শৌখিন অভিজাত ছিলেন, ধৈর্য ও নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম, হয়তো বা অলস অবসরও নিতান্ত কম ছিল না।

নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে বোঝা যায় আত্যন্তিক একটি কারু-মানস ও মননের অধিকারী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। তাঁর ধমনীতে ছিল তার নিত্যচলিষ্ণু প্রবাহ— তিনি ছিলেন সত্যিকারের কারু-সত্ত একটি ব্যক্তিত্ব। জীবন থেকে পলায়নপর হয়ে কারুকর্মে তাঁর আত্মনিবিষ্ট নয় কারুসৃষ্টির মধ্য দিয়েই জীবনকে চেনা, জানা, উপভোগ ও উপলব্ধি। কাজেই কারু-বিলাসী বলে তাঁর কথা শেষ করা যায় না।

রথীবাবুর কারুকর্মের বিচিত্রতা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রূপমূর্তি পেয়েছে। তা হল রুচি-নিষ্ঠ গৃহসজ্জায় নিত্যব্যবহারে যা-কিছু লাগে তার মনোজ্ঞ রূপ ও আকার নিয়ে তিনি নিয়ত সৃষ্টিশীল ছিলেন। স্বদেশ-বিদেশ যেখানে যা-কিছু অভিনব বলে মনে হয়েছে, তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তা তিনি সযত্নে সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে প্রেরণা নিয়েছেন এবং হাতেকলমে শিক্ষানবিশী করেছেন। ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মতো বিচিত্র বর্ণ ও টেক্সচারের কাঠের সন্ধানে সর্বত্র ফিরেছেন। তার পর অতিসূক্ষ্ম-সুনিপুণ হাতে খোদাই করে সরল জ্যামিতিক রূপাকার থেকে শুরু করে নাতিসরল স্থাপত্যানুগ বস্তুসম্ভার সৃষ্টি করেছেন। আয়তাকার, চতুষ্কোণ, ছয়কোনা, আটকোনা নির্মাণের সঙ্গে ডিম্বাকার, গোলাকার এবং বিচিত্র আকার ও মাপের দেড়শতাধিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সচঞ্চল নির্লীন কারুসত্তা দর্শককে অভিভূত, বিস্মিত ও বিমোহিত করে। যত আপাতসাধারণ সাদামাটা কারুকৃতিই হোক অপক্ষপাত জননীস্নেহে তাদেরও সাজিয়েছেন, মণ্ডিত করেছেন, নয়নাভিরাম সৌষ্ঠব দিয়েছেন। মণ্ডনের সহজ প্রক্রিয়া ছিল গাঢ় রঙের 'ইন্‌লে'র মধ্য দিয়ে দৃশ্যগত বর্ণবৈপরীত্যজাত এক ধরনের আবেগ সৃষ্টি করা।

‘ইন্‌লের’ মোটিফ সহজ সাধারণ জ্যামিতিক নকশা থেকে শুরু করে পশু-পাখি মনুষ্য-অবয়ব, নিসর্গদৃশ্য, রবীন্দ্রনাথের ছবির ও প্রতিকৃতির অনুকৃতি কিংবা মাতৃক্রোড়ধন্য শিশু এই বিচিত্র বলয়ে সঞ্চরমান ছিল। ‘ইন্‌লে’ কখনো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে অর্থাৎ পাত্রাধারের রূপকল্পনা সেখানে প্রধান; কোথাও আবার চিত্রানুগ গুণ নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ‘ইন্‌লে’ করা ছবির মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বিরুদ্ধ বর্ণের কাঠ, হাতির দাঁত, রুপো, পিতল দিয়ে করা ইন্‌লের নকশা অদ্ভুত এক দৃশ্যগত উত্তেজনা তৈরি করে।

কোথাও আবার গালার প্রলেপ এবং ইন্‌লের নকশা ও টেক্সচারের অভিনব সম্মিলন অন্যতর এক অভিব্যক্তি দেয়। নানান বেশে রথীন্দ্রনাথের উদ্‌ভাবনীসত্তা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই-সমস্ত কাঠের কাজে। কোথাও বা অল্প খোদাই করা রিলিফের কাজ পাত্রের গাত্রদেশকে অলংকৃত করে ভিন্নতর স্বাদের সৃষ্টি করেছে। তবে এ-সব বিশিষ্টতা সত্ত্বেও রথীবাবুর কাঠের কাজের অভাবনীয়তা এই যে, ইন্‌লে-করা নকশার মান-পরিমাণ, স্থান নির্বাচন, কৌণিক, বা বঙ্কিম সংস্থাপনা সব মিলে সুমিত ও সুসমঞ্জস— সম্পূর্ণভাবে আতিশয্য ও আধিক্য-দোষবর্জিত। রসিকরা জানেন কী সুদুর্লভ এই একটি গুণ। সেজন্যই বোধ হয় বর্ণবৈপরীত্যের ক্ষেত্রে কাঠের স্বাভাবিক রঙ ও টেক্সচারের প্রতিই রথীবাবুর নিরঙ্কুশ পক্ষপাত ছিল— কৃত্রিম বর্ণলেপনকে তিনি সর্বথা পরিহার করেছেন।

নানান আকার-আয়তনের বাক্স, গহনার বাক্স, সিগারেট কেস, পাউডার কৌটো, দোয়াতদান, বাতিদান, ফুলদানি, কলমদানি, লবণদানি, পেপারওয়েট ইত্যাদি দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এ-সব তো নিতান্ত মামুলি— কী আর এমন অভিনব! কিন্তু যখন দেখি দেরাজ-দেওয়া আলমারি, বই রাখার তাক, যন্ত্রপাতি রাখার তাক, পাঁউরুটি রাখার তাক, দাবা খেলার বোর্ড আর হাতির দাঁতের তৈরি ঘুঁটি,

নানান ছাঁদের বারকোশ বা খাবার টেবিল— তখনই স্পষ্ট হয় যে টুক্‌রো-টাক্‌রা জিনিস নয়, একটি আধুনিক গৃহসজ্জায় খুঁটিনাটি, যা-কিছুই লাগুক-না কেন সেই সামগ্রিক সম্ভারের একটা আদর্শ তৈরি করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শ। মনে রাখা দরকার যে, সমস্ত উত্তরায়ণে গৃহসজ্জার উপকরণের যে রূপ ও পরিকল্পনা তা রথীন্দ্র-নাথের একক অবদান বললে অত্যুক্তি হবে না। অনেকগুলি কাজে 'রথী', 'রথীন্দ্র' বা 'R. T.' এই নামাঙ্কন আছে। ৭.৩ × ৪.৮ × ১০ সে. মি. মাপের ক্ষুদ্রায়ত কাজ যেমন একাধিক তেমনি ৭৫.৮ × ৪৩.৮ সে. মি. আয়তনের বৃহদাকার কাজও দুর্লভ নয়। তবে, বেশিরভাগ কাজকেই বড়ো মাপের হাতের চেটোর মধ্যে ভরে ফেলা যায়। অর্থাৎ উচ্চতাতেও গড়ে ১০/১২ সেন্টিমিটারের মধ্যে। রথীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাজের যে প্রদর্শনী হয়েছে তাতে এমন কতকগুলি বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায় যা রবীন্দ্রভবন অথবা কলাভবন সংগ্রহে নেই বলেই মনে হয়, হয়তো ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর শতবর্ষে এগুলি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে আনার উদ্যোগ আয়োজন করা দরকার।

চামড়ার কাজের নিদর্শন সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে মাত্র দুটি। বিভিন্ন প্রদর্শনী-পুস্তিকাতে কিন্তু গুটিদশেক নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তবে তা দিয়ে চামড়ার কাজে তাঁর কৃতিত্ব ও অবদান সঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে চামড়ার ত্বকে বাটিক, টুলিং ও পোকার অথবা মিশ্র পদ্ধতিতে অনুসৃত কারুকর্মের অবতারণা এ দেশে তিনিই করেছিলেন। উপাদান ও বৈভবের ক্ষেত্রে এই যে নতুন একটি মাত্রা সংযোজন, তার ফল কত সুদূরপ্রসারী হয়েছে তা আমরা চামড়ার কাজের ভারত-জোড়া ব্যবহার ও বিপণন থেকেই অনুমান করতে পারি।

১৯২৮ সালে চিকিৎসার জন্য বিদেশি-নার্সিংহোমে থাকাকালীন

তিনি চামড়ার কাজের আঙ্গিক ও আবেদনে মুগ্ধ হন, তাতে শিক্ষানবিশী করেন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এবং দেশে ফেরার সময় সবরকম যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে আসেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে গুটি-কয়েক ছাত্রী নিয়ে একটা প্রাইভেট ক্লাসও খুলে ফেলেন। তারই ফল হল, কলাভবন ও শ্রীনিকেতনে একটি অতি প্রতিশ্রুতিময়, পরীক্ষণধর্মী, সৃজনাত্মক উপাদানের সার্থক প্রবর্তনা, ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে বহুল প্রসার এবং একটি সক্রিয় কারুরুচির ধীর অথচ নিশ্চিত বিস্তার। আজ শিল্পানুগ এই চর্মশিল্প বিদেশি মুদ্রা অর্জনে একজন 'ছোটতরফ' বললে অত্যুক্তি হবে না।

চামড়ার কাজের মধ্যে বইয়ের মলাট, অ্যালবাম্-কভার, চিঠি রাখার থলি, পৃষ্ঠা-নিশানা, রাইটিং প্যাড-কভার এ-সমস্ত টুকিটাকি যেমন আছে, তেমনি মুখোশ জাতীয় মুখাবয়ব, এবং রবীন্দ্র-কৃত রঙিন চিত্রের প্রতিলিপি, কখনো একক ক্ষেত্রে কখনো স্ক্রোল হিসাবে তাদের পাতন দেখতে পাই অর্থাৎ একটা শৈল্পিক অনুষঙ্গ ও বিভাব তাঁর কারুচেতনার মধ্যে নিলীন ছিল, তার পরিচয় আমরা সর্বত্রই পাই।

তবে একটা কথা খুব জরুরি যে, রথীন্দ্রনাথের প্রদর্শনী দেখে তাঁর বিচার একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন মন্দিরের দেবীমূর্তি, কিংবা কোনারকের সুরসুন্দরী বা মেক্সিকোর একটা রিলিফ কাজ ম্যুজিয়মের প্রকোষ্ঠে এনে দেখলে তাদের উপর অবিচার করা হয়—তাদের অভিব্যক্তি ব্যাহত হয়, তেমনি উত্তরায়ণ বাড়ির প্রতি প্রকোষ্ঠে যথাস্থানে উদ্দিষ্ট কারুকর্মটিকে সংস্থাপন করে যদি না দেখা যায় তা হলে তাঁর কারুচিন্তনের ব্যাপকতা, গভীরতা ও যাথার্থ্যের সন্ধান পাব না। সে ক্ষেত্রে তাঁর কারুকৃতি তার নিজের ক্ষেত্র হারিয়ে একটা ফ্যাশান-সর্বস্ব কারুবিলাস বলে প্রতীয়মান হবে, যা সত্যিই সমীচীন নয়।

রথীন্দ্রনাথের উত্তরায়ণ পরিকল্পনা ঘিরে তাঁর স্থাপত্য অনুরাগ, তাঁর ভিন্নরুচির উদ্যানবিলাস এবং বিদেশ থেকে ফিরে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা সভার পরিচালন-ব্যবস্থা এরকম অনেক ছোটো-বড়ো ক্ষেত্রের মধ্যেও তাঁর একটি সম্পূর্ণায়ত শিল্পীসত্তার পরিচয় লুকিয়ে আছে।

তবে তাঁর এই নিরন্তর কর্মধারায় আরো দুটি ব্যক্তিত্ব আরো সঙ্গোপনে তাঁর নিত্যসঙ্গী থেকে তাঁর শিল্পভাবনাকে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন— সহধর্মিণী প্রতিমা দেবী ও সহযোগী সুরেন্দ্রনাথ কর।

জনৈক নিভৃতচারী বিজ্ঞানী

শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

এ পর্যন্ত খুব কমসংখ্যক আত্মজীবনী লেখকই বোধ হয় লেখার কৈফিয়ত দিয়েছেন এই বলে যে, রচনাটি হয়তো তাঁর পিতার জীবন সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকের কাজে লাগবে। বস্তুত তাঁর আত্মজীবনীর বাংলা সংস্করণটির নামও দেওয়া হয়েছে 'পিতৃস্মৃতি'। সেই বইয়ের একেবারে গোড়ার দিকেই রথীন্দ্রনাথ বলছেন, "বাড়ির মধ্যে আমারই রঙ কালো, চেহারায় বুদ্ধির পরিচয় ছিল না, স্বভাব অত্যন্ত কুনো, শরীর দুর্বল। মনস্তত্ত্বে যাকে বলে হীনমন্যতা তা যেন ছেলেবেলা থেকে আমার মধ্যে থেকে গিয়েছিল। বড় হয়েও তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি বলতে পারি না।" হয়তো এই-সব কারণেই রথীন্দ্রনাথ ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন একজন নিভৃতচারী মানুষ, ইংরেজিতে যাকে বলে 'আ প্রাইভেট পার্সন'।

পিতার প্রতি তাঁর আনুগত্য কিন্তু শুধু তাঁর আত্মজীবনীর ভূমিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মোটামুটিভাবে তাঁর গোটা জীবনটাই গড়ে উঠেছিল পিতার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কাজকর্মকে ঘিরে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রথম ছাত্র। এমন-কি, তারও আগে শিলাইদহে তাঁর এবং মাধুরীলতার শিক্ষার কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা শেষ করে কবির পুত্র যে কৃষি-বিজ্ঞান শিখতে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন, তার মধ্যেও ছিল আধুনিক কৃষিব্যবস্থার মারফত এদেশের পল্লীঅঞ্চলের পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা। ফিরে এসে রথীন্দ্রনাথ কালক্রমে

সাধারণভাবে বিশ্বভারতী আর বিশেষভাবে শ্রীনিকেতনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সেই-সব কাজের ইতিহাস স্বতন্ত্র এবং *পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবি রাখে। আমরা এখানে তার মধ্যে যাব না।* আমরা বরং সেই নিভৃত মানুষটির জীবনের এমন-কিছু অংশের কথা বলব যেখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তার মানে এই নয় যে, বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর কাজকর্ম জীবনের অন্য অঙ্গগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অন্য অনেকের মতোই রথীন্দ্রনাথকেও বুঝতে হলে মোটামুটিভাবে নানাধরনের আগ্রহ এবং গুণাবলীসম্পন্ন একজন সমগ্র মানুষ হিসেবেই বুঝতে হবে। নিজেকে তিনি যতই কুনো বলুন, যতই তাঁর মনে হীনমন্যতা থেকে থাকুক-না কেন, মানুষ হিসেবে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোটেই সাধারণ ছিলেন না। ইরেজি ভাষায় তাঁর দখল সম্বন্ধে লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট বলেছেন, “এই বিষয়ে আমার সংশয় নেই যে, চর্চা করলে ইংরেজিতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল।” *On the Edges of Time* যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে একমত হবেন। ‘পিতৃস্মৃতি’র সবটা না হলেও অনেকটাই রথীন্দ্রনাথের নিজের লেখা। এই বইখানি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে লেখকের একটি নিজস্ব মন ছিল। সেই মনই প্রতিফলিত হয়েছে বইয়ের ভাষায়, রচনাশৈলীতে, বলবার ভঙ্গিতে। এখানে আমরা অনেক খবর পাই যা রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাতেও ঠিক সেইভাবে পাই না। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যের বিপুল ঐশ্বর্যও লেখককে অভিভূত করতে পারে নি। খুব স্বচ্ছ সহজ গদ্যে তিনি নিজের মতো করে বলে গেছেন বাংলাদেশের অত্যন্ত গৌরবময় একটি যুগের কথা, নিজের পিতার আশপাশের বুধমণ্ডলীর কথা, আবার একই সঙ্গে বাড়ির মানুষ আর পরিজনদের সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক এবং খুঁটিনাটি গল্পসল্প। এই বইয়ের লেখকের

মধ্যে দেখবার এবং সহজভাবে বর্ণনা করবার যে ক্ষমতা ছিল, সেটাকে বৈজ্ঞানিকসুলভ বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। আশপাশের জগৎটাকে বিশেষ করে তিনি দেখতে বুঝতে এবং বর্ণনা করতেই চেয়েছেন। সেই দেখা বোঝা এবং বর্ণনা করার মধ্যে নিজেকে অভিক্ষেপ (project) করতে চান নি। এই যে সহজ কৌতূহল নিয়ে নিরপেক্ষভাবে দেখা এবং সরস মিতভাষণের চালে বর্ণনা করা, যে-কোনো দেশের সাহিত্যেই এ জিনিস খুব সুলভ নয়। আমাদের সাহিত্যেও এই-সব গুণ হামেশা দেখা যায় না। 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্' শুনতে সহজ, কিন্তু কার্যত কঠিন। একহিসেবে এটাই তো বিজ্ঞানের একেবারে গোড়ার কথা। রথীন্দ্রনাথের পক্ষে ব্যাপারটা বোধ হয় স্বভাবগত হয়ে গিয়েছিল। অনেক বিতর্কিত ঘটনার কথা বলতে গিয়েও তিনি একটা সহজ নির্লিপ্ত ভঙ্গি বজায় রাখতে পারতেন। 'পিতৃস্মৃতি'রই শেষের দিকে বর্ণিত মুসোলিনির ইতালিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বেনেদেত্তো ক্রোচের সাক্ষাৎকার সেইরকম একটি ঘটনা। বিজ্ঞানের শিক্ষাও হয়তো এই ধরনের বিষয়মুখ (objective) মনোভঙ্গি অর্জনে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

রথীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চার বিষয়ে খুব বেশি উপাদান অবশ্য তাঁর স্মৃতিচারণধর্মী বই দুটিতে পাওয়া যায় না। নিজের সম্বন্ধে এমনিতেই তিনি নিরুচ্চার। নিজের পড়াশোনা কিংবা কাজকর্মের বিশদ বিবরণ আত্মজীবনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করবেন, তেমন মানুষ তিনি ছিলেন না। সুতরাং খবরাখবরের জন্যে চিঠিপত্রের উপরেই নির্ভর করতে হয়। এবারে পিতাকে লেখা যুবক রথীন্দ্রনাথের এইরকম একটি চিঠিতে চলে আসা যাক। চিঠিখানি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রাবস্থায় লেখা, বিষয়বস্তু প্রায় আগাগোড়া বৈজ্ঞানিক। রথীন্দ্রনাথ সেই সময়ে মৃত্তিকাবিজ্ঞান নিয়ে খুব সোৎসাহে কাজ করছিলেন। সেই উৎসাহের ছাপ চিঠির সর্বাঙ্গে। মা-মরা ছেলে রথীন্দ্রনাথ

আঠারো বছর বয়সে আমেরিকা যান, ফেরেন একুশ বছর বয়সে। ওদেশে বসে চাষের জমির মাটি নিয়ে কী ধরনের পরীক্ষা তিনি করছেন, অধ্যাপকের সঙ্গে সে বিষয়ে কিরকম কথাবার্তা হচ্ছে, দেশ থেকে কেউ মাটির নমুনা বিশ্লেষণের জন্যে পাঠাতে চাইলে কিভাবে ব্যবস্থা করতে হবে, এই-সব কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-বিষয়ে যে আগ্রহী ছিলেন, প্রথমে শিলাইদহে এবং পরে শ্রীনিকেতনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নতুন নতুন শস্য আর তরিতরকারির চাষ সম্বন্ধে তাঁর চেষ্টার কথা আমরা জানি। সুতরাং ছেলের কাজ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তা ছাড়াও একটা ব্যাপার আছে। আঠারো-কুড়ি বছরের একজন ছেলে এবং তার পিতাকে পারস্পরিক সংযোগ বারবার নতুন করে রচনা করে নিতে হয়। বিশেষ করে যেখানে সেই ছেলের মা নেই, সেতুবন্ধনের কাজ করবার মতো কোনো সস্নেহ তৃতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। তা না হলে একদিন দেখা যায়, তার ছিঁড়ে গেছে, খবর দেওয়া-নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। রথীন্দ্রনাথের চিঠিতে নিজের কাজ সম্বন্ধে তৃপ্তির আভাস আছে, নবলব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে তরুণ মনের উদার দাক্ষিণ্য আছে, আবার পিতার কাছে সস্নেহ স্বীকৃতি পাবার একটা প্রচ্ছন্ন আকুতিও আছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, যে হীনমন্যতার কথা জীবনের নানা সময়ে তিনি বারবার বলেছেন, সে জিনিসের চিহ্নমাত্র নেই।

১৬ই শ্রাবণ তারিখ দেওয়া মৃত্তিকাবিজ্ঞান-বিষয়ক যে চিঠিটির কথা বলছি, পুলিনবিহারী সেন মশায় সেটি 'পিতৃস্মৃতি'র পরিশিষ্ট অংশে ছেপে দিয়েছিলেন। চিঠিখানি দীর্ঘ, বিশেষ কোনো অংশ তুলে দিয়ে লাভ নেই। শুধু চিঠির প্রথম দুটি ছত্র লক্ষণীয়। "গত-ডাকের চিঠি কতকগুলো বাজে কথায় ভরানো গিয়েছিল। এখন কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।" প্রশ্ন মনে আসে, "গতডাকের

সেই বাজে কথায় ভরানো” চিঠিখানি কেমন ছিল? আমাদের বিবেচনায় সেটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। অন্তুতপক্ষে রথীন্দ্রনাথের মনের কথা বোঝার ব্যাপারে।

‘গতডাকের’ এই চিঠিটির বিষয়বস্তু ছিল মোটামুটিভাবে কীটতত্ত্ব (entomology)। শুধুই কীটতত্ত্ব অবশ্যই নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে রথীন্দ্রনাথ ‘বাজে কথা’ নিয়ে আক্ষেপ করতেন না। যাই হোক, সেই সময়ে রথীন্দ্রনাথের অবস্থার কথা আমরা জানতে পারি ওই একই দিনে (৮ই শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথকে লেখা সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের একটি চিঠি থেকে। তাঁরা দুজনে তো একই সঙ্গে থাকতেন এবং পড়াশোনা করতেন। দুঃখের বিষয় এইসময়কার কোনো চিঠিতেই বছরের উল্লেখ নেই। শুধু মাস আর তারিখই আছে। তবে সন্তোষচন্দ্রের সরস ভাষ্য অন্য অভাব কিছুটা পূরণ করে দিয়েছে।

“জানই তো ভায়া আজকাল কীটতত্ত্বের চর্চা করছেন। পোকার সঙ্গে তাঁর কিরকম সদ্ভাব সে তো দেখেইচ, ঘরের মধ্যে কাঁচপোকা কি আরসোলা দেখলে সে কিরকম অস্থির হয়ে পড়ত। তার অধ্যাপক আজকাল আদেশ দিয়েছেন পোকা দেখলেই বোতলে পুরবে। এখন পোকা তো আপনি বোতলে আসে না। রথীর কিরকম অগ্নিপরীক্ষা চলচে বুঝতেই পারছ! বেচারি সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে দেড়গজ লংক্লথ নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। কোথাও একটা পোকার সন্ধান পেলেই তার উপর সেই দেড়গজ কাপড় নিয়ে লাফিয়ে পড়ে। তারপর ঘরে এসে, দরজা জানালা লাগিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে কার্পেটের উপর কাপড় ঝাড়তে থাকে। কিন্তু হায়— ফড়িং জাতটা এমনি দুর্বৃত্ত যে, বিজ্ঞানের খাতিরেও একটা পা দান করতে চায় না! দিনান্তে বেচারি পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসে আলো জ্বেলে বসে থাকে, যদি একটা ফড়িং দৈবাৎ লাফিয়ে আলোর উপরে পড়ে! কিন্তু যেদিন থেকে

ভায়া কীটতত্ত্বের সেই বড়ো বইটা ঘরে এনেছেন, সেদিন থেকে আলো দেখেও পোকারা আর ঘরে আসে না।

এই তো অবস্থা! কাল তাই যখন ভায়া বললেন "চলো গোটা-কতক পোকা ধরে আনা যাক্,— জায়গা শুনছি বড়ো চমৎকার"— আমি তাতে রাজি হলুম না। তার পর ফিরে এসে অবধি ক্রমাগত আমার কাছে গল্প কচ্ছে— "কী চমৎকার! কী চমৎকার!"

ভায়ার চিঠিতে ওই যে-সব বর্ণনা কতটা খাঁটি একবার দেখতে যাব। তবে ফড়িং ধরা ব্যাপারটা যে সত্য তাতে আর সন্দেহ নেই। এক বোতল ফড়িং আমাদের পড়বার ঘরের জানালায় সাজানো রয়েছে। ইতি ৮ই শ্রাবণ

সেবক

শ্রীসন্তোষ"

এই চিঠি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবে দুয়েকটা মন্তব্য হয়তো অবান্তর হবে না। রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে যে-স্বরে চিঠি লিখেছেন, সেই একই সময়ে সন্তোষচন্দ্রের ধরনটা তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ। দেখা যাচ্ছে, অন্তত সেই সময়ে বন্ধুপুত্রের সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের বেশ একটা সহজ সম্পর্ক ছিল। আর, কীটতত্ত্বের চর্চায় রথীন্দ্রনাথ যে যথার্থই আনন্দ পাচ্ছিলেন, সন্তোষচন্দ্রের চিঠিতে সেটা খুবই স্পষ্ট।

১৬ই শ্রাবণের চিঠিতে যেটাকে রথীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বাজে কথায় ভরানো', সেই ৮ই শ্রাবণের চিঠিখানি কিন্তু তুলনায় অনেকটা স্বচ্ছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত।—

"তোমাদের চিঠি সকালবেলায় এসেছিল কিন্তু আমি সন্ধেবেলায় সেগুলো পেলুম। এই কয়েক ঘণ্টা তোমার চিঠি বর্জিত হওয়ার কারণ কি জান? এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। তোমরা জান

তো আমি পোকা সম্বন্ধে একটা কোর্স নিয়েছি। এই কোর্সে পোকার অনুসন্ধানে ও তাদের জীবনবৃত্তান্ত জানতে প্রায়ই এদিক্ ওদিক্ যেতে হয়। এখান থেকে চৌদ্দ পনেরো মাইল দূরে একটা জঙ্গলের মতো আছে, সেখানে এখন একদল পঙ্গপাল দেখা দিয়েছে, তাই দেখতে অধ্যাপক আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। পোকার নাম শুনে তোমাদের নানারকম মনে হতে পারে। সেইজন্যে বলে রাখি, কেবল যে পোকা খুঁজতেই গিয়েছিলাম তা নয়, চড়িভাতি করাও উদ্দেশ্য ছিল।"

দীর্ঘ চিঠিখানিতে পোকা সংগ্রহ এবং চড়িভাতি দুয়েরই বিশদ বিবরণ আছে।—

"অনেক পোকামাকড় সংগ্রহ করা গেল। পঙ্গপাল জাতীয় যে পোকা বিশেষভাবে দেখতে গিয়েছিলুম, তা খুব দেখলুম— সমস্ত বন ছেয়ে ফেলেছে। এ ভারি মজার পোকা। পঙ্গপাল ঠিক নয়— কোথাও থেকে উড়ে আসে না। এক জায়গাতেই বরাবর থাকে, কিন্তু ১৭ বৎসর অন্তর দেখা যায়। এই পোকাগুলো এখন ডিম পাড়বে, তা থেকে যে পোকা হবে সেগুলি মাটির ভিতর ১৭ বৎসর চুপচাপ থাকবে। তারপর হঠাৎ বেরিয়ে এসে, এতদিনকার খোলস বদলে চারি দিক ছেয়ে ফেলবে— কিন্তু বিশেষ কিছু অনিষ্ট করে না।"

রথীন্দ্রনাথ নিজেও যে খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে সম্পূর্ণ অপারগ, তা নয়। চিঠির শেষের দিকটা এইরকম—

"ফিরে এসে দেখি নদীর ধারে, একটা খোলা আটচালার মতো ঘরে, আমাদের অধ্যাপক পিয়ানো বাজাচ্ছেন আর অনেকগুলি মেয়ে নাচছেন, আমাদের সঙ্গীরাও এই নাচে যোগ দিয়েছেন। এই ঘরটা নাচের জন্যেই রাখা। শুনলুম একদল মেয়ে এখানে চড়িভাতি করতে এসেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের অধ্যাপককে চিনতেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে ডেকে নিয়ে এসে পিয়ানো বাজাতে বসিয়ে দেন ও

তাঁরা নিজেরা নাচতে শুরু করে দেন। নাচতে এ দেশের লোক পরিশ্রান্ত হয় না। আমার সামনেই দু-একজন মেয়ে প্রায় দু ঘণ্টা নাচ চালালেন। আমাদের দুজনের কাছে ছবি তোলবার ক্যামেরা ছিল। মেয়েরা ছবি তোলবার জন্যে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। তাঁদের একটা group তুললুম। আরো ক'টা ছবি তুলেছি, কিরকম হয়েছে দেখো।"

পিতার কাছে পুত্রের চিঠি লেখার এই ভঙ্গি সেই সময়ের পক্ষে তো খুবই সুন্দর এবং সুস্থ মনে হয়। এই চিঠিকেই আটদিন পরে রথীন্দ্রনাথ 'বাজে কথায় ভরানো' বলছেন। মাঝে মাঝেই কি দুজনের মধ্যে সংকোচের আড়াল ফিরে আসত? একটা কথা কিন্তু খুব পরিষ্কার। কৃষিবিজ্ঞান পড়াটা যে-কারণেই স্থির হয়ে থাকুক-না কেন, আমেরিকার একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ওই বিভাগে পড়াশোনা শুরু করে রথীন্দ্রনাথের বেশ ভালোই লাগছিল। কৃষি-বিজ্ঞানের অনেকটাই তো আসলে প্রাণতত্ত্বের ব্যাপার। চর্চার ঝোঁকটা মোটামুটিভাবে প্রয়োগের দিকে, এই যা। ফসলকে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে হলে পোকামাকড়ের জীবনচক্র এবং আচরণ সম্বন্ধে জানতে হয়। তাই কৃষিবিদের কাছে কীটতত্ত্বের জ্ঞান অপরিহার্য। আবার অনেক পোকা আছে, যারা মাটিতে সারবস্তুর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, অথবা অবাঞ্ছিত আগাছা খেয়ে ফেলে। অন্য দিকে কোন্ মাটিতে কী ধরনের ফসল ভালো ফলবে, কোথায় কোন্ সার দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে, এ-সব জানতে হলেও মাটির রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা (soil chemistry and physics) শেখা দরকার। রথীন্দ্রনাথের এই দুখানি চিঠি থেকে বোঝা যায় যে তিনি বেশ মনোযোগ দিয়ে এই-সব বিষয়ের চর্চা করেছিলেন। শুধু ডিগ্রি পাবার খাতিরে নয়, যথার্থ ভালো লাগছিল বলেই।

রথীন্দ্রনাথের জীবনে প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহের সূত্রপাত কি নেহাত বিদেশে পড়াশোনা করতে গিয়েই হয়েছিল? সন্তোষচন্দ্র মজুমদার তো তাঁর চিঠিতে লিখেইছেন, "পোকার সঙ্গে তাঁর কিরকম সদ্ভাব সে তো দেখেইচ, ঘরের মধ্যে কাঁচপোকা কি আরসোলা দেখলে সে কি রকম অস্থির হয়ে পড়ত।" এটা নিশ্চয় ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের যুগের কথা। কিন্তু তারও আগে, একেবারে শৈশবের কথা রথীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন *On the Edges of Time* আর 'পিতৃস্মৃতি'তে। শিলাইদহে মাধুরীলতা আর রথীন্দ্রনাথকে যিনি ইংরেজি পড়াতেন, সেই লরেন্স সাহেব ইতিহাসবিদ অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে রেশম চাষের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। "সাহেব থাকতেন একটা আটচালা বাড়িতে— সেটা হয়ে গেল গুটিপোকার চাষ ও রেশম-উৎপাদনের কারখানা। লরেন্স সাহেবের মাছ ধরার বাতিক ছিল, সে-সব ভুলে গিয়ে তখন থেকে গুটিপোকা নিয়ে পড়লেন। বাড়িতে যেখানে যা জায়গা ছিল, গুটিপোকা তা দখল করে নিল। আমরা দেখতুম রবিবার দিন তিনি খবরের কাগজ জড়িয়ে গুটিপোকাদের মধ্যে শুয়ে আছেন আর পোকারা তাঁর সর্বাঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নিঃসন্তান এই সাহেবের এরাই ছিল সন্তান-সন্ততি।" প্রশ্ন হচ্ছে, কীটপ্রেমিক এই গুরুর কাছে রথীন্দ্রনাথ শুধু ইংরেজিই শিখেছিলেন কি না। আরো স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই ওই 'পিতৃস্মৃতি'রই পৃষ্ঠায়, যেখানে তিনি পিতৃবন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে নিজের বালক বয়সের সৌহার্দ্যের কথা বলছেন।

"বাবা যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে জগদীশচন্দ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করতেন, আমারও তেমনি ঔৎসুক্য কম ছিল না। আমার সঙ্গে তিনি গল্প করতেন, নানারকম খেলা শেখাতেন— ছোটো বলে উপেক্ষা করতেন না। আমি তাঁর স্নেহপাত্র হতে পেরেছি বলে আমার খুব

অহংকার বোধ হত। আমি মনে মনে কল্পনা করতুম বড়ো হয়ে জগদীশচন্দ্রের মত বিজ্ঞানী হব।'

এটাও সেই আদিযুগের কথা, যখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে উত্তরবঙ্গে বসবাস করছিলেন, পালাক্রমে কুঠিবাড়িতে আর বোটে চেপে পদ্মার বুকে। সেই সময়ে কবির শিশুপুত্রের সঙ্গে তখনকার ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর একরকমের বন্ধুত্ব হয়েছিল। "বর্ষার পর নদীর জল নেমে গেলে বালির চরের উপর কচ্ছপ উঠে ডিম পাড়ে। জগদীশচন্দ্র কচ্ছপের ডিম খেতে ভালবাসতেন। আমাকে শিখিয়ে দিলেন কি করে ডিম খুঁজে বের করা যায়।" কৌশলটা কঠিন নয়। কচ্ছপ-মাতা উঁচু ডাঙায় গিয়ে বালির উপরে ডিম পেড়ে আসে, যাতে রোদের তাপে সহজে ডিম ফুটতে পারে। ডিমগুলো বালিচাপা দেওয়া থাকলেও বালির উপরে কচ্ছপের পায়ের ছাপ দেখে দেখে সহজেই খুঁজে বার করা যায়। "কচ্ছপের মাংস খেতেও জগদীশচন্দ্র খুব পছন্দ করতেন।" ভোজনরসিক বিজ্ঞানীর সঙ্গে বালকের বন্ধুত্ব উভয়পক্ষেই সুখপ্রদ হয়েছিল। এটা এমন সময়ের কথা যখন রবীন্দ্রনাথ কবি লেখক এবং লোকনায়ক হিসেবে যথেষ্ট সুপরিচিত। তবু জলজ্যান্ত একজন বিজ্ঞানীর স্নেহ পেয়ে রথীন্দ্র-নাথের অহংকার বোধ হত। পিতৃবন্ধুর কাছে কি তিনি আর একটু সহজ হতে পারতেন? যাই হোক, প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথের আগ্রহের উন্মেষ হয়তো এই সময়েই হয়েছিল।

১৯০৬ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বছর যে রথীন্দ্রনাথের জীবনের উপরে স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল সে-বিষয়ে সংশয় নেই। এই সেই সময় যখন তিনি নিজের মতো করে জীবনটাকে গড়ে নেওয়ার কথা অন্তত ভাবতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখা চিঠিপত্রের অনেকগুলোই আর পাওয়া যাবে না। তবু দুয়েকটি চিঠি এখনো আছে যাতে তাঁর সেই সময়কার প্রাণোচ্ছলতা ফুটে

বেয়িয়েছে। এমন-কি সম্পর্কিত দিদিমা রাজলক্ষ্মী দেবীকেও তিনি ইলিনয় থেকে কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে পত্রাঘাত করেছেন। বোঝাই যায়, এই দিদিমাটির সঙ্গে তাঁর একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। এই রকম একটি চিঠির কিছু অংশ তুলে দিই :

"শ্রীচরণকমলেষু

দিদিমা, তোমার ১৫ই ফাল্গুনের এক মস্ত বড় চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। আমাদের ঈস্টারের জন্যে তিনদিনের ছুটি হয়েছে— কিন্তু বেশি অবসর নেই ; কালকে তো সমস্ত সকাল বেলাটা কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটরিতে কাজ করা গেল— কিছু এক্‌সপেরিমেণ্ট বাকি ছিল— এইবেলা সেগুলো সেরে না রাখলে পিছিয়ে পড়তে হবে।··· আজ সকালবেলায় কলেজের ক্ষেতে কিরকম চাষ করছে দেখতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম— কতরকমই যন্ত্র যে ব্যবহার করে তার ঠিক নেই— এখানকার লাঙল দেওয়া যদি দেখ ত অবাক হয়ে যাও— আমাদের লাঙল দেওয়া তার কাছে একটু মাটি আঁচড়ানো মনে হয়। সময়ও খুব কম লাগে— এক ঘণ্টায় বড়ো বড়ো ক্ষেত চষা হয়ে যায়। বীজ বুনতেও যন্ত্র ব্যবহার করে— সে যন্ত্রটা এমনি তাতে মই দেওয়া, বীজ বোনা ও তারপর বীজের উপর মাটি চাপা দেওয়া সব একসঙ্গে হয়।··· আমাদের দেশে বীজ বোনার পর মাঝে মাঝে ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই কাজ থাকে না— এখানে কিন্তু তা নয়— ফসল লাগাবার পর প্রত্যেক আট দশ দিন অন্তর (তার মানে প্রত্যেক বৃষ্টির পর) জমি চষবার— cultivate করা plowing নয়— নিয়ম ; এতে জঙ্গল বাড়তে দেয় না— জমিও শুকোয় না।"

এই রকম আরো অনেকখানি। তার পর একটু মজা করেছেন। মানে, একটু ছদ্ম আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে চাষের কথা আরো লিখলে হয়ত 'বঙ্গদর্শন'-এ ছাপিয়ে দেবে।

"চাষের কথা দিয়েই চিঠি ভরিয়ে দিলুম, আর নয়— ভয় হয় আবার বঙ্গদর্শনে ছাপিয়ে দেবে। হাঁ, মাঘের বঙ্গদর্শন এসে উপস্থিত —জগদানন্দবাবু সেই চিঠি থেকে প্রবন্ধ খাড়া করে তুলেছেন বটে —কিন্তু আর একটু ভাষা সংশোধন করে দিলে ভালো হত।"

এই সময় নব পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রথীন্দ্রনাথের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে। তার মধ্যে মাঘ ১৩১৩ তারিখের প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'ফলের বাগান'। এটি কিভাবে খাড়া করা হয়েছিল সে তো বোঝাই যাচ্ছে। অন্য প্রবন্ধটি বেরোয় আষাঢ় ১৩১৪ তারিখে, শিরোনাম 'বৃক্ষের আকার বিধান'।

রাজলক্ষ্মী দেবীকে কিন্তু তাঁর নাতি শুধু বিদেশের চাষবাসের খবরই দেন নি, শান্তিনিকেতনের বাগানের তত্ত্বতাবাসও করেছেন—

"তোমাদের ফলের বাগানে খুব ফল ধরেছে শুনে খুশি হলুম— এতদিনে সেগুলো নিশ্চয়ই বেশ বড় হয়েছে— কি রকম খেতে হয় লিখো। গাছগুলো যদি বেশ জোরালো হয় ও বেশ বাড়তে থাকে তাহলে মুকুল ভেঙে দেবার বিশেষ প্রয়োজন নেই— যে সব গাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে এখানে তার মুকুল কখনও ভেঙে দেয় না। এবারে খুব আম হবে শুনে খুশি হলুম— যদিও আমাদের ভাগ্যে কেবল আমসত্ত্বই আছে।"

আমেরিকায় পড়াশোনা সেরে ১৯০৯ সালের শেষদিকে রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন। 'পিতৃস্মৃতি'তে লিখছেন :

"এসে দেখি শিলাইদহের কুঠিবাড়ি আমার জন্য প্রস্তুত— জমিদারির কাজকর্ম তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে আমি আমার খেত-খামার গড়ে তুলব, কৃষি নিয়ে পরীক্ষা গবেষণা করব— এই ছিল বাবার অভিপ্রায়। যুবা বয়স, কাজ করার জন্য হাত মন নিশপিশ করছে— সুতরাং এর চেয়ে বেশি আর কী চাই। ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরেই বাবা আমায় নিয়ে বেরোলেন জমিদারি অঞ্চলে—

উদ্দেশ্য, প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হবে ও সেই সঙ্গে জমিদারির কাজকর্ম আমি তাঁর কাছ থেকে বুঝে নেব। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। হাউস বোটে কেবল বাবা আর আমি। বারবার মৃত্যুশোকের আঘাতে, বিশেষ করে অকালে শমী চলে যাওয়ায়, তাঁর মনে তখন গভীর বেদনা, তিনি নিতান্ত একাকী। দীর্ঘকাল প্রবাসের পর আমি ফিরে এসেছি, সুতরাং তাঁর হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা তিনি যেন উজাড় করে ঢেলে দিলেন। অনেক দিনের চেনাজানা নদীর বুকে আমরা দুজন ভেসে চলেছি। প্রতি সন্ধ্যায় আমরা ডেকে বসে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। এর আগে এমন মন খুলে বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ কখনো পাই নি। স্বভাবত আমি মুখচোরা মানুষ, প্রথম প্রথম তাই একটু বাধো-বাধো ঠেকত। সদ্য কলেজ-পাস-করা ছোকরার মুখে কৃষি-বিদ্যা, সৌজাত্যবিদ্যা অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ধারকরা কেতাবি মতামত শুনে বাবা নিশ্চয় খুব কৌতুক অনুভব করতেন।··· সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ক্বচিৎ হত— তিনি হয়তো ভাবতেন তাঁর বিজ্ঞানী ছেলের পক্ষে সাহিত্যের রসবোধ কঠিন হবে। ১৯১০ সালের সেই সময়টাতে আমরা পিতাপুত্র পরস্পরের যত কাছাকাছি এসে-ছিলাম তেমন আর কখনো ঘটে নি।"

বলা বাহুল্য, রথীন্দ্রনাথকে বোঝবার পক্ষে এই ছত্রগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হাউসবোটে একা বাবার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সেই একবারই তিনি বাবার অনেকটা কাছে আসতে পেরেছিলেন, এই উক্তির মধ্যে একই সঙ্গে অনেকটা তৃপ্তি আর দুঃখবোধ মিশে আছে। সেই মিশে থাকাটাই হয়তো ছিল রথীন্দ্রনাথের জীবনের কেন্দ্রীয় ব্যাপার।

পৃথিবীর কোনো শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ব্যক্তির সন্তান হওয়াটা কি খুব সুখকর অভিজ্ঞতা হয়েছে কারো পক্ষে? প্রশ্নটা কঠিন। ওই

ধরনের মানুষের চার পাশে একাকিত্বের একটা দুর্ভেদ্য আড়াল থাকে। আর স্বভাবের মধ্যে থাকে অনেক জটিলতা। রথীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাবার চরিত্রের এই ব্যাপারগুলো বুঝতেন।

"হৃদয়ের যে-সব সুকুমারবৃত্তিকে আমরা মনুষ্যচরিত্রের প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলে মনে করি, বাবার মধ্যে সেগুলি ছিল পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু সবকিছু মিলে তাঁর স্বভাব ছিল জটিল ও দুর্জ্ঞেয়। তাঁর সংবেদনশীল মনে এমন একটা সহজাত দ্বিধা-সংকোচের ভাব ছিল যে ঠিক করে বলা যেত না, কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার বিষয়ে তাঁর মন কখন কিভাবে প্রতিক্রিয়া করবে। তাঁর মন-মেজাজ কখন কেমন থাকবে, বুঝতে পারা সহজ ছিল না।...তাঁর মতো স্নেহপ্রবণ মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। আবার তাঁর মতো দুরধিগম্য, যুগপৎ ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র, কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার জীবনে দেখেছি বলে স্মরণ হয় না।"

এই যে মানুষ, এটা কি বলা যায় যে তাঁর কাছে এসে বসে কথা বলতে বলতেই তাঁর মন পাওয়া যাবে? পদ্মার বোটে রথীন্দ্রনাথ অনেকগুলো সন্ধেবেলায় তাঁকে একলা কাছে পেয়েছিলেন। দুজনে নিশ্চয় পরস্পরের অনেকটা কাছে এসেও ছিলেন। তবে দূরত্বও কিছুটা হয়তো থেকেই গিয়েছিল। যেমন, রথীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, তাঁর মুখে কেতাবি মতামত শুনে তাঁর বাবা নিশ্চয় খুব কৌতুক অনুভব করতেন। কিন্তু কুড়ি-একুশ বছর বয়সের ছেলের মুখে একজন বাবা কি সত্যিই খুব বেশি-কিছু আশা করেন? বিশেষ করে সেই বাবা যদি নিজে জাতশিক্ষক হন, শিক্ষার বিষয়ে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। বোঝা যায়, রথীন্দ্রনাথের নিজের মনেও খুব স্বাভাবিক কারণেই আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। অন্তত এই একটা জায়গায়। "অধিকাংশ সময় তিনি চুপ করে থাকতেন ও আমার মুখের বাঁধা বুলি ধৈর্যসহকারে শুনে যেতেন।" অন্তুতপক্ষে রথীন্দ্র-নাথের নিশ্চয় তাই মনে হত।

শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথের জন্যে যে ধরনের কাজকর্মের কথা কবি ভেবেছিলেন, তা কিন্তু কয়েক বছর ভালোই চলেছিল।

"শিলাইদহে আমার নূতন জীবন শুরু হল— আমি যেন ইংলণ্ড-আমেরিকার পল্লী অঞ্চলের একজন সম্পন্ন কৃষাণ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে খেত তৈরি হল, আমেরিকা থেকে আমদানি হয়ে এল ভুট্টার বীজ ও গৃহপালিত পশুর জাব খাবার মতো নানাবিধ ঘাসের বীজ। এদেশের উপযোগী করে নানারকম লাঙল, ফলা ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি করা হল— এমন-কি মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করার জন্য ছোটোখাটো একটি গবেষণাগারের পত্তন হল। এই সময় আমেরিকা থেকে এসেছিলেন মাইরন ফেল্‌প্‌স্‌— ইনি ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে এঁর লেখা অনেক প্রবন্ধাদি তখনকার কাগজে প্রকাশিত হত। তাঁর একটি লেখায় তিনি আমাদের মস্ত সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, বলেছিলেন শিলাইদহে আমি নাকি একটি সত্যিকারের ভালো আমেরিকান ফার্ম গড়ে তুলতে পেরেছি।"

বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে রথীন্দ্রনাথের এই কাজ মোটেই অবহেলার যোগ্য ছিল না। তবে মুশকিল এই যে, ফলিত গবেষণার এই জাতীয় কাজ লোকে মনে রাখে সেইখানেই যেখানে সেই কাজের গুরুত্ব বোঝবার মতো একটা বাতাবরণ থাকে। শুধু শিলাইদহে নয়, তার পরেও শ্রীনিকেতনে এককালে কৃষি নিয়ে বেশ-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, নানা ধরনের যন্ত্রও ব্যবহৃত হয়েছে। সেই-সব কাজ এখন প্রায় বিস্মৃত। তবু একটা কথা না বললে অন্যায় হবে। রথীন্দ্রনাথ যে তাঁর অধীত বিষয়ে কোনো কাজ করেন নি, এ কথাটা ঠিক নয়। বরং তাঁর কৃষি-গবেষণায় স্থানীয় পরিবেশ আর চাহিদা সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তাভাবনার ছাপ ছিল। শ্রীনিকেতনের পরীক্ষামূলক খামারটিও একসময় উৎকর্ষের একটা

নতুন দৃষ্টান্ত এ দেশে স্থাপন করেছিল। শিলাইদহের এই পর্বের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথের সুখস্মৃতি ছিল।

"এর পরের কয়েকটা বছর কাটল অনাবিল আনন্দে। আমি জমিদারির কাজ ও চাষবাস নিয়ে গবেষণামূলক পরীক্ষায় দিন কাটাই, আর আমার স্ত্রী, ইলিনয় থেকে আগত মিস বুরডেট নামে একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়াশুনা করেন। কিন্তু বাংলার পল্লীগ্রামে সরল-চিত্ত চাষাভুষোদের মধ্যে এই সহজ আনন্দের জীবনে হঠাৎ ছেদ পড়ল। বাবার পক্ষে শস্তিনিকেতন বিদ্যালয় পরিচালনার ভার ক্রমেই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছিল। আমাকে শিলাইদহ থেকে বাবা ডেকে পাঠালেন। বললেন, শান্তিনিকেতনের কাজে আমি যেন তাঁর যথাসাধ্য সহায়তা করি।"

রথীন্দ্রনাথের জীবনে অবশ্য নিজের মনোমত কাজে যতি পড়ার এইটেই একমাত্র ঘটনা নয়। ১৯১২ সালে কবি যখন ইয়োরোপ-আমেরিকার দীর্ঘ সফরে যান, তখন কথা ছিল যে রথীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর পুরনো বিদ্যাস্থান ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করবেন।

"মার্কিনদেশে ছয়মাস" শীর্ষক অধ্যায়ে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় কী বলছেন শোনা যাক :

"রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী ২৮ অক্টোবর ১৯১২ আমেরিকার নিউইয়র্ক মহানগরীতে পৌঁছিলেন ; বিলাতে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে দুইবার আসিয়াছিলেন— কিন্তু আমেরিকায় এই প্রথম পদার্পণ। সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ।...

"নিউইয়র্কে কয়েকদিন থাকিয়া তাঁহারা আর্বানা (ইলিনয়) যাত্রা করিলেন। রথীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ ইলিনয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। সেই সময়ে সেখানে শান্তিনিকেতনের এককালীন শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র রায় ও তথাকার প্রাক্তন ছাত্র সোমেন্দ্র-

চন্দ্র দেববর্মণ এখানে বিদ্যার্থী হইয়া আসিয়াছেন।... আর্বানা ক্ষুদ্র শহর; বাসা পাইবার পূর্বে কয়েকদিন কবি থাকিলেন অধ্যাপক ব্রুকসের বাটীতে, রথীন্দ্র ও প্রতিমা দেবী উঠিলেন অধ্যাপক সীমূরের বাসায়। পরে যে বাড়িটি পাইলেন সেটি 'বেশ ছোটখাটো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিভৃত নিরালা।'... মোট কথা, আর্বানায় কবির মন বেশ বসিয়াছে। 'কোথাও কোনো গোলমাল নেই— আকাশ খোলা, আলো অপর্যাপ্ত, অবকাশ অব্যাহত। মাঝে মাঝে একেবারে ভুলে যাই যে আমেরিকায় এসেছি— ঠিক মনে হয় যেন দেশে আছি।'...

"আর্বানায় বাসকালে কবি বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বপ্নও নানাভাবে দেখিতেছেন। আমেরিকায় আসিয়াই তিনি রথীন্দ্রনাথকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিবার জন্য ভর্তি করিয়া দিয়াছেন, উদ্দেশ্য রথীন্দ্রনাথ ইলিনয়ে Botany ও Zoologyটায় গোড়াপত্তন করিয়া লইয়া পরে কেম্ব্রিজে গিয়া অধ্যয়ন করেন; সেখানে বৎসর-দুই রিসার্চ করিয়া দেশে ফিরিবেন ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া রীতিমতভাবে ল্যাবরেটরি খুলিয়া রিসার্চ করেন। ছাত্রদের অনেকে এণ্ট্রান্স দিয়া অন্যত্র না গিয়া তাঁহার সঙ্গে কাজে লাগিতে পারে। পূর্বে কবির ইচ্ছা ছিল শিলাইদহই রথীন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্র হইবে— এখন সে ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, এখন বিদ্যালয়ের মধ্যে রিসার্চ বা গবেষণা লইয়া থাকেন ইহাই তাঁহার প্রধান কাম্য। আসলে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-ইচ্ছা ও যুগপৎ পুত্রের চিত্তকে বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট করিবার ভাবনা মনের পুরোভাগে নিরন্তর রহিয়াছে।"

বিদেশে গবেষণা করে গিয়ে পরে রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করবেন, এই ধরনের পরিকল্পনা সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লেখা চিঠিতে ব্যক্ত হয়েছে। একদিকে রথীন্দ্রনাথ আর অন্য দিকে বিদ্যালয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার

বেশ একটা ছবি এখানে পাই। সেই ছবি সর্বাংশে বাস্তবসম্মত ছিল কিনা, সেটা অবশ্য অন্য কথা। ল্যাবরেটরি এবং গবেষণা সম্বন্ধে কবিমানুষের মনের ধারণা একটু রোম্যান্টিক হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। পরীক্ষাভিত্তিক (experimental) যে-কোনো গবেষণায় ল্যাবরেটরি নিশ্চয়ই কাজে লাগে। কিন্তু সেই ল্যাবরেটরি গড়ে ওঠে গবেষক বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা এবং কাজের পরিকল্পনাকে অবলম্বন ক'রে। ল্যাবরেটরি জিনিসটার কোনো স্বতন্ত্র মূল্য থাকে না, যদি সেখানে ক্রমাগত নতুন নতুন চিন্তাভাবনার ভিতর দিয়ে গবেষণার নতুন নতুন পথ খুলে না যায়। আর সেজন্যে চাই ন্যূনতম আয়তনের একটি শিক্ষিত বুদ্ধিমান পরিশ্রমী এবং নিবেদিত গবেষক-গোষ্ঠী। ভালো বিজ্ঞানীর পক্ষে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সমধর্মী সতীর্থদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। রথীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রাণতত্ত্বের (biology) কোনো-একটি নির্বাচিত শাখায় স্নাতকোত্তর পড়াশোনা এবং গবেষণা করে দেশে ফিরে গিয়ে একটি গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করা মোটেই অসম্ভব ছিল না, যদি তিনি সে-রকম সুযোগ পেতেন। নিছক সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হয় যে, বিদেশে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা এবং গবেষণার তেমন নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ তিনি যে কারণেই হোক পান নি। আর বাকিটা অবশ্য ছিল সম্ভাব্যতার প্রশ্ন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে তখনকার আর্থিক অবস্থায় এবং সেই সময়কার পরিবেশে একদল এনট্রান্স পাস ছেলেকে নিয়ে রথীন্দ্রনাথের পক্ষে একটি ভালো গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব ছিল কিনা, বলা শক্ত। যেটা সম্ভব ছিল, সেটুকু তিনি করেছিলেন। শ্রীনিকেতনে ক্রমশ একটি ভালো কৃষিকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। তাতে লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট প্রমুখ অন্যদের সহায়তা ছিল। কিন্তু সে অন্য কথা। আলোচনার পূর্ণতার খাতিরে ইলিনয়ে রথীন্দ্রনাথের স্নাতকোত্তর পড়াশোনা কিভাবে শেষ হল সেটা বলে নেওয়া দরকার।

সকলেই জানেন আর্বানাতেই ইউনিটেরিয়ানদের সংগঠন ইউনিটি ক্লাবে কবি যে বক্তৃতাগুলি দিতে শুরু করেন, ক্রমশ তা 'সাধনা'-বক্তৃতামালা হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং শেষ পর্যন্ত শিকাগো রচেস্টার হার্ভার্ড প্রভৃতি নানা জায়গায় তাঁকে বক্তৃতা দিতে যেতে হয়। প্রায় ছ মাস এইভাবে কেটে গেল। প্রভাতকুমারের ভাষায়—

"হার্ভার্ডের বক্তৃতাগুলি শেষ করিবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ নিউইয়র্ক ত্যাগ করিয়া শিকাগো চলিয়া গেলেন কেন বলিতে পারি না, নিউইয়র্কের হট্টগোল তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না সত্য কিন্তু শিকাগোতে গোলমাল কম নয়! তাই সেখান হইতে আর্বানায় ফিরিয়া গেলেন (১০ মার্চ)। আর্বানায় একমাস থাকিলেন, কিন্তু বিলাতে ফিরিবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল।

"প্রায় ছয় মাস ইংলণ্ড ছাড়া। গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইবার পর সেখানে কী প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহার ক্ষীণাভাস আমেরিকান পত্রিকা মারফৎ পাইতেছেন বটে, তবে তাহা সম্পূর্ণ নহে। সন্তোষ-চন্দ্রকে লিখিতেছেন, 'এখানে ধীরে ধীরে লোকের দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়বার সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসছে। অতএব নিশ্চয়ই এখান থেকে আমার পালাবার দিন নিকটবর্তী হচ্ছে।' এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রথীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-বিষয়ে গবেষণার পর্ব আর কয়েক মাসের মধ্যেই শেষ হইবে, কিন্তু তাহা আর হইল না, অধ্যয়ন অসমাপ্ত রাখিয়া পিতাকে লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিতে হইল।"

রথীন্দ্রনাথ নিজে এ-বিষয়ে কী বলেন? 'পিতৃস্মৃতি'তে তাঁর মন্তব্য সংক্ষিপ্ত এবং যথেষ্ট সংযত :

"শিকাগোর পর বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এল হার্ভার্ড ও নিউইয়র্ক থেকে। বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের আর্বানার পাট এবার উঠিয়ে দিতে হবে— ডক্টরেট পাওয়া আমার অদৃষ্টে নেই। এজন্য খুব যে আক্ষেপ হয়েছিল তা অবশ্য বলতে পারি নে।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে রথীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চার ইতস্তত চিহ্ন নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। এটা যদি মনে রাখি যে এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের আগে শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞানের কোনো বিভাগেই উচ্চতর শিক্ষার আনুষ্ঠানিক আয়োজন ছিল না, তবে তার আগেকার যুগের গ্রন্থাগারে বিজ্ঞানগ্রন্থের সংগ্রহ যা ছিল তাকে মোটেই নগণ্য বলা যাবে না। সেই সংগ্রহের মধ্যে কিছু বই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের কেনা কিংবা উপহার পাওয়া। কিন্তু অনেক বই ছিল যার পিছনে রথীন্দ্রনাথের আগ্রহের উপস্থিতি সহজেই ধরা পড়ে। বিশেষ করে প্রাণতত্ত্ব কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে। উত্তরায়ণের চত্বরের ভিতরে লতানো আমগাছ ইত্যাদিকে ফলিত গবেষণাই বলতে হবে। উত্তরায়ণের গোটা বাগানই তো প্রধানত তাঁর তৈরি।

তবে রথীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানশিক্ষার স্থায়ী ফসল যদি কিছু থেকে থাকে তো সে হচ্ছে 'প্রাণতত্ত্ব' আর 'অভিব্যক্তি' এই দুটি বই। দুটোই বিশ্বভারতীর প্রকাশিত। 'প্রাণতত্ত্ব' বইটি বাংলা ১৩৪৮ সনে বেরোয় লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায়, আর 'অভিব্যক্তি' বেরোয় ১৩৫২ সনে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ৪৮-সংখ্যক পুস্তিকা হিসেবে। দুটোই চটি বই। বই দুটির আসল গুরুত্ব তাদের রচনাভঙ্গিতে।

বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থের ভাষা কেমন হওয়া উচিত, পরিভাষার সমস্যা কিভাবে মেটানো যায়, এই-সব কথা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে অনেক বিতর্ক চলে আসছে। বিতর্ক চলতেই পারে। অনেক বিতর্ক থাকে যা থেকে বিষয়ের বিকাশে সাহায্য হয়। আবার অনেক বিতর্ক নেহাতই কালক্ষেপের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। রথীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানরচনা সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে দুটি প্রশ্ন মনে রাখলেই চলবে :

১. বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখতে হলে ঠিক কী ধরনের ভাষা ব্যবহার করলে ভালো হয়? অর্থাৎ সেই ভাষা শিক্ষিত বাঙালির মুখের ভাষা থেকে কতটা দূরে থাকবে অথবা তার কতটা নিকটবর্তী

হবে। যেহেতু এ দেশে আমরা অধিকাংশ সময়ে ইংরেজি বই পড়ে পরে বাংলায় লিখি, সেইহেতু বাংলায় বাক্যগঠনের ব্যাপারে আমরা ক্রমশই ইংরেজি ভাষার অনুবর্তী হয়ে পড়ছি। এটা শুধু বিজ্ঞান-রচনার ব্যাপার নয়, যাবতীয় বাংলা রচনারই সমস্যা। এখনকার কালে বোধ হয় খাঁটি বাংলা বাক্যরীতি মেনে চলেন একমাত্র তাঁরাই যাঁরা ইংরেজি জানেন না। এ ছাড়া আরো অনেক প্রশ্ন আছে। যেমন, পারতপক্ষে আমরা তদ্ভব এবং দেশজ শব্দই ব্যবহার করব, না প্রচুর তৎসম শব্দের সাহায্যে বাক্যগুলিকে পেশীবহুল করে তুলব।

২. আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পরিভাষা। নীতিগতভাবে পরিভাষা হওয়া উচিত ব্যক্তি নিরপেক্ষ। কিন্তু কার্যত তা এ দেশে এখনো হয় নি। রথীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন, তখন তো পরিভাষার সংকলন আরো অনেক কম হয়েছিল। সুতরাং পরিভাষার মধ্যেও অনেকটা নির্মাণের ব্যাপার ছিল। রথীন্দ্রনাথ কী ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন ? তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষার কি কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল ?

সব মিলিয়ে বিজ্ঞান রচনার ভাষা সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক নথি থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিলেই বোধ হয় আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে। সেই নথি হচ্ছে ১৬৬৭ খৃস্টাব্দে বিশপ স্প্র্যাটের লেখা ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটির ইতিহাস। এর ঠিক পাঁচ বছর আগেই রবার্ট উইলিয়ম পেটি, ক্রিস্টোফার রেন প্রমুখ বহুমুখী প্রতিভাশালী মানুষদের নিয়ে রয়্যাল সোসাইটির পত্তন হয়েছে। সপ্তাহে সপ্তাহে অধিবেশন করে সোসাইটির সদস্যরা নিজেদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল প্রদর্শন করছেন এবং তাই নিয়ে আলোচনা করছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সেই প্রথম প্রত্যুষেই সোসাইটির সদস্যরা বিজ্ঞানচর্চার ভাষা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছিলেন।

সোসাইটির আলোচনার ভাষাগত আদর্শ সম্বন্ধে স্প্র্যাট কী বলছেন শোনা যাক। সেই আদর্শের মূল কথা হচ্ছে সর্বপ্রকার অলংকার এবং আতিশয্য পরিহার করে চলা। অতএব সোসাইটির সদস্যরা

"...rejected all the amplifications, digressions, and swellings of style : to return back to the primitive purity, and shortness, when men deliver'd so many *things*, in an almost equal number of *words*. They have exacted from all their members, a close, naked natural way of speaking ; positive expression, clear sense ; a native easiness : bringing all things as near the Mathematical plainness, as they can : and preferring the language of Artizans, Countrymen, and Merchants, before that of Wits, or Scholars."

স্বীকার করতে হবে, বাংলাভাষার এখনকার ঝোঁক ওই দিকে হলেও কারিগর আর হাটুরে মানুষদের কাছে আমরা এখনো গিয়ে পৌঁছতে পারি নি। 'মার্চেন্ট' বলতে অবশ্য উইলিয়ম স্প্র্যাট বিত্তবান ব্যবসায়ীদের কথা ভাবেন নি, তখনকার ছোটোখাটো বিকিকিনির ব্যাপারীদের কথাই ভেবেছিলেন। যাই হোক, স্প্র্যাটের বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে এখানে তার বঙ্গানুবাদ করছি না।

রথীন্দ্রনাথের আগে বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী বাংলাভাষা নিয়ে কাজ যে হয় নি তা নয়। অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর —অনেকটাই রাস্তা। মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ও জগদানন্দ রায়ের নামও স্মরণীয়। রথীন্দ্রনাথের সামনে প্রভাব বলতে সবচেয়ে প্রবল ছিল তাঁর নিজের পিতার রচনাগুলি। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানরচনায় সাহিত্যিক জৌলুস খুব যে বেশিরকম ছিল তা নয়। কিন্তু তাঁর শেষকীর্তি 'বিশ্বপরিচয়' ভাষার দিক দিয়ে একই সঙ্গে অনবদ্য এবং বিপজ্জনক। বিপজ্জনক এই কারণে যে, মূলত তা

একজন মস্ত বড়ো কবির ভাষা এবং অনুকারকের পক্ষে তার ফল ভালো লওয়া মুশকিল। 'বিশ্বপরিচয়ে'র অনেক বাক্যের গড়নই স্প্র্যাট-বর্ণিত 'a close, naked natural way of speaking' থেকে সরে এসেছে। কারিগরদের ভাষা কিংবা 'mathematical plainness'-এর সঙ্গেও তাদের কোনো যোগ নেই। যোগ না থাকলেও 'বিশ্বপরিচয়' অনন্য। কিন্তু সে অন্য কথা।

রথীন্দ্রনাথের নিজের ভাষা শিক্ষায় যে ধ্রুপদী উপাদানের অভাব ছিল তা নয়। এনট্রান্স পাস করার পরে পিতার আগ্রহে শান্তিনিকেতনেই তিনি বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে সংস্কৃত ও পালি শেখেন। আর সেই চর্চার সূত্রে অশ্বঘোষের লেখা 'বুদ্ধচরিত' অনুবাদ করে ফেলেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে হাতের কাজে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। ছবি আঁকা ছাড়াও কাঠ ও চামড়ার কাজে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের সেই আমলের বাড়িগুলির ভিতরকার সজ্জা এবং আসবাবপত্রের পরিকল্পনা আর বাস্তব রূপায়ণে তাঁর হাত ছিল। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'জন্মেছি শিল্পীর বংশে, শিক্ষা পেয়েছি বিজ্ঞানের, কাজ করেছি মুচির আর ছুতোরের।'

'প্রাণতত্ত্ব' এবং 'অভিব্যক্তি' পড়লে মনে হয়, তাঁর নিজেরই বর্ণিত এই বহুমুখী শিক্ষা তাঁর বিজ্ঞানরচনায় সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সময়ের সঙ্গে যে-কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থের বিষয়বস্তু অন্তত কিছুটা পুরোনো হয়ে যায়। এই দুটি বইয়ের ক্ষেত্রেও যে তা হয়নি তা নয়। বিশেষ করে প্রাণতত্ত্বের ক্ষেত্রে গত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরে বিরাট একটা বিপ্লব হয়ে গেছে। সেই বিপ্লব বেশি করে এসেছে প্রজনবিদ্যা (genetics), কোষতত্ত্ব (cytology) ইত্যাদি বিভাগে। আণবিক প্রাণতত্ত্ব (molecular biology) নামে নতুন একটা বিষয়ই তো গড়ে উঠেছে। অনেক বিষয়েই অনেক কথা জানা গেছে যা

সেই আমলে জানা ছিল না। যেমন 'প্রাণতত্ত্ব' বইয়ে রথীন্দ্রনাথ ভিটামিন সম্বন্ধে বলছেন, "আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য ভিটামিনের যে বিশেষ প্রয়োজন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই কিন্তু এদের কী ধরনের রাসায়নিক গড়ন তা এখনো ঠিক জানা যায় নি।" বলা বাহুল্য, এখন আর এ কথা খাটে না।

কিন্তু এহ বাহ্য। রথীন্দ্রনাথের আসল জোর তাঁর লেখার ভাষায়। প্রথম কথা, সেই ভাষার মধ্যে কোনোরকম অলংকার বা আতিশয্য নেই। কথাটা শুনতে নেতিবাচক, কিন্তু কার্যত বিজ্ঞানরচনার পক্ষে কতটা ইতিবাচক, সেটা পেশাদার বিজ্ঞানীমাত্রেই জানেন। এক কথায় বলতে হয়, রথীন্দ্রনাথ রয়্যাল সোসাইটির ওই আদর্শ— "a close, naked natural way of speaking"— অনেকটাই রপ্ত করেছেন।

রথীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পরিভাষার দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করব।

ইংরেজিতে kinetic energy বলতে বোঝায় সেই ধরনের শক্তি যার মূলে থাকে কোনো-না-কোনো ধরনের গতি। যে-কোনো বস্তুখণ্ড (বা প্রাণী) যখন চলতে থাকে, তখন তার এইরকম শক্তি থাকে। আর থেমে গেলে বা স্থির অবস্থায় থাকলে kinetic energy বলে কিছু থাকে না। বাংলায় একে সচরাচর বলা হয় গতিশক্তি। কেউ কেউ আবার একধাপ এগিয়ে ইংরেজি kinetic-এর প্রতিশব্দ তৈরি করেন 'গতীয়', যেটা কিনা বিশেষণবাচক শব্দ। করে নিয়ে kinetic energy-কে বলেন 'গতীয় শক্তি'। এর পাশাপাশি রথীন্দ্রনাথ কী করেছেন দেখা যাক। বাংলাভাষার বহুব্যবহৃত একটি শব্দকে বৈজ্ঞানিক ব্যঞ্জনা দিয়ে kinetic energy-র প্রতিশব্দ করেছেন 'চলৎশক্তি'। চমৎকার বাংলা এবং চমৎকার বিজ্ঞান।

ঠিক এইরকম না হলেও আরেকটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হচ্ছে Kata-

bolism এবং anabolism এই দুই ধরনের শারীরিক ক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমরা যথাক্রমে শক্তি ক্ষয় এবং শক্তি অর্জন করে থাকি। 'চলন্তিকা'য় এই দুটি শব্দের বাংলা করা হয়েছে 'অপচিতি' আর 'উপস্থিতি'। এতে কিন্তু katabolism এবং anabolism এই দু-ধরনের ক্রিয়ার মধ্যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলের যে ব্যঞ্জনাটা আছে, শক্তির কমার এবং বাড়ার যে ভাবটা আছে, সেটা ঠিক আসে না। অপর পক্ষে রথীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'অপঘটন' এবং 'উদ্‌ঘটন' শব্দদুটির মধ্যে সেই ভাবটি পূর্ণমাত্রায় আছে। এরকম আরো বেশ-কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

রথীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক রচনায় যে কোনো সাহিত্যগুণ নেই তা নয়; বিলক্ষণ আছে। বস্তুত সে গুণ হচ্ছে স্বচ্ছ সংযত এবং যথাযথ ভাষণেরই গুণ। যেমন, প্রাণের সামান্য লক্ষণ হিসেবে প্রজননের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:

"প্রজননের ইচ্ছা জীবমাত্রেই অন্তর্নিহিতি। এই উপায়ে বংশ-বৃদ্ধি করার চেষ্টার মূলে রয়েছে মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া, নিজেকে অমর করা। বাড়বার ক্ষমতা হল গোড়াকার কথা। কিন্তু বাড়ার সীমা নির্দিষ্ট থাকাতে এক জায়গায় এসে সব থেমে যায়, জীবন তা মানতে চায় না, সে যে অসীমের পিয়াসী, মৃত্যুকে সে অতিক্রম করবেই। তখন কী আর করে, নিজেকে আর বাড়াতে না পেরে নূতন করে সে শুরু করে সৃষ্টি। উচ্চস্তরের জীবের মধ্যে এই সৃষ্টিকার্য একাকী হয় না, দুজন না হলে বংশরক্ষা হয় না। স্ত্রীকে পুরুষের সাহায্য নিতে হয়, পুরুষকে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে হয়। প্রকৃতি-পুরুষের লীলা এইখানেই— তার বিরোধে, তার মিলনে।"

একাধিক স্তরে অর্থসমন্বিত, ব্যঞ্জনাময় এবং ঘনসন্নিবদ্ধ এইরকম একটি অনুচ্ছেদ যিনি লিখতে পারেন, সেই রথীন্দ্রনাথের স্থান যে বাংলাসাহিত্যে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

রচনা-সংকলন

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকে নির্বাচিত একটি অংশ এখানে সংকলিত হল।

'পিতার স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে' রথীন্দ্রনাথের আত্মজীবনমূলক 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে প্রথম দুটি রচনা নেওয়া হয়েছে।

'প্রতিভাষণ' শীর্ষক রচনাটি পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয় রথীন্দ্রনাথের ৬০ বৎসর পূর্তি-উপলক্ষে আয়োজিত সভায়।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পর শান্তিনিকেতনে ফিরে রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের শান্তিনিকেতন থেকে শেষ যাত্রার যে বিবরণ রচনা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ পাওয়া সম্ভবপর হয় নি। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত 'পিতৃদেবের মৃত্যু উপলক্ষে' শীর্ষক অসম্পূর্ণ রচনাটি এখানে মুদ্রিত হল।

জীবনের নানা পর্বে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা রথীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি পরিশেষে সংকলিত। শ্রীনিরঞ্জন সরকার চিঠিগুলির প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করে দিয়েছেন।

বাবাকে যেমন দেখেছি

আত্মপ্রকাশের নানা ক্ষেত্রে বাবার অবিসংবাদী প্রতিভা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা। আমার চাইতে যোগ্যতর অনেক ব্যক্তি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, এবং ভবিষ্যতে আরো অনেকে হয়তো করবেন। বাবা তাঁর নিজের বিষয়ে স্মৃতিকথা কিছু কিছু লিখেছেন, অন্তরঙ্গদের কাছে চিঠি লিখতে গিয়েও মনের কথা কিছু কিছু বলেছেন। একটা বিষয় লক্ষণীয়, বাবা তাঁর জীবনস্মৃতিতে সাল-তারিখের বা ঘটনার অনুবর্তন করতে যান নি, যা বলতে চেয়েছেন সে হল তাঁর অন্তর্জীবনের উন্মোচন। যে ক্ষেত্রে মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের প্রকাশই মুখ্য, সেখানে জীবনের মোটা মোটা ঘটনাবলি অনুধাবন করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সাধারণ মানুষের জীবন দৈনন্দিন ঘটনাচক্রে বাঁধা, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিদিন দৈনন্দিনের চৌহদ্দি অতিক্রম করতে থাকেন। প্রতিভার জগৎকে সব সময় বাস্তব জগতের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। সকল সৃজনধর্মী প্রতিভার বেলায়ই হয়তো এ কথা সত্য— কিন্তু বাবার বেলায় এ কথা যেন বিশেষভাবে সত্য। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুবিচিত্র। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক ঋষি। এই ধরনের বহুমুখী প্রতিভাকে সম্যক বিশ্লেষণ করার যত চেষ্টাই হোক-না কেন, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের সবটুকু রহস্য আয়ত্ত করা যায় না, কারণ সচরাচর আমরা মানুষকে বিচার করার জন্য যে মাপকাঠি ব্যবহার করে থাকি, এ ক্ষেত্রে তা অচল।

হৃদয়ের যে-সব সুকুমারবৃত্তিকে আমরা মনুষ্যচরিত্রের প্রকৃষ্ট লক্ষণ

বলে মনে করি, বাবার মধ্যে সেগুলি ছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু সব-কিছু মিলে তাঁর স্বভাব ছিল জটিল ও দুর্জ্ঞেয়। তাঁর সংবেদনশীল মনে এমন একটা সহজাত দ্বিধা-সংকোচের ভাব ছিল যে ঠিক করে বলা যেত না, কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার বিষয়ে তাঁর মন কখন কিভাবে প্রতিক্রিয়া করবে। তাঁর মন-মেজাজ কখন কেমন থাকবে, বুঝতে পারা সহজ ছিল না। কখনো কখনো দেখেছি, তাঁর তরুণ ভক্তদের মাঝখানে তিনি বসে আছেন, গাম্ভীর্যের মুখোশ কখন খসে গেছে, হাস্যে পরিহাসে তাঁদের সঙ্গে রসালাপ করছেন, যেন তিনি তাঁদেরই একজন। আবার যখন শম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করে নিজেকে নিজের মধ্যে সংবরণ করে নিতেন তখন তাঁর গহন মনের অতল স্তব্ধতার থৈ পাওয়া দুঃসাধ্য হত। মন যখন খুশি থাকত, তখন দেখেছি, শিশুদের মধ্যে তিনিও একজন শিশু ভোলানাথ। তাঁর মতো স্নেহপ্রবণ মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। আবার তাঁর মতো দুরধিগম্য, যুগপৎ ভয় ও শ্রদ্ধার পাত্র, কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার জীবনে দেখেছি বলে স্মরণ হয় না।

ঘন ঘন তাঁর মন-মেজাজ বদলাত বলে তাঁর সহচরদের পক্ষে তাঁর খেয়ালখুশির সঙ্গে তাল রেখে চলা খুবই কষ্টসাধ্য হত। আমার কেমন যেন মনে হয় বাবা তাঁর নিজের কাছেও নিজের অনেক চিন্তা-ভাবনা গোপন করতে চাইতেন। নিজের মন অনেক সময় তিনি নিজেই জানতেন না— সুতরাং অপরে জানবে কী করে? বাবার যাঁরা কাছের মানুষ, যাঁরা অন্তরঙ্গ, তাঁদের পক্ষেও ঠিক করে বলা মুশকিল হত কখন ক ভাবে কোন্ কাজ তিনি করবেন। কোথায় কেমন আচরণ করবেন। নিজের অসুখ-বিসুখ, খাওয়া-দাওয়া, নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার ব্যাপারে তাঁর এমন সংকোচ ছিল, এবং অপরে কী মনে করবে এই নিয়ে তিনি এত বেশি ভাবতেন যে, নিজের ইচ্ছাটুকু প্রকাশ করার জন্য তাঁকে নানা রকম ছলাকলার

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও
মহিমচন্দ্র ঠাকুর -সহ বালক রথীন্দ্রনাথ
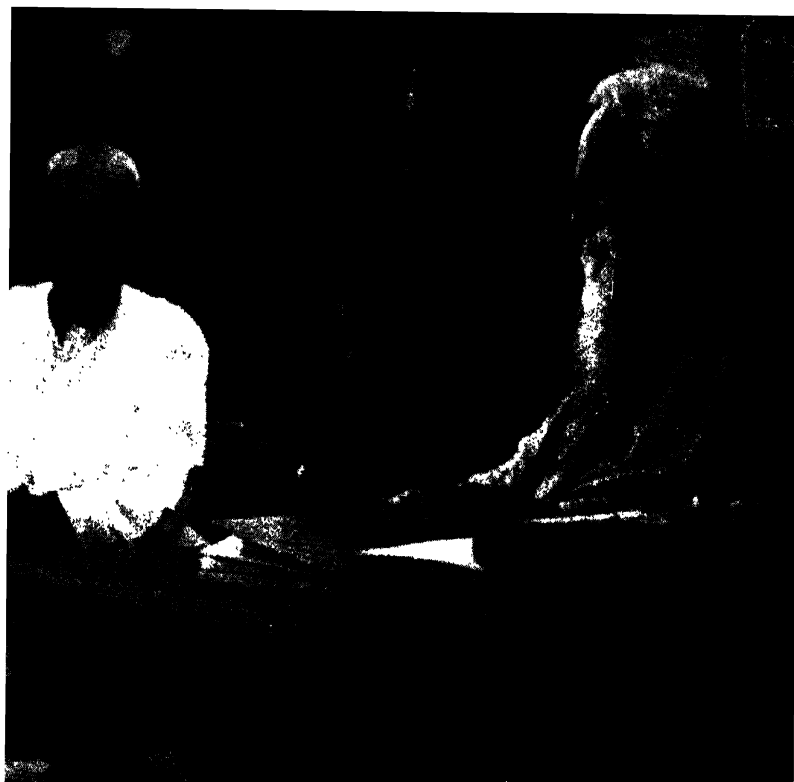
রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ

আশ্রয় নিতে হত। এমন অনেকদিন গেছে যখন এ-সব ব্যাপারে তাঁর ছেলেমানুষি দেখে প্রতিমা ও আমি কৌতুক বোধ করেছি।

আমার পিতামহ তাঁর এই সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সে তাঁর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ দেখে তিনি নিশ্চয় গৌরব অনুভব করে থাকবেন। বোধকরি সেই কারণেই বাবার প্রতি তাঁর একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল। আমাদের জোড়াসাঁকো-বাড়ির সবচেয়ে ভালো ভালো ঘর বাবার বসবাসের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। তাতেও যখন কুলোল না, তখন জোড়াসাঁকোর হাতার মধ্যে বাবার জন্যে আলাদা বাড়ি তৈরি করার খরচ মহর্ষি দিয়েছিলেন। লাল ইটের তৈরি বলে এ-বাড়ির নাম হয় লালবাড়ি। বাবা কিন্তু এক বাড়িতে বেশি দিন থাকা একেবারে পছন্দ করতেন না, ঘন ঘন বাসা বদলাতেন। শান্তিনিকেতনে এমন দশ-বিশটা বাড়ি আছে যেখানে কোনো-না-কোনো সময়ে বাবা থেকেছেন। সাবেক কালের বাড়ি ছেড়ে, নিজের পছন্দমতো নূতন বাড়ি তৈরি করতে পারবেন ভেবে, মহর্ষির কাছ থেকে টাকা পেয়ে বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন। হাতে-কলমে কাজ করে, আমার জ্যাঠতুতো দাদা নীতীন্দ্র স্থাপত্যবিদ্যায় কিঞ্চিৎ অধিকার অর্জন করেছিলেন। বাবা প্রস্তাব করলেন, বাড়ি হবে দোতলা এবং দুই তলাতেই থাকবে একটি করে প্রকাণ্ড হলঘর। তা হলে কাঠের তৈরি স্থানান্তরযোগ্য পার্টিশন খাটিয়ে হলঘরের মধ্যে যদৃচ্ছা ছোটো-বড়ো নানা আয়তনের কামরা বানানো যায়। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাড়ি তৈরি হয়ে গেল। আমরা যখন গৃহপ্রবেশ করতে যাব, দেখা গেল একতলা আর দোতলায় একটি করে প্রকাণ্ড হলঘর ঠিকই তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই দুই তলার মধ্যে যোগাযোগের সিঁড়িটাই নেই।

পিতামহ বাবার উপর জমিদারি-পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন

সত্য, কিন্তু খরচপত্র নিয়ন্ত্রণ করতেন তিনি নিজেই। এই হিসাবের ব্যাপারে দেখেছি তাঁর কঠোর নিয়মনিষ্ঠা। একসময় প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় দিনে বাবা হিসাবের খাতাপত্র নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে মহর্ষির সামনে হাজির হতেন ও গতমাসের জমাখরচের আনুপূর্বিক হিসাব পড়ে শোনাতেন। মহর্ষির স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ, হিসাব পড়ে শোনাবার সময় কোনো ভুলত্রুটি এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না, তিনি তখনই তা ধরে ফেলতেন ও জেরা করতেন। জবাব দিতে গিয়ে বাবাকে দস্তুরমতো গলদ্‌ঘর্ম হতে হত। শুনেছি মাসের দ্বিতীয় দিনটাকে বাবা খুব ভয় করতেন। স্কুলের ছেলেরা যেমন পরীক্ষা দিতে যায়, বাবা যেন তেমনি করে যেতেন মহর্ষির কাছে হিসাব দাখিল করতে। আমরা সব ছেলেমানুষেরা অবাক হয়ে ভাবতাম, আমাদের বাবা তাঁর বাবাকে এত ভয় পান কেন।

মহর্ষি জানতেন বাবা কবিতা লেখেন। তিনি যখন শুনলেন বাবা ভক্তিরসাশ্রিত অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন, একদিন বাবাকে ডেকে সেগুলি তাঁকে পড়ে শোনাতে বললেন। একটির পর একটি কবিতা বাবা পড়ে চললেন, আর মহর্ষি নিবিষ্ট হয়ে শুনতে লাগলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পড়া শেষ হয়ে গেলে বাবা যখন নৈবেদ্য থেকে একটি ভক্তিরসাশ্রিত গান গাইলেন, মহর্ষির চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। কবিতাগুলি পুস্তক-আকারে প্রকাশ করার জন্য তিনি তখনই বাবার হাতে টাকা তুলে দিলেন; সেই কবিতাগুলি একত্রে 'নৈবেদ্য' নামে বই হয়ে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনেকগুলি কবিতা এই নৈবেদ্য বইয়ের কবিতার অনুবাদ।

ছেলেমেয়েদের প্রতি বাবার আচরণে কঠোরতা ছিল না। তেমনি আবার অত্যধিক আদর দেওয়াও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। আমার তো মনে পড়ে না, বাবার হাতে আমরা কখনো দৈহিক শাস্তি পেয়েছি। মারধোর করা ছিল তাঁর প্রকৃতির বাইরে। ছেলেবেলা

থেকে আরম্ভ করে যুবা বয়সের সমস্ত বছর মিলিয়ে মাত্র তিনবার তাঁকে আমার উপর সত্যি সত্যি চটতে দেখেছি। ছোটো ছিলাম যখন, স্নান করাটা আমার কাছে বিভীষিকা বলে মনে হত। জোর করে ধরে শরীরটাকে আচ্ছা করে ঘষামাজা, আমার কাছে ছিল অত্যাচারের মতো। মা একদিন আমাকে স্নান করাতে না পেরে, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে বাবাকে আমার অবাধ্যতার কথা বলে দিলেন। বকুনি নেই, গালমন্দ নেই, বাবা দু-হাতে আমাকে ধরে উঠিয়ে দিলেন আলমারির মাথায়। এরপর থেকে আমাকে স্নান করানো নিয়ে মাকে আর বেগ পেতে হয় নি।

এর পরের ঘটনাটি ঘটেছিল শিলাইদহে। পরের দিন বিজয়া দশমী, প্রতিমা বিসর্জনের দিন। কে যেন আমাকে বলল, পদ্মার অপর পারে পাবনায় সেদিন নৌকাবাইচ হবে। ইছামতী যেখানে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে নাকি হাজার হাজার প্রদীপের আলো দিয়ে সাজানো শতাধিক ভাসানের নৌকা এসে জড়ো হয়। প্রতিমা বিসর্জন হবার একটু আগে শুরু হয় নৌকাবাইচ। এই প্রতিযোগিতায় যে-সব নৌকা যোগ দেয় তাদের চেহারা অনেকটা জেলেডিঙির মতো— সরু আর লম্বা। প্রত্যেক নৌকায় বিশজন করে দাঁড়ি। আমি তখন থাকি পদ্মার ধারে। মার কাছ থেকে যে পাঁচটাকা করে আমার মাসিক বরাদ্দ ছিল, তার প্রত্যেকটি পয়সা জমিয়ে, আমি এক ডিঙি কিনেছি নিজে। সুতরাং আমাকে পায় কে, আমার ধারণা আমি একজন ওস্তাদ মাঝি। এ হেন আমি কি নৌকাবাইচ না দেখে থাকতে পারি? আমি তো ম্যানেজারবাবুকে অতিষ্ঠ করে তুললাম, বললাম, ঘাটে আমাদের যে দুটো পানসি বাঁধা তার মধ্যে যেটি বড়ো তাই নিয়ে আমরা ভাসান ও বাইচ দেখতে যাব। এই শরৎকালে পদ্মা পাড়ি দেওয়া ছেলেখেলা নয়, দস্তুরমতো বিপজ্জনক ব্যাপার। বর্ষার শেষে নদী কানায় কানায় ভরা— যেমন গভীর

তেমনি খরস্রোতা। আর পদ্মার এপার থেকে ওপার তো প্রায় মাইল-সাতেকের ধাক্কা। তখন বুঝি নি যে আমাদের এই নৌকাযাত্রা প্রায় শেষযাত্রায় পর্যবসিত হতে চলেছিল। যাক, সে পরের কথা। বাবাকে বলতেই বাবা রাজি হয়ে গেলেন। দুঃসাহসিক কিছু কাজে আমার উৎসাহ দেখলে তিনি নিষেধ করতেন না, জানতেন এইভাবেই ছেলেরা তৈরি হয়। শুধু বলে দিলেন সব ব্যবস্থা যেন ঠিক রকম হয়। পরদিন ভোরবেলায় পানসি ছাড়ল, মাঝিমাল্লারা 'বদর বদর' বলে দাঁড় ফেলল।

স্রোতের সে কী ধার! পাবনা পৌঁছতেই সারাটা দিন লেগে গেল। দূর থেকে আমরা দেখতে পেলাম, ইছামতীর মোহানায় যেন দেয়ালির আলো জ্বলছে। আমার মামা ও ম্যানেজারবাবু সঙ্গে এসেছেন। তাঁরা বার বার বলতে লাগলেন, এবার ফিরে যাওয়া যাক, কারণ বাবা বলে দিয়েছেন যেন রাত্রের খাবার সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই আমরা বাড়ি ফিরি। আমি তখন নাছোড়বান্দা, হাল ধরে বসে আছি। ইছামতীর মুখে পৌঁছে দেখি, নৌকাবাইচ শুরু হল বলে। দুই সার বেঁধে একশোর উপর ডিঙি পাল্লা দেবার জন্য দাঁড়িয়েছে। হাজার হাজার লোকের উল্লাসধ্বনির মধ্য দিয়ে বাইচ শুরু হল। কোথায় লাগে এই বাইচের কাছে কেম্‌ব্রিজ-অক্সফোর্ডের বোট রেস্‌! পিছনে সূর্যাস্তের শেষ আভা যেন পশ্চাৎপট— সামনে খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো সরু পাতলা নৌকাগুলি বয়ে চলেছে অবিশ্বাস্য গতিতে। সে দৃশ্য আমি কখনো ভুলব না। বাংলা দেশের প্রাচীন অনেক ঐতিহ্যের সঙ্গে এইরকম নৌকাবাইচও সুদূর অতীতে লুপ্ত হয়ে গেছে। পরে শুনেছি, পাবনায় সে-ই নাকি শেষ নৌকা-বাইচ, পরে আর এই খেলা হয় নি।

নৌকাবাইচের পর ভাসানের পালা। একটির পর একটি প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেল। আমরা যখন উৎসব দেখতে মশগুল, লক্ষ্যও

করি নি আকাশে তখন ঘন কালো হয়ে মেঘ জমছে। পানসির মুখ ঘোরানো হল, শিলাইদহের ঘাট কোন্‌দিকে হবে আন্দাজ করে। ততক্ষণে অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে— মাঝিরা আর দিশা পায় না। তখনকার কালের রেওয়াজ মাফিক কয়েকজন বন্দুকধারী বরকন্দাজ আমাদের সঙ্গে এসেছিল। তারা মাঝে মাঝে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগল এই আশায় যে শিলাইদহের ঘাট থেকে তা হলে অন্য পাইক-বরকন্দাজরাও গুলি ছুঁড়বে এবং তা হলে সেই আওয়াজ শুনে আমরা বুঝতে পারব কোন্‌দিকে পানসি চালাতে হবে। সংকেত শেষপর্যন্ত কার্যকর হল, ওপার থেকে গুলির আওয়াজে জবাব পাওয়া গেল। রাত তখন প্রায় দুটো বেজে গেছে। আওয়াজ যেদিক থেকে আসছে, সেই দিক লক্ষ্য করে পানসি চলল অন্ধকার ভেদ করে। ঘাটে নেমে প্রথমেই দেখতে পেলাম, বাবা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় তাঁর ভ্রূকুঞ্চিত মুখের সামান্য একটুখানি দেখেই আমার বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। আমি কেন, দলের সবাই যে খুব ভয় পেয়েছে স্পষ্টই বোঝা গেল। বাবা কিন্তু কারো দিকে না তাকিয়ে, একটি কথাও না বলেই, কুঠিবাড়ির দিকে দ্রুতপদে ফিরে গেলেন। এই ঘটনার পরে যতদিন শিলাইদহে ছিলাম, বাবা এবিষয়ে উল্লেখমাত্র করেন নি, বকাঝকা তো দূরের কথা! আমার মতো ভুক্তভোগী অপরাধী আরো অনেকে বলতে পারবেন, এইরকম সময়ে বাবার নীরব তিরস্কার, শারীরিক শাস্তির চেয়ে কতগুণ কঠিন বলে মনে হত।

এর অনেক বছর বাদে, আমি যখন শান্তিনিকেতন, এরকম আর-একটা কাণ্ড ঘটে। তখনো শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন বিভাগের পত্তন হয় নি। সুরুল গাঁয়ের কাছাকাছি বলে, ওই-সব অঞ্চলের নামও ছিল সুরুল। ঠিক হল কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক ও কর্মীদের নিয়ে আমরা সুরুলে গিয়ে বনভোজন করব। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির

আমলে তৈরি জীর্ণপ্রায় বড়ো কুঠিতে আমাদের চড়ুইভাতির সব আয়োজন হয়েছে। এককালে এই বাড়ি নাকি নীলকর সাহেব জন চীপ-এর বসতবাড়ি ছিল। সারারাত ধরে প্রচুর হৈচৈ খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ করা গেল। শান্তিনিকেতনে যখন ফিরলাম মাস্টার-মশাইরা সবাই অনিদ্রার ক্লান্তিতে অবসন্ন, সকালবেলার ক্লাস নেবেন এমন তাঁদের অবস্থা নয়। কিন্তু বাবার কাছ থেকে ছুটি চাইতে সকলেরই সংকোচ। যে যার ঘরে চলে গেলেন, চোরের দায়ে ধরা পড়লাম আমি। যেহেতু বনভোজন হয়েছিল আমারই ব্যবস্থায়, সুতরাং আমাকেই আশ্রমের নিয়মভঙ্গের দায় নিতে হবে। মুখে একটু হাসি এনে, দুরুদুরু বক্ষে তো বাবার সামনে হাজির হলাম। বাবা শুধু বললেন, 'কেমন হল তোদের বনভোজন? খুব মজা করেছিস তো?' মনে মনে কত রকম অজুহাতের কথা ভেবে রেখে-ছিলাম, কিন্তু বাবার গলার স্বর শুনে সব যেন কোথায় উবে গেল— সুতরাং কোনো সাফাই না গেয়ে দ্রুত প্রস্থান! এরপর জ্ঞাতসারে এমন কিছু কখনো করি নি, যা বাবার বিরক্তির কারণ ঘটাতে পারে।

কবি ও লেখক হিসাবে বাবা যখন বিশ্ববিখ্যাত হলেন, তখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পোঁচেছেন। কিন্তু জগৎ-জোড়া খ্যাতি হবার আগেও তাঁর ভক্তের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেও কলকাতার অধিকাংশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর নিয়মিত ডাক পড়ত। তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হয়তো এই ছিল যে, তিনি কেবল সুপুরুষ ছিলেন না, সুকণ্ঠেরও অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার জন্য তাঁকে যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়েছে। একবার তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, সভাপতি স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সভায় তিলধারণের ঠাঁই ছিল না— লোকে লোকারণ্য। দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে গিয়ে গলার উপর অত্যাচার করতে হল। বক্তৃতার পর সমবেত শ্রে

'গান, গান' বলে বিস্তর চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। দেড়ঘণ্টা ধরে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দেবার পর, বাবার গান গাইবার মতো অবস্থা ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমবাবু স্বয়ং যখন অন্য সকলের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাবার গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি কী করে আর না বলেন। বাবার গান গাওয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ— যেমন সুরেলা গলা, তেমনি তার জোর। কিন্তু এবারকার অত্যাচারে গলা এমন জখম হল যে তা আর কখনো সম্পূর্ণ সেরে উঠল না। কিছুদিন হাওয়া-বদল ও বিশ্রাম নেবার জন্য বাবা সিমলা গেলেন, কিন্তু তাঁর সেই গানের গলা আর ফিরে পেলেন না।

পোশাক-পরিচ্ছদে বাবার বরাবরই বেশ রুচি ছিল। তরুণ বয়সে তিনি ধুতির উপর সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি পরতেন। গলায় ঝোলাতেন সিল্কের চাদর। এই বাঙালিবাবুর পোশাকে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখাত। লোকে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ করত। বাংলা দেশের বাইরে তিনি যখন বেড়াতে বেরোতেন, তাঁর পরনে থাকত ট্রাউজার, গলাবন্ধ লম্বা কোট, অথবা আচকান, আর মাথায় থাকত ছোট্ট একটা পাগড়ি। এই ভাঁজে ভাঁজে শেলাই-করা পাগড়ি ছিল নতুন জ্যাঠামশাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবিষ্কার। লোকে এর নাম দিয়েছিল 'পিরালি পাগড়ি'। এর অনেক বছর পরে বাবা আচকানের বদলে, ঢিলেঢালা লম্বা জোব্বা ধরলেন। কখনো কখনো একটি জোব্বার উপর আর-একটি জোব্বা চড়ানো হত। মাথায় পরতেন নরম মখমলের উঁচু গোছের টুপি। রঙিন কাপড়ে বাবার কোনো বিরাগ ছিল না— তাঁর পছন্দ ছিল ফিকে বাদামি বা কমলা রঙ। পরিণত বয়সে যাঁরা বাবাকে দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয় মনে আছে এই-সব হালকা রঙের পোশাকে বাবাকে কী সুন্দর মানাত।

এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ছে। বাবা ও গান্ধিজির মধ্যে বরাবর একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল, অথচ বাহ্যত দুজনের মধ্যে

যেন আকাশ-পাতাল তফাত। কোথায় কটিবাসপরিহিত সন্ন্যাসী, আর কোথায় রঙিন জোব্বায় সুসজ্জিত কবি। দুজনের মধ্যে এই বৈষম্য বহু লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকেছে সন্দেহ নেই। পোশাকে পরিচ্ছদে বাবার বিলাসী রুচি নিয়ে অনেকে বক্রোক্তি করেছেন, এমনও শুনেছি। কিন্তু একটা কথা তাঁদের জানা ছিল না, বাবার পোশাক-পরিচ্ছদ যে-সব কাপড়ে তৈরি হত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার দাম বেশি ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটা গরিমা ছিল যে নিতান্ত সাদাসিধে পোশাকেও তাঁকে দেখাত রাজার মতো। আবার বেশ মূল্যবান পোশাকও তাঁর অঙ্গে উঠলে মনে হত যেন নিতান্তই সাদাসিধে। গান্ধিজির কটিবাস ছিল অন্নহীন বস্ত্রহীন এই দরিদ্র দেশের প্রতীক। এই প্রতীকের যে একটি গভীর তাৎপর্য ছিল তাতে সংশয় নেই। কিন্তু তা বলে বাবার সুরুচিসম্মত পরিচ্ছদের কোনো তাৎপর্য ছিল না এমন নয়। গান্ধিজি নিজের জীবন যাপনে যে আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন, তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে একটা মাত্রাতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ভাব এসে গেছে। এটা স্বয়ং গান্ধিজির অভিপ্রেত ছিল কি না জানি না, তবে এমনটি ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাবা এরকম বৈরাগ্যসাধনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। বাবা হয়তো ভাবতেন— আমাদের গরিব দেশে, যেখানে অধিকাংশ লোক বঞ্চিত ও বুভুক্ষিত, সেখানে ত্যাগের আদর্শ কৃত্রিম উপায়ে তুলে ধরার কোনো অর্থ হয় না। বরঞ্চ উচিত, তাবৎ সভ্যজগৎ জীবনধারণের ক্ষেত্রে যা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে, সেই-সব দিকে মানুষের রুচিকে প্রবর্তিত করা।

বাবা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বেশির ভাগ সময়ে যেমনি তীব্র ও অন্যায় সমালোচনার আঘাত সয়েছেন, তেমন খুব কম লেখককেই সইতে হয়েছে। এ-সব আক্রমণের অধিকাংশই ছিল ব্যক্তিগত-বিদ্বেষ-প্রসূত। যাকে সাহিত্যিক সমালোচনা বলে এ-সব সে ধরনের

ছিল না। অনেকক্ষেত্রেই তা ছিল নিছক কুৎসা। কোনো কোনো বাংলা কাগজে বা পত্রিকায় এই-সব কদর্য গালাগালি নিয়মিত প্রকাশ করার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, তাতে সে-সব কাগজের কাটতি হত। সম্পাদকেরা বুঝেছিলেন, বাবার বিরুদ্ধে কটূকাটব্য করলে বেশ অর্থাগম হয়। এর পিছনে আরো একটা গূঢ় কারণ ছিল। দেশের বেশ বড়ো-একটা অংশের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন নন। তাঁর জন্ম অভিজাত পরিবারে, তাঁর লেখার ধরন ও ভাষা তাঁর নিজস্ব, অতীত কিংবা বর্তমানের কোনো লেখকের সঙ্গে তাঁর মিল নেই— তিনি যেন স্বয়ম্ভু। তা ছাড়া হিন্দুসমাজের বেড়া-ভাঙা প্রখ্যাত ব্রাহ্ম সংস্কারকের ছেলে তিনি, সুতরাং তিনি সমাজদ্রোহী। তরুণ বাঙালি পাঠকদের মনে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিলেন— বোধকরি এই-সব কারণে উক্ত সমালোচকেরা তা ক্ষুণ্ণ করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, নিন্দুকের দলে কেবল যে অপ্রধান লেখকেরাই ছিলেন তা নয়, এমন সব সাহিত্যিকগোষ্ঠীও ছিল যার নেতৃস্বরূপ ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও চিত্তরঞ্জন দাশের মতো নামজাদা ব্যক্তি। এই বিরুদ্ধতা বাবার মনে যে দাগ কাটে নি, এমন কথা বলা ভুল হবে। বাবার সবচেয়ে বেশি বেজেছিল, যাঁদের তিনি মিত্রস্থানীয় বলে জেনে এসেছেন যাঁদের সাহিত্যজীবনের প্রত্যুষে তিনি সঙ্গ ও উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁরাই তাঁর বিরুদ্ধে যখন লেখনী ধরলেন। বাবা এ-সব নিন্দাকুৎসার বিরুদ্ধে কোনো জবাব দিতে যান নি। কেবল 'নিন্দুকের প্রতি' কবিতায় তাঁর মনের কথা একটুখানি ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু তাতেও কোনো উষ্মা ছিল না, তিরস্কার ছিল না।

তাঁর সমতুল্য প্রতিভাশালী অন্যান্য সৃষ্টিশীল লেখকদের মতো সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনিও আজীবন নিঃসঙ্গ ছিলেন। তরুণ ভক্তদের মধ্যে অনেকে তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তাঁদের

ভক্তির অর্ঘ্যই পেয়েছেন ; চিত্তের ক্ষেত্রে সমানধর্মার সঙ্গ-সাহচর্য তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি। কিন্তু তাঁর সেই একক জীবনে এরকম ভক্তি-শ্রদ্ধার মূল্য ছিল অনেকখানি। এই-সব তরুণ ভক্তদের মধ্যে যাঁদের নাম আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে, তাঁরা হলেন : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি, হেমেন্দ্র-কুমার রায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, অমল হোম প্রভৃতি। এই-সব তরুণ কবি ও লেখকেরা প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সুকিয়া স্ট্রীটের এক বাড়িতে জমায়েত হতেন। এই বাড়িতেই কান্তিক প্রেসে 'ভারতী' পত্রিকা ছাপা হত। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় তার তত্ত্বাবধান করতেন। এঁরা সত্যই ছিলেন বাবার একান্ত অনুরাগী ভক্ত। কেউ যদি বাবার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতেন, এঁরা রুখে দাঁড়াতেন, যেন বাবার সম্মান রক্ষার দায়িত্ব কেবল তাঁদের উপরেই ন্যস্ত।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষা নিয়ে বাবা যে-পরীক্ষণের পত্তন করেছিলেন, তার জন্যে তাঁকে যে কী পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছিল, সে কথা খুব কম লোকেই জানত বা বুঝত। বিদ্যালয়ের কাজ তো শুরু হল, কিন্তু ছাত্র সংগ্রহ করা সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে-সব ছাত্র এল, তাদের অনেকে ছিল, যাকে বলে, বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো দুরন্ত ছেলে। বেশ-কিছু লোকের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি ছিল অসীম অবজ্ঞা। বিদ্যালয়ে বাবা যে-সমস্ত নূতন প্রথা-পদ্ধতি প্রবর্তিত করলেন, তা নিয়ে তাঁরা হাসাহাসি করতেন। এ বিদ্যালয় যে কেবল দুরন্ত ছেলেদের শায়েস্তা করার সংশোধনাগার নয়, এই বোধ জাগ্রত হয় অনেক পরে। তার উপর ছিল বিদ্যালয়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিরাগ ও সন্দেহ। তাঁদের ধারণা হয়েছিল, এই প্রতিষ্ঠান 'স্বদেশী' ও রাজদ্রোহ প্রচারের কেন্দ্র। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা

কোনো কোনো রাজকর্মচারীর কাছে গোপন সার্কুলার পাঠিয়ে, সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ছেলে না পাঠান। বৈষয়িক দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা চলে যে এইরকম প্রচেষ্টায় নামতে যাওয়া তখনকার অবস্থায় বাবার পক্ষে নিতান্তই অবিবেচনার কাজ হয়েছিল। সে সময় নিজের পরিবার প্রতিপালনের দিক থেকেও তাঁর আয় যথেষ্ট ছিল না, তা ছাড়া কুষ্টিয়ার ব্যাবসা ফেল পড়ায় বাজারে তখন প্রচুর দেনা। বিষয়সম্পত্তি, এমন-কি আমার মার গহনা পর্যন্ত বিক্রি করে তাঁকে বিদ্যালয়ের খরচ নির্বাহ করতে হয়েছে। বিয়ের সময়ে যৌতুকস্বরূপ তিনি যে সোনার পকেট-ঘড়ি ও চেন পেয়েছিলেন, সেটিও জনৈক বন্ধুর কাছে বিক্রয় করতে হয়। আমাদের শৈশবের অনেক স্মৃতি এই ঘড়ির সঙ্গে বিজড়িত। এই ঘড়ির বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে বলেছি।

বিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থকষ্ট বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাবা তাঁর বন্ধু লোকেন পালিতের বাবা স্যর তারকনাথ পালিতের কাছে হাত পাতলেন কিছু ঋণ পাবার উদ্দেশ্যে। পালিত মহাশয়ের জীবৎকালে এই ঋণ পরিশোধ করা যায় নি। মৃত্যুকালে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন, ফলে বাবাকে দেওয়া এই ঋণের টাকাটাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য হল। এই ঋণ নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সরস্বতীর প্রসাদ তিনি প্রভূত পরিমাণেই পেয়েছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মী তাঁকে কৃপা করেন নি। দুরদৃষ্ট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। ১৯১৬-১৭ সালে আমেরিকায় বাবার যে বক্তৃতা-সফর হয়, তার ফলে অর্থাগম হয়েছিল প্রচুর। এই সফরের ব্যাপারে বাবার ক্লান্তি ছিল না, তাঁর ধারণা হয়েছিল এ থেকে যে টাকা আসবে, তা দিয়ে শান্তিনিকেতনকে তিনি মনের মতন গড়ে তুলতে পারবেন, সব ধার শোধ হয়ে যাবে এবং আর কখনো কারো কাছে হাত পাততে হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ ক্ষেত্রেও তাঁর সমস্ত

আশা-আকাঙ্ক্ষা ভূমিসাৎ করে দিল। যে সংস্থা এই বক্তৃতা-সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন, সফরের শেষ দিকে নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করলেন। বাবার পাওনা হয়েছিল, বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। পিয়ার্সন সাহেব বহু কষ্টে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছিলেন, তা কয়েক হাজারের বেশি হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেনা শোধ করতেই এই টাকাটা খরচ হয়ে গিয়েছিল, উদ্‌বৃত্ত আর কিছু ছিল না।

ইয়োরোপে যখন বাবার বইয়ের খুবই কাটতি তখন আশা করা গিয়েছিল, লক্ষ্মী ঠাকরুন এবার হয়তো মুখ তুলে চাইবেন। কিন্তু এমনি কপাল, যখন তাঁর নাম বিশ্ববিখ্যাত হল, জগৎজোড়া খ্যাতি জুটল ঠিক সেই সময়ে লাগল প্রথম মহাযুদ্ধ। সুতরাং রয়্যালটির টাকা সব আর হাতে এল না।

বাবাকে প্রায়ই বেরোতে হত ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। ১৯২০ সালে যখন বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় তিনি আমেরিকায় গেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সেবার একটা বিধিমতো চেষ্টা হয়েছিল টাকা তোলার জন্য।

মিসেস উইলার্ড স্ট্রেট (পরে ডরোথি এল্‌ম্‌হর্স্ট) ও মিস্টার মরগেনথো (সিনিয়র)-র চেষ্টায়, ওয়াল্‌ স্ট্রীটের বেশ কয়েকজন লক্ষপতি চাঁদার খাতায় মোটা অঙ্ক লিখে সই করেছিলেন বলে শোনা যায়। কিছুকাল আগেও মরগেনথো ছিলেন তুরস্কে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত— সুতরাং শাসকমহলে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি ছিল। তা ছাড়া ওয়াল্‌ স্ট্রীটের সঙ্গেও তাঁর অনেক কাজ-কারবার ছিল। অর্থসংগ্রহের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের বাড়িতে প্রকাণ্ড এক ভোজ-সভার আয়োজন করেন, শতাধিক লক্ষপতি বন্ধুবান্ধব আমন্ত্রিত হলেন। শুনেছিলাম এই-সব চেষ্টার এলে বেশ কয়েক লক্ষ ডলার নিয়ে আমরা দেশে ফিরতে পারব। শেষ পর্যন্ত যা হাতে এল তা কয়েক হাজার ডলার মাত্র।

বাবা যখন দেশে ফিরলেন, মন তাঁর ভেঙে গেছে। নিউ ইয়র্কের হট্টগোলের মধ্যে কেবলমাত্র অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় দীর্ঘকাল হোটেলে বসবাস তাঁর বিন্দুমাত্র ভালো লাগে নি। তাঁর সমস্ত চিত্ত গ্লানিতে ভরে গিয়েছিল। এই সময়ে অ্যান্‌ড্রুজকে লেখা চিঠিত্রে তাঁর গভীর মনোবেদনার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার পক্ষেও এ অভিজ্ঞতা সুখকর হয় নি। ভিক্ষা চাওয়ার মধ্যে যে আত্মগ্লানি ও লাঞ্ছনা আছে, বাবা সে-সমস্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন বিদ্যালয়ের খাতিরে ও আমার নির্বন্ধাতিশয়ে। পরে শুনেছিলাম একেবারে শেষ মুহূর্তে ওয়াল্ স্ট্রীটের কুবেরের ভাণ্ডারে কুলুপ পড়েছিল ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে। ব্রিটিশ সরকার নাকি এমন আভাস দিয়েছিলেন যে, ভারতের বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আমেরিকা যদি টাকা ঢালে, তা হলে তা তাঁদের বিরক্তির কারণ হবে।

প্রতিষ্ঠানের জন্য বাবাকে বাধ্য হয়ে এখান থেকে ওখান থেকে টাকা চাইতে হয়েছে, কিন্তু বিত্তশালীদের কাছে হাত পাততে, বাবার বরাবরই একটা গভীর সংকোচ ছিল। যে মুহূর্তে তাঁর একটি কথার অপেক্ষা, সেই মুহূর্তে কিছুতেই তিনি যেন টাকার কথা বলতে পারতেন না। জেনেভায় থাকাকালে একবার বোম্বাইয়ের একজন বিত্তশালী বন্ধুর মধ্যস্থতায় বরোদার গাইকোয়াড়ের সঙ্গে বাবার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। কথা হল, বাবা তাঁর কাছে একটা মোটারকম দান চাইবেন। বন্ধু বললেন, গাইকোয়াড়ের সঙ্গে লজান্-এ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং তিনি বাবার কাজের সম্বন্ধে আগ্রহশীল দেখে, এ বিষয়ে কিছু আভাসও তাঁকে দিয়ে রেখেছেন। বাবা যদি গাইকোয়াড়কে একটিবার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করেন ও কথাটা উত্থাপন করেন, তা হলে এমন একটা মোটা অঙ্কের দান বরোদার কাছ থেকে পাওয়া যাবে, যাতে নাকি শান্তিনিকেতনের খরচপত্রের

বিষয়ে তাঁকে আর দুর্ভাবনা ভোগ করতে হবে না, ভিক্ষাবৃত্তির অবসান ঘটবে। আমি লজান্-এ গিয়ে বাবার হয়ে মহারাজাকে জেনেভায় আমাদের হোটেলে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ করে এলাম। লাঞ্চ-টেবিলে আলাপ বেশ জমে উঠেছে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বাবা ও মহারাজার কথাবার্তা চলছে। আমি ও আমার বোম্বাইয়ের সেই বন্ধু ক্রমাগত উসখুস করছি, কিছুতে আর আসল কথাটুকু পাড়বার সুযোগ পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত বাবা আমাদের মুখচোখের অবস্থা দেখে নিতান্ত করুণাপরবশ হয়ে মহারাজার কাছে তাঁর পশ্চিমে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন, আর বললেন, গাইকোয়াড় যদি-বা তাঁকে অর্থসাহায্য করতে মনস্থ করেন, তা হলে যেন মনে করেন টাকাটা একপ্রকার জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। বাবার মুখে এই কথা শুনে বন্ধু টেবিলের তলায় আমার পায়ে পা ঠেকিয়ে ইশারা করলেন, ভাবখানা এই 'দেখলে তো, কর্তার ব্যাপারখানা !' মহারাজা বাবার কথা শুনে একটি কথাও বললেন না ; বিদায় নিয়ে যখন চলে গেলেন, অর্থসাহায্যের কোনো কথা তুললেন না।

শেষ পর্যন্ত মহাত্মাজিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন, বাবার মতো কবিমানুষের পক্ষে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো, কি গভীর দুঃখের বিষয়। ১৯৩৬ সালে বাবা গেছেন দিল্লি, উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য অভিনয় করিয়ে বিশ্বভারতীর সাহায্যার্থে টাকা তোলা। সে সময় গান্ধিজিও দিল্লিতে ছিলেন। তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বিশ্বভারতীর তহবিলে এমন কী ঘাটতি, যার জন্যে এই পরিণত বয়সে বাবাকে এত কষ্ট সইতে হচ্ছে। বাবা দিল্লি ছাড়বার আগে, মহাত্মাজি তাঁর হাতে বিশ্বভারতীর ঋণশোধের জন্য যত টাকার দরকার, সেই অঙ্কের একটি চেক তুলে দিলেন। টাকাটা কোনো ভক্তের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। চেক

বাবার হাতে দিয়ে গান্ধিজি বললেন, যেন আর টাকার ধান্দায় বাবাকে ঘুরে বেড়াতে না হয়।

মহাত্মাজির কাছ থেকে এই টাকা অপ্রত্যাশিতভাবে পেয়ে আমাদের সকলের মনে তো আনন্দ ধরে না। কিন্তু বাবার মুখ দেখে মনে হল, কেমন যেন বিমর্ষ। কেন যে তাঁর মন খারাপ বুঝতে দেরি হল না। গান্ধিজির দেওয়া অর্থে সদ্য অর্থকষ্টের একটা উপশম ঘটল, কিন্তু বিনিময়ে গান্ধিজি বাবাকে দিয়ে যে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিলেন, বাবার পক্ষে তা হল খুবই কষ্টের। অভিনয়ের দলবল নিয়ে তিনি যখন বেরোতেন, শারীরিক কষ্ট যথেষ্ট হত সন্দেহ নেই, কিন্তু নৃত্যে গানে রূপে রসে তাঁর সৃষ্ট নাট্যবস্তু দর্শকদের সামনে নিজ হাতে তুলে দিতেন— সৃষ্টিকর্তার এই পরম আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা যেন তাঁর আত্মপ্রকাশকেই ক্ষুণ্ণ করা।

তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় সংগীত ও অভিনয়কে বাবা বরাবরই খুব বড়ো স্থান দিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল, আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়ে মানুষের সৌন্দর্যানুভূতিকে জাগ্রত করা— শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। তাতে মানুষ পূর্ণতার আস্বাদ পায় এবং শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই পূর্ণতার সাধনা— এখানেই ছিল তার নিহিতার্থ ও সত্যকার তাৎপর্য। শহর থেকে দূরে পল্লী-পরিবেশে যে প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছিলেন, এর বাণী এককালে বহুবিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল— গানে, ছবিতে, নৃত্যনাট্যে ও অভিনয়ে। যদি বলি বাংলা দেশ তথা সমগ্র ভারতে জনগণের রুচি উন্নত করায় শান্তিনিকেতনের দান নগণ্য নয়, তা হলে হয়তো সত্যের অপলাপ হবে না।

দুরদৃষ্ট আজীবন বাবার সঙ্গী হয়ে ঘুরেছে। কিন্তু অবিচলিত চিত্তে অদৃষ্টের পরিহাসকে তিনি মেনে নিতে পারতেন ; তিনি ছিলেন আশাবাদী, তাঁর মনে ছিল আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার। যে-সব দুঃখ

তিনি সয়েছেন, অর্থকষ্ট তো তার কাছে অকিঞ্চিৎকর। তাঁর সংসার-জীবনে প্রথম আঘাত এসেছিল যখন তাঁর বয়স মাত্র একচল্লিশ। সৃজনপ্রতিভার সূর্য যখন তাঁর মধ্যগগনে, সেই সময়ে মায়ের মৃত্যু হল, পাঁচটি সন্তান নিয়ে তিনি যেন অকূল পাথারে পড়লেন। অবশ্য আমার তুই বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু ছোটো ভাইটির বয়স তখন মাত্র বছর সাতেক।

এই সময়ে বাবার তুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, অন্য লোক হলে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারত কিনা সন্দেহ। নিজের ছেলে-মেয়েদের তো বটেই, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শতাধিক ছেলেদের মানুষ করার দায়িত্ব তখন তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন। কিন্তু তা হলে কি হয়, আরও আঘাত তাঁকে সইতে হল। মায়ের মৃত্যুর পর একে একে চলে গেলেন আমার পিতামহ, আমার তুই বোন ও ছোটো ভাই শমী। আমার তুই জ্যাঠতুতো দাদা বলেন্দ্র ও নীতীন্দ্রকে বাবা নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন। এঁরাও মারা গেলেন অকালে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যে-তুজন তাঁর কাজের সবচেয়ে বড়ো সঙ্গী ও সহায় ছিলেন, সেই তরুণ কবি সতীশচন্দ্র রায় ও প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ মোহিতচন্দ্র সেন অল্পকালের মধ্যে পর পর মারা গেলেন। মৃত্যুশোকে ও অর্থকষ্টে তিনি যখন বিপর্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে তুরারোগ্য অর্শব্যাধিতে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। এই-সব সময়ে তুঃখ বহন করবার যে অসীম ক্ষমতা ও শক্তি তাঁর মধ্যে দেখেছি, তার তুলনা বিরল। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, তাঁর চিত্তের স্থৈর্য একদিনের জন্যও শিথিল হয় নি, তাঁর সৃষ্টির কাজে একদিনের জন্যও ছেদ পড়ে নি। বরঞ্চ তুঃখে শোকে তাঁর রচনায় একটা যেন গভীরতর তাৎপর্য এনে দিয়েছিল।

বাবার কর্মশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে জন্মেছিলেন। ছেলেবেলায় আমার সেজো জ্যাঠামশায়ের

তত্ত্বাবধানে যে শরীরচর্চার ব্যবস্থা ছিল, তাতে বাবার বিধিদত্ত স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। অন্যান্য ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে এক পেশাদার পালোয়ানের কাছে তিনি কুস্তিও শিখতেন। এই-সব কারণে যুবা বয়সে বাবার স্বাস্থ্য ছিল দেখবার মতো। যেখানেই যেতেন তাঁর দেহের শ্রী ও মুখের লাবণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। যৌবনে তিনি তাঁর নরম দাড়ি সযত্নে ছেঁটে রাখতেন, গুচ্ছ গুচ্ছ অলকে তাঁর মাথার চুল থাকত সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। পরে যখন দাড়ি লম্বা হল ও আগুল্‌ফ-লম্বিত ঢিলেঢালা জোব্বা হল তাঁর পরিধেয়, সেই সময়ে পশ্চিমদেশে ঘুরে বেড়াবার সময় কতবার শুনেছি— 'ঠিক যেন যিশুখ্রীস্ট !'

অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সেও এক অর্শের কষ্ট ছাড়া তাঁর শরীরে ব্যারামের কোনো উপসর্গ দেখি নি। ১৯১২ সালে অস্ত্রোপচারের ফলে অর্শ থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন। শেষ বয়সে জরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত তিনি একপ্রকার পূর্ণস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দিন শুরু হত ভোর চারটে থেকে— আধো-আলো-অন্ধকারে। লেখার টেবিলে বসার আগে আধঘণ্টা কিংবা তার চেয়েও কিছু বেশি সময় তিনি চুপ করে বসে থাকতেন যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে। প্রাতরাশের সময় সঙ্গে দু-চারজন লোক না থাকলে তাঁর মনখারাপ হয়ে যেত। এই প্রাতরাশের ব্যাপারটা হত এত সকাল-সকাল যে, যাঁদের প্রাতরাশে যোগ দেবার কথা তাঁরা প্রায়ই যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারতেন না। এরকম ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে অপেক্ষা করতেন। এই সময়টাতে বাবা থাকতেন বেশ খোশমেজাজে— নানা রকম হাসিতামাশা গল্পগুজবে সবাইকে মাত করে রাখতেন।

আমার খুবই আশ্চর্য লাগে, কি করে তিনি, লেখার কাজ নিয়ে যখন ব্যস্ত, তখনও লোকজনদের সঙ্গে সমানে দেখাসাক্ষাৎ ও তাঁদের আপ্যায়ন করে চলতেন। তাঁর লেখার অভ্যাসটাও ছিল বিচিত্র—

অনেক সময় একই সঙ্গে কবিতা, গান, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখে চলেছেন— এমন হয়েছে। অতিথিদের উৎপাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর সেক্রেটারিদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। অতিথি, সে যে-কেউই হোন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য যা-ই থাক্‌-না কেন, বাবা তাঁকে বসিয়ে রাখা পছন্দ করতেন না। সেক্রেটারিরা অনেক সময় এজন্য তিরস্কৃত হতেন। বাবা দিনের বেলা কখনও বিশ্রাম করতেন না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, বাইরে যখন আগুনে হাওয়ার হলকা বইছে, তিনি সমস্ত দরজা জানালা খুলে রেখে নির্বিকারচিত্তে নিবিষ্ট মনে তাঁর লেখাপড়ার কাজ করে চলেছেন— এ দৃশ্য আমরা নিত্য দেখেছি। বই পড়ার ব্যাপারটা সচরাচর রাত্রে হত। এজন্য সময়ের অকুলান কখনো ঘটত না, কারণ তিনি শুতে যেতেন বেশ রাত করে। চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ঘুম তাঁর পর্যাপ্ত ছিল। অন্যান্য নানা কাজ, অতিথিসৎকার, ইত্যাদির পরেও যে তিনি এত অজস্র লিখতে পারতেন, এর কারণ আর কিছুই নয়, মনকে অভিনিবিষ্ট করার অসাধারণ ক্ষমতা। ভাবনাচিন্তার খেই তিনি কিছুতেই যেন হারাতেন না। অতিথিসমাগম হয়েছে, কবিতা লেখা মুলতুবি রেখে, ঘণ্টাখানেক অতিথির সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ সেরে তিনি আবার রচনায় হাত দিতেন, যেন কোথাও কোনো ছেদ পড়ে নি। অভ্যস্ত পরিবেশের বাইরে গেলেও তাঁকে কখনো বিচলিত হতে দেখি নি। তাঁর কবিতার নীচে স্থান ও তারিখ যে-সব উল্লেখ আছে তার থেকে বোঝা যায়, বহু বিচিত্র ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি কবিতা রচনা করতে পারতেন। তাঁর ক্লান্তি অপনোদনের এক উপায় ছিল গান লেখা ও সেই গানে সুর দেওয়া। শেষ বয়সে গানের স্থান কতকটা নিয়েছিল ছবি-আঁকা।

আমার কর্তাদাদামহাশয় দ্বারকানাথ ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে যখন বিলাত গিয়েছিলেন, সঙ্গী ছিলেন তাঁর এক আত্মীয় নবীনবাবু। ইনি দ্বারকানাথের সেক্রেটারির মতন কাজ করতেন। দেশে নবীনবাবু

চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, বিলাতে কর্তার কাজকর্ম সামলানো তাঁর পক্ষে প্রায়ই কেমন দুরূহ হত— বাবুমশায়ের খেয়ালখুশির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই— 'Babu often changes his mind'। আমাদের পরিবারে নবীনবাবুর এই উক্তি প্রায় কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁচেছিল। তার অন্যতম কারণ এই যে নবীনবাবুর এই উক্তি প্রিন্সের কনিষ্ঠ পৌত্রের বেলায় যেন আরও লাগসই হয়েছিল। হঠাৎ কোনো ব্যবস্থা পালটে দিয়ে বাবা নিজের সাফাই দেবার জন্য প্রতিমাকে বলতেন, 'দেখ বউমা, Babu changes his mind'। আমরা অবশ্য তাঁর মতিগতির বিষয়ে খানিকটা ওয়াকিবহাল ছিলাম —যদিও এজন্য আমাদের কম ভুগতে হয় নি। এ নিয়ে অনেক মন-কষাকষি হয়েছে এমন-কি মাঝে মাঝে তো রীতিমতো বিপদে পড়তে হয়েছে বাবার এই খেয়ালিপনার দরুন। বাবার কল্পনাপ্রবণ মন কোনো কিছুকেই চরম বলে মেনে নিতে পারত না, বরঞ্চ একটা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে এলেই, তিনি সেটা পালটে দেবার জন্য অস্থির হয়ে কোনো একটা অজুহাত খুঁজে বের করতেন। স্থাণু অবস্থা তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল। নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, ঘন ঘন বাসস্থান, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বদলানোর মধ্যে, এমন-কি তাঁর নানাবিধ রচনার মধ্যেও এই পরিবর্তনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে তাঁর মনটা ছিল বিপ্লবধর্মী— তবে প্রবণতা ছিল গড়বার দিকে, ভাঙবার দিকে নয়। সাহিত্যে, ধর্মচিন্তায়, সামাজিক প্রথায়, শিক্ষায়, রাজনীতিতে— যা-কিছু বিচারসহ না হয়েও সর্বজনস্বীকৃত, তার বিরুদ্ধে তিনি অকুতোভয়ে দাঁড়িয়েছেন, তার মিথ্যার মুখোশ কঠোর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে তবে তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। অপর পক্ষে, তিনি বিকল্পে সর্বজনগ্রাহ্য কী ব্যবস্থা হতে পারে তার কথা বিশদভাবে বলেছেন। আর কেউ সাহস করে কাজে ঝাঁপ দিয়ে না পড়লেও, নিজে সর্বদা এগিয়ে এসেছেন। এই যে প্রচলিত রীতি ও সংস্কারের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নূতনতর আদর্শ ও ধারণা নিয়ে পরীক্ষা— এ ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

তাঁর মনের আশ্চর্য প্রাণশক্তি আমাদের বারবার বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। বৃদ্ধবয়সে লোকে যখন অভ্যস্ত খাতে গা ভাসিয়ে চলতে চায়, ঠিক সেই সময় সাহিত্যের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি দুঃসাহসিক পরীক্ষায় রত হয়েছেন ও নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। যখন তিনি কথার সঙ্গে কথা মিলিয়ে কাব্যরচনার সংকীর্ণ রাস্তা ছেড়ে বেড়াভাঙা ছন্দের দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে পা দিলেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর। সেই সময়কার লেখা কিছু কিছু গল্পে তিনি এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যাকে মনোবিকলনতত্ত্বের ভাষায় বলা চলে যৌনসমস্যা। হয়তো এ-সব গল্প পড়ে কোনো কোনো রক্ষণশীল পাঠকের সুকুমার মনে আঘাতও লেগে থাকবে। কবিতার দিক থেকে যা তাঁর শেষ রচনা সে-সব তিনি নিজের হাতে লিখে যেতে পারেন নি। তখন তাঁর দৃষ্টি ক্ষীণ, তিনি অসুস্থ ও শয্যাগত। কবিতার প্রেরণা যখন এসেছে, মুখে মুখে রচনা করেছেন— তাঁর সেই মুখের কথা লিখে নিয়েছেন সেবক-সেবিকাদের কেউ কেউ। এই-সব রচনাতেও দেখি কবিতার রূপ নিয়ে, কত রকম পরীক্ষা।

কোনো জীবনীই তাঁর জীবনের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারবে বলে তো মনে হয় না, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল যেমন বিরাট তেমনি জটিল। অন্যদিকে আবার গানের সুরে যেমন মীড়, বীণার তারে যেমন ঝংকার, তেমনি মধুর ছিল তাঁর জীবনের ব্যঞ্জনা। সমানধর্মা ও সমানুভূতিবিশিষ্ট কেউ যদি কখনো কলম ধরেন, তা হলে হয়তো তাঁর বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন। বস্তুত তাঁর নিজের রচনাই তাঁর জীবনের প্রকৃষ্ট ভাষ্য, সেখানেই তিনি সত্যি সত্যি আত্মপ্রকাশ করে গেছেন। তাঁর একটি কবিতায় তিনি সে কথা বলেও গেছেন :

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।
মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

পল্লীর উন্নতি

যৌবনের প্রারম্ভেই আমার পিতা মহর্ষিদেবের কাছ থেকে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ একটি কার্যভার পেলেন। মহর্ষি আদেশ করলেন তাঁকে জমিদারি চালনা করতে হবে। সে সময় জমিদারি সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল; সেগুলি অনেক জায়গায় ছড়ানো— বাংলায় ছিল তিনটি পরগনা তিন বিভিন্ন জেলায়; পাবনায় শাহাজাদপুর, রাজশাহিতে কালীগ্রাম ও নদিয়াতে বিরাহিমপুর। এ ছাড়া উড়িষ্যায় ছিল আরও তিনটি ছোটো ছোটো জমিদারি।

এই কাজের ভার পেয়ে বাবাকে কলকাতা ছাড়তে হল। তিনি চলে গেলেন শিলাইদহে। শিলাইদহে ছিল বিরাহিমপুর পরগনার সদর কাছারি। কাজের সুবিধার জন্য বাবা শিলাইদহে তাঁর প্রধান কার্যক্ষেত্র করলেন। সেখান থেকে শাহাজাদপুর ও কালীগ্রামে নদী-পথে সহজেই যাওয়া যায়।

শিলাইদহ পদ্মানদীর ধারে, সেখানে থাকত 'পদ্মা' বোট। বাবা এই বোটে করে কুষ্টিয়া, কুমারখালি, শাহাজাদপুর, পতিসর ও অন্যান্য যে-সব জায়গায় আমাদের কাছারি ছিল, যাতায়াত করতেন।

বাংলা দেশে নদীর অভাব নেই, জলপথে প্রায় সব স্থানেই যাওয়া যায়। বোটে করে খাল বিল নদী বেয়ে ঘুরতে বাবা ভালোবাসতেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের তাঁর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল দেশকে ভালো করে জানা, দেশের লোকের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া। জমিদারি দেখার কাজ তাঁর কাছে নিশ্চয়ই পীড়াজনক হয়ে উঠত যদি-না এই সূত্রে গ্রামজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার সুযোগ তাঁর হত।

গ্রামের ও গ্রামবাসীদের অবস্থা বাবাকে কতখানি বিচলিত করেছিল, সেই-সময়কার তাঁর লেখার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের সমস্যা যে সমগ্র দেশের সমস্যা, দেশের উন্নতি নির্ভর করে গ্রামের উন্নতির উপর, দেশসেবা মানেই যে লোকসেবা, এই-সব কথা বারবার নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় তিনি দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, গ্রামের দুরবস্থা জানিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেষ্ট হবার জন্য বারবার তাদের মনকে নাড়া দেবার প্রভূত প্রয়াস করেছেন।

আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কী শোচনীয় তার বর্ণনা ১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে তিনি দিয়েছিলেন—

"গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা সংস্কারের কোনো শক্তি নাই। যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে;··· পরস্পরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই। জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই, ···তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত;··· অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই; আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত

হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি।"

বহু বছর ধরে গ্রামজীবনের সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই যথাযথ বিবরণ পাবনা সম্মিলনীতে দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজে জেনে এবং সকলকে কেবল জানিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না। জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়ে অবধি তাঁর ক্ষমতার মধ্যে তিনি নিজে কী করতে পারেন সে বিষয় অহরহ চিন্তা করেছেন, এক-একটি সমস্যা নিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছেন।

আমার পিতা গ্রামের উন্নতির জন্য কতখানি ভাবছেন, কৃষকদের আর্থিক দুর্গতি ও মানসিক জড়তা দূরীকরণের জন্য কী কী উপায় স্থির করেছেন আমি প্রথম জানলুম ১৯১০ সালে। আমি তখন আমেরিকা থেকে ইয়োরোপ ঘুরে সবে দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছাবার কয়েকদিন পরেই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন। আমাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্য ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। সেই আন্দোলনে তিনি কী উৎসাহের সঙ্গে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন তা সর্বজনবিদিত। তিনি আশা করেছিলেন বাঙালির মনে যে স্বদেশপ্রেম জেগেছে সেটা দেশসেবার কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হবে।

'স্বদেশী সমাজ', 'সভাপতির অভিভাষণ পাবনা সম্মিলনী' প্রভৃতি নানা বক্তৃতায় তিনি সর্বসাধারণকে, বিশেষত কংগ্রেসের নেতাদের, দেশসেবার কাজে প্রবৃত্ত করার জন্য অনুনয় করেন। তিনি বলেন—

'দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী

করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।'

অন্যত্র লিখেছেন—

'মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই; এইখানেই প্রাণের নিকেতন; লক্ষ্মী এইখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।'

ভিত গাঁথার কাজ তাঁর সাধ্যমতো তিনি সূত্রপাত করেছিলেন নিজেদের জমিদারির অন্তর্গত গ্রামগুলির মধ্যে। যখন দেখলেন দেশবাসী তাঁর কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, বরং তিনি দেশসেবার যে কর্মপদ্ধতি তাদের সামনে ধরেছিলেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনাই হতে থাকল, নেতারা কেবল রাজনৈতিক উত্তেজনাতেই মেতে রইলেন, তখন তিনি সংকল্প করলেন গ্রামোন্নতির কাজ যতটা পারেন তাঁর আদর্শমতো তিনি নিজেই জমিদারির মধ্যে প্রচলন করবেন।

কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে গেলে কৃষির উন্নতি করা বিশেষ দরকার। পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষির উন্নতি হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞান আমাদের দেশেও প্রবর্তন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে ১৯০৬ সালে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শেখবার জন্যে পাঠালেন। তার এক বছর পরে আমার ভগিনীপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও সেখানে পাঠালেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে আমরা তিন জনে গ্রামোন্নয়নের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারব তাঁর আশা ছিল। আমি সব-আগে ফিরে এলুম। আসবামাত্রই তিনি আমাকে শিলাইদহে নিয়ে গেলেন কাজে নিযুক্ত করার জন্য।

শিলাইদহে কিছুদিন থেকে সেখানকার কাজকর্ম বোঝানো হয়ে গেলে বোটে করে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন পতিসরে। যাবার পথে রোজ সন্ধেবেলায় বোটের ডেকের উপর বসে নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হত। আমি তাঁকে আমার কলেজের পড়াশুনার কথা

বলতুম— বাবা ধৈর্যের সঙ্গে সব শুনতেন। তার পর তিনি বলতেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা— বাংলার গ্রামে গ্রামে লোকদের সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক কী শোচনীয় অবস্থা তিনি দেখেছেন, তাদের জীবনযাপনের কতরকমের সমস্যা লক্ষ্য করেছেন, এই-সব সমস্যার প্রতিকারের তিনি কী চেষ্টা করেছেন ও ভবিষ্যতে আরো কী করতে ইচ্ছা করেন। জমিদারি চালনার ভার নেবার শুরুতেই আমি গ্রামোন্নতি-প্রণালীর শিক্ষা বাবার কাছ থেকে এইভাবে পেলুম।

বাবা বললেন, তিনি যখন জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেন প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশি বিচারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম— এই দুই পরগনায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ ঘটলেই উভয়পক্ষকে এই বিচারসভায় উপস্থিত হতে হবে এই নিয়ম হল। প্রজারা ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনোরকম মামলা নিয়ে আদালতে যাবে না। কেউ এই নিয়ম অমান্য করলে গ্রামবাসীরা তাকে একঘরে করবে, তার সঙ্গে কোনো সামাজিকতা রাখবে না। এই বিচারসভার বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপিলের সুযোগ দেবারও ব্যবস্থা করা হল। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগনার জন্য পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপিল-সভা নির্বাচিত হল। এই পাঁচজনকে পঞ্চপ্রধান বলা হত। পঞ্চপ্রধানের বিচারে সন্তুষ্ট না হলে শেষ আপিল ছিল স্বয়ং জমিদারের কাছে। বিচারের জন্য বাদী বা বিবাদীর কোনো ব্যয় বহন করতে হত না, কেবল দরখাস্ত করার কাগজ কেনার জন্য সামান্য মূল্য দিতে হত। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ছিল প্রজারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলবে— আদালতে যাবে না। বিচারের নথিপত্র রীতিমতো রাখা হত, সেগুলি সযত্নে ফাইল করে রাখার সাহায্য করত জমিদারির সেরেস্তা।

আদালতের সাহায্য ছাড়া বিনা ব্যয়ে বিনা বিলম্বে মামলার বিচারের এই ব্যবস্থা আরম্ভ হবার শুরু থেকেই প্রজারা এর উপকারিতা অনুভব করেছিল। তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল বলেই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই ব্যবস্থা এত অনায়াসে চলেছিল। ছোটো বড়ো কোনোরকম বিবাদ নিয়ে আদালতে নালিশ করতে যাওয়া তারা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল। দেওয়ানি বিচারের ভার প্রজারা নিজেরাই নিয়েছে বলে গবর্নমেন্ট কখনো আপত্তি তোলে নি বরং উৎসাহ দিয়েছে।

এই বিচার প্রবর্তিত হবার বহু বছর পরে আমাকে যখন পরিদর্শনের জন্য শিলাইদহ বা পতিসরে যেতে হত আমার বেশির ভাগ সময় যেত প্রজাদের আপিল বিচার করতে। তাদের মকদ্দমা অধিকাংশ জমিজমা-সম্পর্কিত। আমি আশ্চর্য হতুম সামান্য অশিক্ষিত কৃষকদের আইন-জ্ঞান দেখে। তাদের সঙ্গে যুঝতে আমাকে বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট ভালো করে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে একদল উকিলও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এরা অশিক্ষিত গ্রামেরই লোক, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও বাক্‌পটুতার জন্য তাদের খ্যাতি ছিল। নিতান্ত অক্ষমদের, বিশেষত মেয়েদের, মামলা চালানো তাদের ব্যাবসা হয়ে গিয়েছিল।

জমিজমা বা উত্তরাধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মকদ্দমার বিচার সব সময়ে যে আমাকে করতে হত তা নয়। মাঝে মাঝে বেশ কৌতুকজনক আরজিও উপস্থিত হত, কিন্তু বিচারকের আসনে বসে হাসা চলে না, গম্ভীরভাবে আমাকে রায় দিতে হত। শাশুড়ি-বউয়ের মধ্যে ঝগড়া বেধেছে, তার বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। সম্পত্তি ভাইয়ে-ভাইয়ে ভাগ হবে, একটিমাত্র পুকুর, তাকে দু-ভাগ কী করে করা যায়, না করলেও উপায় নেই, একই ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে জায়েদের মধ্যে রোজই ঝগড়া লাগে, ফলে রান্না হয়

না, ভাইদের মধ্যে কেউই খেতে পায় না— বিচিত্র কত-না নালিশ শুনতে হত।

বোটে যেতে যেতে বাবা আমাকে বোঝাতে লাগলেন— তিনি এতদিন পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় যেটুকু সম্ভব তাই করেছেন, কিন্তু গ্রামসংস্কারের কাজ জমিদারির কর্মচারীদের দ্বারা হয় না। সেইজন্য তিনি ঠিক করেছেন শান্তিনিকেতন থেকে কয়েকজন শিক্ষককে শিলাইদহ ও পতিসরে পাঠিয়ে দেবেন। তাদের উপরেই বিশেষভাবে এই কাজের ভার থাকবে।

শিলাইদহের চারপাশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সদ্‌ভাব নেই। কুষ্টিয়া কুমারখালি প্রভৃতি শহরের সান্নিধ্যে প্রজাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে, তারা স্বাভাবিক সরল মনোভাব হারিয়েছে, নতুন কিছু প্রবর্তন করতে গেলেই সন্দেহ করে। কয়েক বছর চেষ্টা করেও সেখানে বিশেষ কিছু করতে পারা যায় নি। একমাত্র কুষ্টিয়াতে তাঁতের বয়নশিল্প-প্রতিষ্ঠানটি ভালো চলছিল।

এই কারণে কালীগ্রাম পরগনাতেই তিনি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। সেখানকার প্রজাদের মধ্যে একনিষ্ঠতা আছে। কাজের সুবিধার জন্য এই পরগনাকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পরগনার সমস্ত প্রজারা মিলে একটি সমিতি নির্বাচন করেছে— তার নাম হয়েছে 'কালীগ্রাম হিতৈষী সভা'। তা ছাড়া প্রত্যেক বিভাগের প্রজারা একটি করে 'বিভাগীয় হিতৈষী সভা'ও নির্বাচন করেছে। শান্তিনিকেতন থেকে যে কর্মীরা আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের কাজের কেন্দ্র হবে এক-একটি বিভাগে।

প্রজারা হিতৈষী সভার কাজ চালাবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজেরা চাঁদা দিচ্ছে। চাঁদা আদায়ের জন্য তাদের কোনো পৃথক ব্যবস্থা করতে হয় নি, তার জন্য ব্যয়ও কিছু হয় না। খাজনা আদায়ের সময় তারা খাজনার প্রতি টাকার সঙ্গে তিন পয়সা অতিরিক্ত দেয়। অতিরিক্ত

এই আয় হিতৈষী সভার নামে পৃথক তহবিলে রাখা হয়। হিতৈষী সভার সমস্ত কিছু কাজ বিভাগ থেকে করা হয় বলে আদায়ী টাকা তিন অংশে ভাগ করে তিনটি বিভাগীয় হিতৈষী সভার হাতে দেওয়া হয়। সভার পক্ষ থেকে সেখানে বেতনভোগী একজন করে কর্মচারী রাখা হয়েছে।

কালীগ্রামে গ্রামসংস্কার-প্রতিষ্ঠানের গঠন এইভাবে করা হয়— প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দারা সেই গ্রামেরই একজন প্রবীণকে প্রধান বলে নির্বাচিত করে। প্রতি বিভাগে যতগুলি প্রধান নির্বাচিত হয় তাদের সকলকে নিয়েই বিভাগীয় হিতৈষী সভা গঠিত। তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচন করে। তাদের বলা হয় পরগনার পঞ্চপ্রধান। এই পাঁচজন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি থাকে। হিতৈষী সভার সভ্যের সংখ্যা পরে বাড়ানো হয়।

সাধারণত বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার মিটিং হয়। এত কাজ থাকে যে সমস্ত দিন সভা করেও অনেক কাজ শেষ হয় না। প্রথমত গত বছরের হিসাব পরীক্ষা করা হয়, যে টাকা ব্যয় হয়েছে তাতে কী কাজ কতখানি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তার পর আগামী বছরের জন্য কাজের প্রোগ্রাম স্থির করা ও সেই অনুযায়ী খরচের বাজেট প্রস্তুত করা। বার্ষিক সভার এই দুটি হল প্রধান কাজ— আর-একটি কাজ ছিল জমিদারি পরিচালনায় কর্মচারীদের কোনো ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে সে বিষয় জানানো।

টাকায় তিন পয়সা চাঁদা থেকে হিতৈষী সভার পাঁচ-ছ হাজার টাকা বার্ষিক আয় ছিল। প্রজাদের উৎসাহ দেবার জন্য, বাবা বললেন, এস্টেট থেকে তিনি আরো দু হাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হিতৈষী সভার জন্য যে টাকা উঠত প্রজারা তাকে 'সাধারণ

ফণ্ড' বলত। আমার যতটা মনে পড়ে চাঁদার হার পরে বাড়ানো হয়েছিল ইস্কুল ডিস্‌পেনসারি প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে।

গ্রামের উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা দরকার, হিতৈষী সভা আপাতত কেবল কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পেরেছে, তার মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হল প্রধান। সারা পরগনার মধ্যে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই পূর্বে ছিল না। অবস্থাপন্ন লোক তাদের ছেলেদের নাটোর আত্রাই বগুড়া প্রভৃতি শহরে পাঠাত ইস্কুলে পড়াবার জন্য। হিতৈষী সভা দু-এক বছরের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন গ্রামে পাঠশালা, তিন বিভাগে তিনটি মধ্য-ইংরাজি ও পতিসরে একটি হাই স্কুল স্থাপন করেছে। ইস্কুলবাড়ি ও ছাত্রাবাসের ঘর নির্মাণ করার মতো টাকা সাধারণ ফণ্ড থেকে দেওয়া সম্ভব নয় বলে বাবা এস্টেটের খরচে সেগুলি তৈরি করে দিয়েছেন।

শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন ছিল। ঐ অঞ্চলে কোথাও একটি পাস-করা ডাক্তার ছিল না। প্রথমে পতিসরে একটি ডাক্তারখানা খোলা হয়— তার পর ক্রমশ অন্য দুটি বিভাগেও ডাক্তারসহ ডিস্‌পেনসারি স্থাপিত হল। কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য এস্টেট থেকেও যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হয়। পতিসরের চিকিৎসালয় বেশ ভালো হয়েছে এবং এখানে বহুসংখ্যক রোগী দৈনিক চিকিৎসার জন্য আসে।

কালীগ্রাম পরগনা চলনবিলের সংলগ্ন। বর্ষাকালে শস্যক্ষেত সমস্তই জলমগ্ন হয়ে যায়, গ্রামগুলি উঁচু জমির উপর, দেখতে এক-একটি দ্বীপের মতো। বাবা বললেন, তুই তো দেখেছিস রাস্তা কোথাও নেই— গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে গেলে ধানখেতের আল ধরে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়, বর্ষার দিনে নৌকা বেয়ে ধানের উপর দিয়ে সর্বত্র যাওয়া-আসা চলে। সাধারণ ফণ্ড থেকে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা আরম্ভ হয়ে গেছে। পতিসর

থেকে আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল সদর রাস্তা এস্টেট থেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই রাস্তা প্রস্তুত করতে বহু টাকা খরচ —সাধারণ ফণ্ড থেকে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব নয়।

এই কয়েকটি প্রধান কাজ ছাড়াও, বুজে যাওয়া মজা ডোবা ও পুকুর পুনরুদ্ধার করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, যেখানে পানীয় জলের অভাব সেখানে কূপ খনন করে দেওয়া প্রভৃতি সাধারণের উপকারার্থে নানান কাজে হিতৈষী সভা ক্রমশ হাত দিচ্ছে। পতিসরে একটি ধর্মগোলারও ব্যবস্থা হয়েছে।

আমেরিকায় যে তিন-চার বছর কলেজে পড়েছিলাম সেই সময়ে বাবা জমিদারিতে প্রজাদের মধ্যে যে এত রকমের কাজে হাত দিয়েছেন তা কিছুই জানতুম না। বাবা যখন গল্পচ্ছলে এই-সব কথা আমাকে বলতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতুম। সব-শেষে বললেন, 'আমি যে-সব কাজ করতে চেয়েছিলুম কিন্তু এখনো হাত দিতে পারি নি, তোকে সেগুলি করতে হবে— বিশেষত কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।'

বাবার নির্দেশ অনুসারে আমি কৃষির উন্নতির নানাবিধ চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলুম। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সংলগ্ন কতক জমি খাস করে নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করলুম। আমেরিকা থেকে চাষ-আবাদের কয়েকটি যন্ত্রপাতি আনিয়ে সেখানে তার পরীক্ষা চলতে লাগল। চাষিরা ধান ছাড়া অন্য ফসলের চাষ তেমন করে না দেখে ঐ অঞ্চলে rotation করে দু-একটা money crops করা যায় কিনা তার পরীক্ষা হতে থাকল। আমেরিকা থেকে ভালো ভুট্টার বীজ আনালুম। চাষিদের আলু ও টমেটোর চাষ শেখানো হল। শিলাইদহের দো-আঁশলা মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় কী কী খাদ্যসামগ্রীর অভাব তা জানবার জন্য ছোটোখাটো একটা

রাসায়নিক ল্যাবরেটারি গড়ে তুললুম। চাষিদের মধ্যে ক্রমশ উৎসাহ দেখা গেল, আলু আখ টমেটো প্রভৃতির চাষ ক্রমশ বাড়তে লাগল। সারের অভাব কী করে ঘোচানো যায় ভাবছি এমন সময় আকস্মিক ভাবে একটি উপায় আবিষ্কার করলুম। শিলাইদহের ধারে পদ্মানদী থেকে বিস্তর ইলিশ মাছ কলকাতায় রপ্তানি হয়। বেড়াজালে এক-এক সময় এত মাছ ওঠে যে অত মাছ নিকারিরা নিতে চায় না। একদিন দেখলুম ডিম বের করে নিয়ে নুন দিয়ে রাখছে আর মাছগুলি নদীর জলে ফেলে দিচ্ছে। নামমাত্র মূল্যে কয়েক নৌকা বোঝাই মাছ কিনে নিয়ে এসে চুন দিয়ে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখলুম। এক বছর পরে মাটি খুঁড়ে দেখি চমৎকার সার হয়েছে। তখন মাছের সার প্রচলনের চেষ্টা করলুম।

শিলাইদহ অঞ্চলে কৃষির উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ পেলুম। কিন্তু পতিসরে সে সুযোগ নেই, দেশটা নিতান্তই একফসলে; বর্ষার কয়েক মাস জলমগ্ন থাকে আর জল নেমে গেলে মাটি শুকিয়ে এত কঠিন হয়ে যায় যে লাঙল চলে না। সেইজন্য রবিশস্য কিছুই হয় না; এমন-কি গাছপালাও জন্মায় না। বাবা কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও কালীগ্রামে আবাদের কী উন্নতি হতে পারে তাই নিয়ে চিন্তা করতে ছাড়েন নি। ১৩১৫ সালে তিনি কোনো কর্মীকে লিখছেন—

'প্রজাদের বাস্তুবাড়ি ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সূতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল আঙুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।··· কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।'

অনেক চেষ্টার ফলেও কালীগ্রামে চাষবাসের বিশেষ উন্নতি করা সম্ভব হয় নি। কয়েক বছর পরে একটা সুযোগ পেলুম। উত্তর বঙ্গ বন্যার সাহায্যার্থে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক টাকা তুলেছিলেন। দুঃস্থদের সাহায্য করার কাজ শেষ হয়ে গেলে এই ফণ্ডে কিছু টাকা উদ্‌বৃত্ত থেকে গিয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে আত্রাইতে স্থায়ীভাবে একটি খাদি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, কয়েকটি ট্র্যাক্টরও কেনা হয়। ট্র্যাক্টর কেনার উদ্দেশ্য ছিল, বন্যাতে অনেক গোরু মরে যাওয়ায় লাঙল চালাবার উপায় ছিল না, আচার্যদেবের কাছ থেকে পতিসরের জন্য একটা ট্র্যাক্টর চেয়ে নিলুম। আমাদের দেশে তখনো ট্র্যাক্টরের চলন হয় নি। ট্র্যাক্টর তো পেলুম কিন্তু চালক পেলুম না। নিজেই চালাতে লাগলুম। আমেরিকায় আমার অভ্যাস ছিল এ কাজের— ক্রমশ কয়েকদিনের মধ্যে গ্রামের একটি ছোকরাকে চালানো শিখিয়ে দিলুম। আমার আশঙ্কা ছিল ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করলে ধানখেতের আলগুলি নষ্ট হয়ে যাবে, তখন সীমানা নিয়ে চাষিরা গোলমাল করবে। ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করার পরীক্ষা যেদিন হবে সে একটা স্মরণীয় দিন কালীগ্রাম পরগনায়। সকাল থেকে হাজার হাজার লোক জমে গেল এই দানবীয় মেশিনটার কাজ দেখার জন্য। তাদের কৌতূহল মেটাবার জন্য ট্র্যাক্টর নিয়ে আমি নেমে গেলুম ধানখেতে। কয়েকজন চাষিকে জিজ্ঞাসা করলুম, আলের উপর দিয়ে লাঙল না চালিয়ে তো উপায় নেই— আল বাঁচিয়ে ছোটো ছোটো খেত মেশিন দিয়ে চাষ দেওয়া সম্ভব নয়। তারা আমাকে আশ্বাস দিল, 'ভাবনা নেই ; আপনি আলের উপর দিয়ে চাষ দিয়ে যান, আমরা কোদাল নিয়ে থাকব, সঙ্গে সঙ্গে আল আবার বানিয়ে নেব।' প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই কৃষকেরা খুব খুশি। ট্র্যাক্টর পতিসরেই থাকবে স্থির হল। আমি জানালুম, চাষ করে দেবার জন্যে বিঘাপ্রতি এক টাকা মাত্র খরচা হিসাবে নিয়ে ভাড়া দেওয়া হবে। তার পর

থেকে ট্র্যাক্টরের চাষ সর্বত্র চলতে লাগল, এবং সেটা ভাড়া নেবার জন্য চাষিদের মধ্যে রেষারেষি পড়ে গেল। পতিসর থেকে চলে আসার আগে প্রজাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হল— আগামী বছরে আরো ট্র্যাক্টর আনিয়ে দেব।

বছরের বেশ কয়েক মাস চাষিদের কোনো কাজ থাকে না। এই সময় হাতের কাজ করে তারা অনায়াসে কিছু রোজগার করতে পারে। বাবা আমাকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন কয়েকটি কুটিরশিল্প শেখাবার ব্যবস্থা করতে। কালীগ্রামে ভালো তাঁতি ছিল না, মুসলমানদের মধ্যে কয়েকঘর জোলা ছিল তারা মোটা রকমের গামছা কেবল বুনত। তাদের একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হল তাঁতে কাপড় বোনা শেখবার জন্য। নানান রকমের নকশা তুলে বিবিধ প্রকারের কাপড় বোনা শিখে এসে সে যখন পতিসরে ফিরে এল, সাধারণ ফণ্ডের খরচে তাকে শিক্ষক করে একটি বয়ন-শিক্ষার ইস্কুল খোলা হল। এই সময়ে বাবা আমাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

'বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে— সেইরকম একটা কল এখানে [পতিসরে] আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এ দেশ ধানেরই দেশ— বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়।··· এই কলের সন্ধান দেখিস।

'তার পরে এখানকার চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না— এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিষটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস— অর্থাৎ ছোটোখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা।··· আর একটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি

করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তা হলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না— খোলা পেলে সুবিধা হয়।

'যাই হোক ধানভানা কল, Potteryর চাক ও ছাতা তৈরির শিক্ষকের খবর নিস— ভুলিস নে।'

বাবার আমলেই কালীগ্রাম পরগনায় কয়েকটি ইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বাবাকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয় নি। প্রজাদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি। তারা যে-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের ছেলেরা যাতে সেই শিক্ষা পাবার যথেষ্ট সুযোগ পায় তাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। পাঠশালা ইস্কুল তাড়াতাড়ি খোলার জন্য রেষারেষি পড়ে যেত। প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলে সাধারণ ফণ্ডের সমস্ত টাকাই বোধ হয় তারা শিক্ষাবিস্তারের জন্য খরচ করে ফেলত। বাবাকে এই বিষয়ে প্রজাদের উৎসাহ অনেক সময় সংযত করতে হত। পাঠশালা ক্রমশ বাড়তে লাগল, কয়েক বছরের মধ্যে পরগনার প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে পাঠশালা স্থাপিত হল। এইসঙ্গে প্রত্যেক বিভাগে একটি করে উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পতিসরে একটি হাই স্কুল খোলা হল। বর্ষাকালে চার দিক জলে ডুবে যায়, পতিসরে গেলে দেখতুম নৌকা বোঝাই করে ছাত্ররা আশেপাশের গ্রাম থেকে ইস্কুলে পড়তে আসছে। কলকাতার ইস্কুল-কলেজের যেমন নিজেদের বাস্ রাখতে হয়, কালীগ্রামের ইস্কুলগুলির তেমনি কয়েকখানা করে নৌকা থাকত।

গ্রামের অভাব দূর করার জন্য হিতৈষী সভা নানান দিকে চেষ্টা করেছে— শিক্ষাবিস্তার, তাঁতে কাপড় বোনা প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্প

প্রচলন, চাষের উন্নতি, মাছের ব্যাবসা, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, সালিশের বিচার, জলকষ্ট নিবারণ, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি— কিন্তু একটি অভাব দূর করতে পারে নি, দূর করার ক্ষমতা ছিল না বলে।

জমিদারের সঙ্গে পরিচয় হবার পর বাবা লক্ষ্য করেছিলেন প্রজাদের মধ্যে সকলেরই ঋণ আছে। গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক খুব কম, অধিকাংশ গ্রামবাসী ঋণে ডুবে রয়েছে, দেনা থেকে সারা জীবনেও তারা মুক্তি পায় না। তখনকার দিনে এটাই ছিল পল্লীসমাজের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। এই সমস্যা বাবাকে সর্বদাই পীড়া দিত, তাঁকে চিন্তিত করত, এর প্রতিবিধানের কোনো উপায় অনেকদিন পর্যন্ত তিনি খুঁজে পান নি। প্রজারা মহাজনকে টাকা শোধ দেবার চেষ্টা করত না তা নয়— কিন্তু সুদের হার এত বেশি, আর সুদের সুদ আদায় হত বলে আসল কোনোদিনই শোধ হত না। এই অবস্থায় তাদের দুঃখনিবারণের একমাত্র উপায় যুক্তিসংগত কম সুদে প্রয়োজন-মতো কর্জ দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগে, বাবার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

সে সময়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য তাঁকে যথেষ্ট দেনা করতে হয়েছে, তবু প্রজাদের দুঃখনিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা না করে তিনি থাকতে পারলেন না। বন্ধুবান্ধব ও দু-একজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি কৃষি-ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন। এই ব্যাঙ্ক যে মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করল সবই ধার-করা টাকা— ধার করতে বাবাকে শতকরা ৮ টাকা সুদ দিতে হচ্ছিল। বাবা নিয়ম করলেন প্রজাদের কাছ থেকে ১২ টাকা সুদ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক চালাবার খরচা দিয়ে ও অনাদায়ী টাকার হিসাব করলে ব্যাঙ্কের কোনো লাভই থাকে না। তবু ব্যাঙ্কের কাজ এইভাবে চলতে থাকল। মূলধন সামান্য, তাতে প্রজাদের চাহিদা

সংকুলান করা সম্ভব হল না। এর জন্য বাবা যখন খুবই চিন্তিত তখন আকস্মিক ভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হল। নোবেল প্রাইজের ১০৮০০০ টাকা তাঁর হাতে এসে পড়ল। টাকাটা শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে দেবার তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা, অথচ প্রজাদের হিতার্থে কাজে লাগাতে পারলেও তিনি খুশি হন। এই দোটানার মধ্যে তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কী করবেন। সুরেনদাদা [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর] ও আমি তাঁর কাছে তখন প্রস্তাব করি যে প্রাইজের টাকাটা পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখা হোক শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নামে। এতে দুদিকেই উপকার হবে। তাই করা হল। যতদিন কৃষি-ব্যাঙ্ক ছিল, বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ের ও পরে বিশ্বভারতীর বছরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল। ব্যাঙ্কেরও সুবিধা হল এই মূলধন পেয়ে। কৃষি-ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালীগ্রাম পরগনার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমন-কি কয়েকজন কৃষি-ব্যাঙ্কে ডিপজিট রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার। কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural Indebtedness-এর আইন প্রবর্তন হল। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায় হবার উপায় রইল না— নোবেল প্রাইজের আসল টাকা সেইজন্য কৃষি-ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে পারে নি।

হিতৈষী সভার কাজ কিন্তু বছরের পর বছর চলতে থাকল। মাঝে অনেকদিন পতিসরে যেতে পারি নি— বিশ্বভারতীর কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম। এমন সময় মহাযুদ্ধের প্রকোপ ঘরের কাছে এসে পড়ল। জাপানিদের ভয়ে বাংলার নদীগুলোতে যতরকমের জলবাহন ছিল গভর্নমেণ্ট সেগুলি সব ডুবিয়ে দিতে লাগল। পদ্মা

বোটে আমি তখন উত্তরপাড়ায় থাকতুম। ভয় হল কোন্‌দিন বোটটা কেড়ে নিয়ে যায়। বোটটি বাঁচাবার জন্য গঙ্গা বয়ে আগাগোড়া নদীপথে পতিসরে যাবার জন্য রওনা হলুম। সেখানে পৌঁছে নিশ্চিন্ত বোধ হল। তখনকার মতো পদ্মা বোট রক্ষা হল— কিন্তু বাবা ও মহর্ষির বিশেষ প্রিয় এই বজরা বোটটিকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারলুম না। যুদ্ধের সময় কাঠ ও লোহার অভাবে সময়মতো মেরামত করা গেল না, একটু একটু করে ভাঙতে ভাঙতে নিঃশেষ হয়ে গেল। শিলাইদহ, শাহাজাদপুর বা পতিসরে যখনই বাবা থাকতেন পদ্মা বোট না হলে তাঁর চলত না।

সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। পতিসরের হাই স্কুলে ছাত্র আর ধরছে না দেখলুম— নৌকার পর নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল ইস্কুলের ঘাটে। এমন-কি আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকেও ছাত্র আসছে। পড়াশুনার ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর কোনো ইস্কুলের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। পাঠশালা, মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তিনটি হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারির কাজ ভালো চলছে। মামলা-মকদ্দমা খুবই কম, যে অল্পসল্প বিবাদ উপস্থিত হয় তখনই প্রধানরা মিটিয়ে দেন। যে-সব জোলারা আগে কেবল গামছা বুনত তারা এখন ধুতি শাড়ি বিছানার চাদর বুনে আমাকে দেখাতে আনল। ঐ অঞ্চলে যত রকম মাছ ধরার জাল বা খাঁচা ব্যবহার হয় একটি জেলে তার এক সেট মডেল আমাকে উপহার দিল। কুমোরেরাও নানা রকমের মাটির বাসন এনে দেখাল। গভর্নমেন্টের নতুন আইনের সাহায্যে ঋণমুক্ত হয়ে গ্রামের লোকদের চিরন্তন আর্থিক দুরবস্থা আর নেই। আমাকে চাষিরা কেবল অনুযোগ জানাল, 'বাবুমশায়, আমাদের আরো ট্র্যাক্টর এনে দিলেন না?'

১৩১৫ সালে বাবা যে লিখেছিলেন তাঁর এক চিঠিতে—

'যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়— তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।'

তাঁর দীর্ঘকালের সেই চেষ্টা যে এমন সুফল দিয়েছে তা দেখে আনন্দে আমার মন ভরে গেল।

বাবার আর-একটি লেখার কথা তখন মনে পড়ে গেল—

'তার পরে মাটির কথা— যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে— বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে সেদিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে উর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয় ও তো আমারই জন্যে— আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে। এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁছেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।'

প্রতিভাষণ

বিশ্বভারতী সংসদ, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন কর্মীমণ্ডলী ও আশ্রমিক সংঘের সদস্যগণ সম্মিলিত হয়ে আজ আমার এবং আমার সহধর্মিণীর প্রতি যে প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করলেন তা আমার পক্ষে যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই কুণ্ঠাজনক। সর্বদাই আমি আপনাদের সকলেরই প্রীতি কামনা করলেও আমি যে কখনো বিশেষ অনুষ্ঠান-যোগে আপনাদের সম্মাননীয় হতে পারি এ কল্পনা কখনো আমার মনে ক্ষণিকের জন্যও উদয় হয় নি। যে স্নেহগুণে আপনারা এই উৎসবের আয়োজন করেছেন আশা করি আমি নিয়ত অধ্যবসায়ে তার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব, আমার দিনান্তকাল পর্যন্ত আমার প্রতি আপনাদের এই আনুকূল্য অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বস্তুত আমি যদি কিছুমাত্রও আপনাদের প্রীতি আকর্ষণ করে থাকতে পারি বলা বাহুল্য তার একমাত্র কারণ এই যে, দীর্ঘকাল আমি বিশ্বভারতীর অন্যতম সেবকপদে নিযুক্ত আছি। অতিক্ষীণ আরম্ভ থেকে পিতৃদেবের জীবনের বিভিন্ন পর্বে এই প্রতিষ্ঠান বিচিত্র-রূপ পরিগ্রহ করেছে, এর পরিধি বিস্তারলাভ করেছে দেশবিদেশের জ্ঞানীগুণীকলাবিৎদের সহযোগে— সৌভাগ্যবশত পিতৃদেবের সহ-যোগী অনেকে আজও জীবিত থেকে এর সঙ্গে যুক্ত আছেন— আমার উপর ভার পড়েছিল এর কর্মবন্ধনের স্থায়িত্বরক্ষার। আমার পরিমিত সাধ্য অনুযায়ী সে চেষ্টার ত্রুটি করি নি, আজও সেই কাজেই প্রবৃত্ত আছি নিজের অন্তরের প্রবর্তনাতেই। আজ যদি তার কোনো মূল্য আপনারা স্বীকারযোগ্য মনে করেন তবে তার চেয়ে আমার জীবনের বড়ো সার্থকতা আমি কল্পনা করতে পারি না।

স্বভাবতই আজ মনে পড়ে এই প্রতিষ্ঠানের বাল্যদশার কথা, যার সঙ্গে আমার নিজের কৈশোরস্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আপনারা অনেকেই অবগত আছেন, যে মুষ্টিমেয় ছাত্রসংখ্যা নিয়ে এই বিদ্যালয়ের সূচনা হয় আমি তার অন্যতম। একান্ত নিঃসম্বলভাবে অন্তরের প্রেরণাকেই সহায় করে পিতৃদেব এই বিদ্যালয়ের প্রবর্তনা করেন— একে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁকে নিরন্তর যে সংগ্রাম করতে হয়েছে, সেই যজ্ঞে আমার মাতৃদেবীকেও যেভাবে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ অঞ্জলি দিতে হয়েছে, বাল্যকালেও তা আমার অগোচর থাকে নি। পিতৃদেবের সে সাধনার বিস্তারিত বিবরণ এখানে উল্লেখ করবার প্রয়োজন বা অবসর নেই— প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্র-জীবনীতে বিশদভাবেই তার আলোচনা করেছেন। আমার দ্বারা যতদূর সাধ্য ততখানি পিতৃদেবের ভার মোচন করব, তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণ করে তুলতে চেষ্টা করব এই কামনা অস্পষ্টভাবে তখনই আমার মনে দেখা দিয়েছিল— বিলাসিতার ধনাভিমানের মোহ যাতে আমাকে স্পর্শ না করে, মঙ্গলের আদর্শ যাতে আমার মনে সুদৃঢ় হয়, অন্তরের পরিপূর্ণতা দ্বারা বাহিরের বিরলতাকে পরাস্ত ক'রে আমি যাতে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি আমার বাল্যকাল থেকেই পিতৃ-দেবের চেষ্টা সেদিকে সদাজাগ্রত ছিল,— যদিও এমন গৌরব করতে পারি না যে তাঁর প্রয়াস আমার জীবনে যথোচিত সার্থকতা লাভ করেছে।

আশ্রমের এই পর্বের নানা আনন্দস্মৃতির মধ্যে সব চেয়ে বেশি করে আজ মনে পড়ে আমার শিক্ষক কবি সতীশচন্দ্র রায়ের অচির-কালীন সঙ্গ। তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে আশ্রমবাসের কাল স্বল্পতর, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অল্পকালের জন্যও যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা ইহজীবনে আর তাঁকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। আনন্দে আবেগে উদ্দীপনায় সন্ন্যাসীর মতো এই মানুষটি সর্বদা যেন

মত্ত হয়ে থাকতেন, সেই উদ্দীপনা সহজেই চারপাশে সকলের মধ্যে বিকীর্ণ করে দিতেও পারতেন। সেই তরুণ বয়সেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তাঁর অধিগত হয়েছিল— তাঁর সেই সাহিত্যপ্রীতি তিনি অবোধ ছাত্রের মনেও সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন। কতদিন একান্তে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাব্য আবৃত্তি শুনেছি, বালক বলে তিনি কাউকে অবজ্ঞা করতেন না; শুধু আবৃত্তি দ্বারাই তিনি কাব্যের ব্যঞ্জনা শিক্ষার্থীর কাছেও এমন ব্যক্ত করে তুলতে পারতেন যে শব্দার্থবোধের প্রয়োজনই তাদের অনেক সময় হত না। এদিকে বাহিরে তাঁর দৈন্যের সীমা ছিল না— আশ্রমের তখন চরম আর্থিক দুর্দশা— কিন্তু সেদিকে তাঁর কোনো লক্ষ্যই ছিল না। এখানকার 'প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্য সম্ভোগের আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে আত্মনিবেদনের আনন্দে' তিনি নিরন্তর এমন উৎসাহিত হয়ে থাকতেন যে সাংসারিক দারিদ্র্যে তাঁকে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারে নি। আশ্রমে যাঁরা শিক্ষক হবেন তাঁরা হবেন সাধক, পিতৃদেবের এই কল্পনাটি তিনি সত্য করেছিলেন, তাই তাঁর অকালতিরোভাবের বেদনা পিতৃদেব শেষ পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি, আমৃত্যু তাঁকে বারবার স্মরণ করেছেন কাব্যে, প্রবন্ধে, আলোচনায়।

আমাব ছাত্রপর্ব সমাপ্ত হলে পল্লীসেবার কাজে আমাকে নিযুক্ত করবেন পিতৃদেবের মনে এইটিই প্রথম সংকল্প ছিল, সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি আমাকে ও তাঁর পুত্রপ্রতিম সন্তোষচন্দ্রকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। রোগ শোক দৈন্য অশিক্ষাদ্বারা পল্লীতে পল্লীতে দেশের অধিকসংখ্যক মানুষের জীবন যদি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তবে একমাত্র রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাতে তাদের সত্যকার মুক্তি নেই বহুকালপূর্বেই পিতৃদেব এ সত্য স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন এবং দেশবাসীকে তা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেশের তৎ-কালীন রাষ্ট্রনায়কদের পল্লীসেবার পথে প্রবর্তিত করবার চেষ্টা করে

যখন তিনি ব্যর্থমনোরথ হলেন তখন নিজের জমিদারিতে সাধ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে তাঁর উদ্যোগকে প্রবর্তিত করেছিলেন— আমি সে কাজে তাঁর অনুচর হই এই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল। পরে সুরুলে কেন্দ্র স্থাপিত হবার পরে বিদ্যালয় ও পল্লীসেবাপ্রতিষ্ঠান একত্র দুই বিভাগেরই সেবা করবার সুযোগ ও পিতৃদেবের আনুচর্যের গৌরব আমি লাভ করি, এবং সেই অবধি আমার যতটুকু শক্তি সাধ্য তা প্রয়োগ করে এই কাজেই নিযুক্ত আছি।

এ কথা নিঃসন্দেহ যে কর্মক্ষেত্রের জটিলতায় জড়িত হয়ে অসহিষ্ণুতা অবিবেচনার দ্বারা অনেক সময় আপনাদের আঘাত করেছি নিজেও আহত হয়েছি। আমার কর্তব্যসম্পাদনে অসংখ্য অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে, এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। আমার অদূরদর্শিতা দ্বারা কখনো যদি এই প্রতিষ্ঠানের কোনো ক্ষতিও হয়ে থাকে তবু এর সেবায় মনোযোগের অভাব সূচিত হয় নি এই অনুষ্ঠান তারই স্বীকৃতি, এই কথা মনে করে আমার সকল বিচ্যুতির জন্য আজ আমি আপনাদের মার্জনা ভিক্ষা করি। যাঁদের সঙ্গী বা অনুবর্তী হয়ে এক সময় এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় ব্রতী হয়েছিলাম তাঁদের অনেকে আজ পরলোকে। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমাকে আশীর্বাদ করতে এখানে উপস্থিত আছেন আমার পূজনীয় শিক্ষকমহাশয়, পিতৃদেবের নির্দিষ্ট পথে দীর্ঘকাল অনলস বিদ্যাচর্চা করে সম্প্রতি যিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন ; আমার পূজনীয়া দিদি, পিতৃদেবের সংগীতের রক্ষা ও প্রচারকল্পে যাঁর প্রবল উদ্যম বয়োভারে বিন্দুমাত্রও ক্লান্ত হয় নি ; এবং এই আশ্রমের সর্বজনভক্তিভাজন আচার্যদ্বয়, এই আশ্রমের রচনাকার্যে যাঁরা পিতৃদেবেরও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন ; তাঁদের সকলকে আমার প্রণতি জ্ঞাপন করি। তাঁদের অনুগামী হয়ে উপস্থিত আছেন বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের প্রবীণ ও নবীন অন্যান্য কর্মী ও উপদেষ্টাবৃন্দ, যাঁদের নিষ্ঠা ও কর্মশক্তির যোগেই এই বিদ্যায়তন

সঞ্জীবিত— তাঁদের আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানাই। আর এই উৎসবের কর্ণধাররূপে উপস্থিত রয়েছেন আমার অকৃত্রিম সুহৃদ, আশ্রমের একনিষ্ঠ সেবক, যিনি দীর্ঘকাল তাঁর সেবা দিয়ে এই আশ্রমের ঐতিহ্যকে শুধু অব্যাহত রেখেছেন তা নয়, তাঁর শিল্পীমনের সাহায্যে বাইরের রূপরচনায়ও এই আশ্রমকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে তুলেছেন। তাঁকে আমার অন্তরের প্রীতি জ্ঞাপন করি। অনেক গুরুজন ও বন্ধুব্যক্তি আজকে এখানে উপস্থিত হতে পারেন নি, কিন্তু দূরে থেকে আমাকে সম্ভাষণ জানিয়েছেন তাঁদেরকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই আশ্রমের সঙ্গে বাহির-বিশ্বের, এর অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুস্বরূপ যে প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ, আমি যে তাঁদেরই অন্যতম সেজন্য আনন্দ-প্রকাশ করতে তাঁরাও আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। এই অবসরে, পিতৃদেব তাঁদের কাছে বারম্বার যে দাবি জানিয়ে গেছেন আমার দুর্বল কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি করে আজকের বক্তব্য শেষ করি— 'শান্তিনিকেতনের গৌরব রক্ষা করবার ভার তোমাদের উপর —তোমরা যদি অনুভব কর যে তোমরা একসময়ে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলে, তোমাদের প্রীতি ও নিষ্ঠা যদি অটুট থাকে তা আমি তোমাদের কাছ থেকে আর কোনো প্রতিদান চাই নে, যদি কখনো এই বিদ্যালয়ের আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে, সংশয় উপস্থিত হয়, যদি বাধাবিপত্তি আত্মদ্রোহ আসে, তাহলে তোমাদের নিষ্ঠা যেন অবিচলিত থেকে একে রক্ষা করে।' 'এখানে যে প্রাণের ঐক্যধারা তার ভার তোমাদের প্রাক্তনদের, উপর। ভবিষ্যতে তোমাদের অন্তরের প্রীতি এই অনুষ্ঠানকে গঠিত করবে এই কথা ভাবতে আমি ভালোবাসি।' 'শুধু বিধিবিধানের মধ্যে দিয়ে নয়, কিন্তু তোমরা জীবনের যে ছাপ এখান থেকে পেলে তার চিহ্ন দিয়ে তোমাদের শুদ্ধ প্রীতি, নিষ্ঠা ও ত্যাগের দ্বারা একে রক্ষা করতে হবে। দূরে নিকটে যে অবস্থায় থাকো মনে রেখো তোমাদের আত্মদানের উপর আশ্রমের

আদর্শ নির্ভর করছে।' 'আজ যদি আমি এ কথাটা উপলব্ধি করে যেতে পারি আশ্রমের প্রতি তোমাদের নিষ্ঠা আছে, যদি জানতে পারি যে তোমাদের প্রাণের মধ্যে এর বেঁচে থাকবার শক্তি রয়ে গেল তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। তোমাদের যে জোর আছে সেই ভালোবাসা ও নিষ্ঠার জোরে তোমরা দাবি করতে পার এবং করবে, এবং সেই দাবিতে এমন একটি ক্ষেত্র রচনা করে তুলবে যাতে তোমাদের অনুরাগ ও সহকারিতা এই আশ্রমকে বলশালী করে তুলতে পারে। বস্তুগত আনুকূল্য, আর্থিক সহায়তা আমি তোমাদের কাছে আশা করি নে। আপন নিষ্ঠার দ্বারা ভালোবাসার দ্বারা যদি এই আশ্রমকে তোমরা বাইরের সমস্ত আঘাত থেকে আবৃত করে রাখতে পারো তা হলে তার চেয়ে বড়ো তোমাদের কাছ থেকে কিছু পাবার নেই।'

শান্তিনিকেতন
১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫

পিতৃদেবের মৃত্যু উপলক্ষে

Aug. 9. 41.

সব শেষ করে আশ্রমে ফিরেছি। এখন কেবল তাঁর স্মৃতি নিয়ে সময় কাটছে। কয়েকদিন হল মাত্র সকলে তাঁকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হয়েছিল। মনে দৃঢ় আশা ছিল অপারেশনের ফলে তাঁকে আরো কয়েক বছর সুস্থদেহে আরামে থাকতে দিতে পারা যাবে। আশ্রম ছেড়ে যাবার কয়েকদিন আগে থেকেই রোগযন্ত্রণা বেড়েছিল, দুর্বলতাও যথেষ্ট। পথে কষ্ট যত কম হয় তার ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নি। রেলওয়ের একজন বড়রকম কর্তৃপক্ষ তাঁর নিজের স্যালুন গাড়ি নিয়ে আগের রাত থেকে বোলপুরে এসে রইলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের চেষ্টায় স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা রাতারাতি মেরামত করে দেওয়া হল যাতে মোটরের ঝাঁকানি না লাগে। কলকাতায় যাবার খবর জেনে অবধি আশ্রমের আবালবৃদ্ধ সকলের মন অব্যক্ত আশঙ্কায় চঞ্চল। সকাল হতে না হতে উত্তরায়ণের সামনের খোলা আঙিনায় সকলে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে। শায়িত অবস্থায় গাড়িতে তোলবার সময় তাঁকে দূর থেকেই চোখ ভরে তাঁরা দেখে নিল, কেবল পায়ের ধুলো নিতে কেউ ভিড় করে এগিয়ে এল না, তাদের সকলের বিদায়বেলার প্রণাম ও তাঁর অসীম স্নেহ আশীর্বাদ পরস্পরের গভীর অন্তরে বিনিময় হয়ে গেল। গাড়ি রওনা হলে এতক্ষণের চাপা আবেগ উছলে পড়ল সমস্বরে একটি গানে— 'আমাদের শান্তিনিকেতন।' তাদের সুখ-দুঃখ সব কিছুই যে এই একটি গানে তারা প্রকাশ করে।

স্যালুন গাড়িতে সেবিকাদের মধ্যে দুজন ও ডাক্তার একজন সঙ্গে রইলেন। আর দুজন ডাক্তার ও অন্যান্য সেবক-সেবিকারা অন্য

গাড়ীতে উঠলেন। পথ বেশি নয় কিন্তু প্যাসেঞ্জার গাড়ীটা ধীরগামী। দিনমানে আর কোনো দ্রুত ট্রেন নেই। পৌঁছতে প্রায় বেলা ৩টা হল। সকলেরই ভয় ছিল স্টেশনে লোকের ভীড় হলে তাঁকে কষ্ট পেতে হবে। তাই কোন্ ট্রেনে নিয়ে যাওয়া হবে খবরটা চেপে রাখা হয়েছিল। তবু আরো বিশেষ সাবধান হবার জন্য স্যালুনের অধিকারী মিঃ— বর্ধমান থেকে হাওড়া স্টেশন মাস্টারকে টেলিফোন করলেন সাধারণকে জানাতে ১১ নং প্ল্যাটফর্মে গাড়ী আসবে, কিন্তু সত্যি দাঁড়াবে গিয়ে ১ নম্বরে। রেলওয়ের সৌজন্যে তাঁকে স্টেশনে নামাতে কোনো অসুবিধাই হয় নি। স্টেশন মাস্টার প্রমুখ অধিকাংশ অফিসাররা গাড়ী পৌঁছতেই স্যালুনের পাশে (?) লাইন করে দাঁড়িয়েছিলেন যাতে নির্বিবাদে ওঁকে নাবিয়ে মোটরে তুলে দেওয়া যায়। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দোতলায় ঘর প্রস্তুত ছিল। কালিম্পং থেকে এনে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেই ঘরেই আবার তোলা হল। পথের শ্রান্তি বিশেষ লক্ষ হল না, আত্মীয়দের সঙ্গে বেশ হাসি-ঠাট্টা করে দু'চারটে কথা বললেন।···

পত্রাবলী

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.　　　　　　　　　　ওঁ

[Darjeeling ?]
Monteagle Villa
18th November 1896
Tuesday

মা,

আমি ভাই কৌটা পেয়েছি। একটা ঢাকাই ধুতি আর একটা··· পেয়েছি। বেলা[১] তার সঙ্গে একটা চিঠি লিখেছে, আর তাতে লিখেছে যে যেদিন আমি কাপড় পাব তার পরের দিন খাবার পাঠাবে কিন্তু আমি ত পাইনি। তোমার চিঠি অনেকদিন পরেও পেলুম না। আমাদের কলকাতায় যেতে আর বেশী দেরি নেই, এই পাঁচদিন আছে। এখানে আজকাল বরফ পড়ে ঠিক নুনের মত ছোট ছোট। আর খুব ঠাণ্ডা। তুমি বলেছিলে যে তোমাকে সেই ঘাসের মধ্যে এক রকম ফুল পাওয়া যায়, সেইগুল আনতে চেয়েছিলুম ত প্রতিভাদিদি[২] বল্লেন যে সেগুল রেলগাড়িতে আনতে গেলে সব ফুলের পাতাগুল উড়ে যাবে, তাই বলে এক রকম ঘাসের ফুল নিয়ে যাচ্ছি। আমি তবে এইখানেই শেষ করি। ইতি

রথী

২.　　　　　　　　　　ওঁ

শিলাইদহ
[১৮৯৭ খৃস্টাব্দ ?]

শ্রীচরণেষু,

বাবা কাল সকালে কলকাতায় যাবার ঠিক করেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে এখন যেতে পারলুম না। শুনছি সোদ্দা[৩] অল্প দিনের মধ্যেই

চলে যাচ্ছেন্ তুমি যদি তাঁর সঙ্গে যাও, তা হলে আমার সঙ্গে আপাতত দেখা নাও হতে পারে। তুমি যখনই যেখানে যাও মাঝে মাঝে চিঠি লিখতে ভুলো না।

আমার এখানে খুব ভালো লাগছে— পদ্মার ওপারে আর কিছুদিন পরে মস্ত বড় চর পড়বে তখন চমৎকার হবে। আজ সমস্ত দিনই বেশ শীতের হাওয়া দিয়েছে শীঘ্রই ঠাণ্ডা পড়ে যাবে। তোমার কথামত আমি নদীতে এখনও স্নান করছিনে—তবে কতদিন সে লোভ সামলাতে পারব বলতে পারছিনে। এখন কুমীর নেই— কিন্তু প্রায় রোজই বোটের কাছে ঘড়িয়াল ভেসে উঠছে। তোমার শরীর এখন কেমন আছে? মীরা[৪] কেমন আছে? আমি খুব ভালই।

ইতি

রথী

৩. ওঁ

কলিকাতা

শুক্রবার

[ডিসেম্বর ১৮৯৯ খৃস্টাব্দ ?]

শ্রীচরণেষু

মা, কাল রাত্তিরে এখানে এসে পৌঁছিয়েছি। গাড়ি খালি ছিল নৈহাটি পর্যন্ত তারপরে একটা গোরা জুটেছিল। কিন্তু সে সৌভাগ্যক্রমে সাহেবের[৫] বন্ধু ছিল। নীদ্দার[৬] কাশী কাল খুব কম ছিল। কর্ত্তাদাদামশায়ের[৭] কাছে গিয়েছিলুম। আজ বোলপুর যাচ্ছি। একটু মুশকিল হবে যে পুল ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকবে, ষ্টিমারে পার হতে হবে। ন মায়ের[৮] সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১২টা টাকা যে দিয়েছিলে তার ১০ টাকা ১৫ আনা রেল ও ষ্টিমার খরচ হয়েছে। ১ টাকা

১ আনা বাকি আছে। বাড়ির সবাই ভাল আছেন। তোমরা কেমন আছো লিখ?

ইতি
রথী

৪ ওঁ

[কলিকাতা, ১৪ ডিসেম্বর ১৯০০]
বুধবার

শ্রীচরণেষু

মা, তোমার চিঠি কাল পেলুম। নীতু দাদার[৯] কাছে প্রায়ই যাই। বোলপুর থেকে তেল, কদমা, খেলনা কিনে এনেছি। ওল পেলুম না। আজ সার্কাস দেখতে যাব! কাল বিসর্জ্জন হবে। কাল দেখতে যাব বলে আজ সেটা পড়ে রাখলুম। শুক্রবারে সব জিনিস কিনতে যাব। শনিবারে বিবিদিদির[১০] জন্মদিন। বেলা[১১] যদি কিছু দেয় ত শীঘ্র পাঠিয়ে দিক। নীদ্দার[১২] কাল রাত্তিরে ঘাম হয়ে জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল। আজ সকালে ১০০। অন্যদিন ১০১ হয়। প্রতাপবাবুই[১৩] দেখছেন। আজ সুহৃৎকে[১৪] দিয়ে examine করবার কথা ছিল। তিনি এখন আসেন্নি। সাহেব[১৫] কাল যাবে। সুশী বৌঠান[১৬] চিঠি লেখেন না কেন? তাঁর উকুন হয়েছে বলে বোধহয় খুব ব্যস্ত থাকেন তাই লেখা হয় না। আমরা সব ভাল। তোমরা কেমন আছ লিখ।

ইতি
রথী

শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১০ ওঁ

টোকিয়ো
জাপান

ভাই শমী,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আমি তোমাকে চিঠি লিখতে পারি নি বলে কিছু মনে কর না, আমাদের এত চিঠি লিখতে হয় যে দু' একবার না পেলেও তুমি চিঠি লেখা বন্ধ কর না।

তোমাদের জাপানী পড়া এগোচ্ছে শুনে খুশি হলুম। আমাদের এখন দুঃখ হচ্ছে কেন জাপানী শিখে এলুম না। এখন থেকে জাপানী শিখে রাখলে যদি কখনও জাপানে এসো ত খুব সুবিধে হবে। এখন কি একটু ২ কথা বলতে পার? শুধু পড়লে হবে না, নিজেদের মধ্যে ও সানো সানের[১] সঙ্গে খুব কথা বলতে চেষ্টা করবে।

তোমরা এখন কি রকম জুজুৎসু শিখলে? আজকাল কি রোজ জুজুৎসু হয়? বৃষ্টি পড়লে কি কর? আমি সানো সান্ যে ইস্কুলে জুজুৎসু শিখেছিলেন সেই ইস্কুলে গিয়েছিলুম, আমাকে দু' একজন মাষ্টার কি রকম শিখেছি দেখবার জন্যে তাদের সঙ্গে করতে বললেন, আমাকে তিন জনের সঙ্গে করতে হল। সানো সানের ভাইয়ের সঙ্গে দু' দিন দেখা হয়েছিল।

এতদিনে তোমাদের ওখানে বোধহয় গরম শেষ হয়ে বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। এখানে এখন এখানকার গরমিকাল, আমাদের বসন্তকালেরও চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা। তোমাদের পড়াশুনা কেমন চলছে? আমরা ১০।১২ দিন পরে আমেরিকা যাবার জাহাজে এখান থেকে ছাড়ব। আমেরিকা পৌঁছতে ১৪ দিন লাগবে। আমেরিকায় আমাকে চিঠি লিখ।

ইতি শনিবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

দাদা

ওঁ

.9/8 Illinois St.
Urbana
Ill.

ভাই শমী

আরবারে তোমার এক মস্ত চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু সময় ছিল না বলে উত্তর দিতে পারি নি। এবারেও তোমার এক ছবির পোষ্টকার্ড পেলুম— কিন্তু এগুলো আমি চিঠি বলে গণ্য করি নে, বুঝলে ?

এখানে সভাসমিতি ছাড়া প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই দু একটা বক্তৃতা হয়— মাঝে ২ দেশের অনেক বড় লোক এসে বক্তৃতা করেন। সেদিন একটা বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম— তাতে এখানকার একটা বড় খবরের কাগজ 'Chicago Tribune'এর War Correspondent কি করে এ কাগজ বের করা হয় সেই সম্বন্ধে ছবি দেখিয়ে বক্তৃতা দিলেন। এখানে একটা কাগজ বের করা কি কঠিন ব্যাপার তা বোঝা গেল— কতরকম কলকারখানা তার ঠিক নেই— এই কাগজের জন্যে যে কল ব্যবহার করে তাতে ঘণ্টায় ১২ হাজার করে সচরাচর ছাপা হয়। একটি ছাপাখানায় কত departments তার ঠিক নেই— সব চেয়ে মজা লাগল যখন একটা ঘর দেখালে যাকে ওরা বলে graveyard। এখানে পৃথিবীর সব বড় লোকের খুঁটিনাটি জীবনী সংগ্রহ আছে— একবার মরলে হয়, অমনি তখনি তার ইতিবৃত্ত সব বেরিয়ে যাবে। কাগজের জন্যে কি করে খবর সংগ্রহ করে শুনলে অবাক হতে হয়— এমনি সব ব্যবস্থা যে কি বলব। আর কিছুদিন পরে Negroদের মধ্যে যে সবচেয়ে বিখ্যাত লোক Booker Washington[২] তিনি এখানে বক্তৃতা করবেন— তিনি নাকি খুব ভালো বক্তা। কি রকম বক্তৃতা দেন শুনলে পরে লিখবে।

তোমার পড়াশুনা কি রকম চলছে ? এখন কি পড় ? বিদ্যালয়ে

সকলে কেমন আছেন ? এখন কত ছেলে হয়েছে ? তোমরা আজকাল কি খেলো ? এখানে এখন baseball খেলার season— ছেলেরা খুব baseball খেলছে— আমাদের Cosm Club[৩] থেকে একটা baseball team করা হয়েছে— অনেক সময় নেয় বলে আমি খেলতে পারি না। আর কিছুদিন পরে baseball matches আরম্ভ হবে— এই বিশ্ববিদ্যালয়ের baseball-এ খুব সুনাম আছে, বোধহয় কতকগুলো খেলায় জিততে পারে। এ বছর ফুটবলে কিন্তু বড্ড হেরেছে। আমাদের এই সপ্তাহ থেকে Phys training আর হবে না, তার বদলে দুদিন করে military হবে। এ চিঠি যখন পাবে তখন বোধ হয় ১লা বৈশাখ হয়ে যাবে— এবারে কি হল সে সব লিখো। কি রকম গরম পড়েছে ?

আমরা ভালো আছি।

ইতি। রবিবার

দাদা

রাজলক্ষ্মী দেবীকে লিখিত

১. ওঁ

টোকিয়ো

জাপান

শ্রীচরণেষু দিদিমা,

তোমাদের চিঠি পেয়ে কি যে খুসি হয়েছি, সে কি বলব। এত দিন কেবল আমরাই তোমাদের চিঠি লিখে এসেছি, সেদিন তোমাদের চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দ হল। জাপানে এসে অবধি এত ব্যস্ত আছি যে এতদিন চিঠি লিখতে পারি নি। এক মুহূর্তও যদি অবকাশ থাকত তাহলে সকলকে চিঠি লিখতুম। জাহাজ থেকে ভেবে এসেছিলুম,

জাপানে গিয়ে একটু রয়ে বসে তোমাদের সব খুব বড় বড় চিঠি লিখব। কিন্তু এসে অবধি এত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে যে বড় চিঠি লেখা ছাড়া একটা পোষ্টকার্ড লেখবারও সময় পাই নি। এতদিন পরে এখন একটু নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতে সময় পেয়েছি। এমন মজা, এতদিন যেমন খুব কাজ ছিল এখন তেমনি আবার কিছু কাজ নেই, এখন বোধ হয় দিন দশ পনেরো চুপচাপ বসে থাকতে হবে। আমাদের পরশুদিন একটা জাহাজে আমেরিকা যাবার কথা ছিল, এখানে এমনি মুস্কিল জাহাজ ঠিক করলেই যেতে পারা যায় না, ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করে পাশ না করলে টিকিট কিনতে দেয় না। আমরা সেদিন চোখ দেখাতে গিয়েছিলুম, তাতে সন্তোষকে[১] আর আমাদের সঙ্গে আর একটি ছেলে যাচ্ছিল তাকে পাশ করলে, আমাকে চোখে কি একটা সামান্য লাল দাগ ছিল বলে পাশ করলে না। চোখ দেখাবার এই অদ্ভুত নিয়মের জন্যে সেদিন যাওয়া হল না। আর একটা জাহাজ ৮ই জুন যাবে তাতে জায়গা ঠিক করে এসেছি। আজ একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম, সে একটা ওষুধ দিয়েছে, বলেছে দু চার দিনের মধ্যে সে লাল দাগটুকু চলে যাবে। সন্তোষেরও ওরকম একটু দাগ আছে, সেদিন ওকে তাড়াতাড়ি দেখেছিল বলে ধরতে পারে নি। এবারে 2nd classএ যাচ্ছি, চোখ নিয়ে বোধহয় বিশেষ কিছু গোলমাল করবে না।

জাপানে ভাষা না জেনে আসলে কোনই লাভ হয় না। এখানকার খুব কম লোকে ইংরেজি জানে, যারাও বা জানে, তাদের সঙ্গে নেহাৎ কাজের কথা ছাড়া বেশিদূর এগোবার জো নেই। বাইরে থেকে দেখে শুনে যা কিছু এদের ভাবভঙ্গি বুঝতে পারছি। বাইরের লোক এসেই জাপানীদের ভদ্রতা দেখে অবাক হয়। ছোটলোকেরা পর্যন্ত এত ভদ্র যে কি বলব। রাস্তায় পথ হারিয়ে গিয়ে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায় তো সে নিজে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবে।

এদের দেশে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি প্রায় নেই, ওরা এত আস্তে আস্তে কথা কয় যে আমরা যখন পরস্পরের মধ্যে কথা কই, তখন ওরা ভয় পায়, মনে করে বুঝি এরা ঝগড়া করছে। সব চেয়ে ভালো লাগে ওদের বাড়িগুলো। একটা একটা বাড়িতে পাঁচ ছটার বেশি ঘর থাকে না, কিন্তু তারই ভিতর এত সুন্দর বন্দোবস্ত! বাড়ি কাঠ আর কাগজ দিয়ে তৈরি, মেজেতে মাদুরের এক রকম গদি দেওয়া ; নিজে না দেখলে বুঝতে পারবে না কি রকম। আমাদের দেশে এরকম বাড়ি করলে ছেলেরা একদিনে ছিঁড়ে ঠিক করে দেয়। আমারই অভ্যেস নেই বলে দরজায় কত যে কাগজ ছিঁড়ি তার ঠিক নেই। এরকম বাড়ির একটা অসুবিধে। আগুন লাগলে আর রক্ষে নেই, এখানে প্রায়ই আগুন লাগে। সেদিন আমাদের বাড়ির কাছেই একটা পাড়া পুড়ে গেছে। এখানকার দাসীরা এত চমৎকার, বিশেষ যদি বুড়ি হয়, খুব কাজ করতে পারে আর মায়ের মতো যত্ন করে, তোমরা যদি এরকম একটা দাসী পাও তো খুব খুশি হও। বেশি মাইনে না ৪।৫ টাকা।

আমরা এর মধ্যে টোকিয়ো ছেড়ে বেশি কোথাও যাই নি। মাঝে মাঝে কাজের জন্যে YOKOHAMA যেতে হয় ; একবার কাওয়াগুচি সানকে[২] নিয়ে নিক্কো দেখতে গিয়েছিলুম। আমাদের জাহাজ কোবেতে থামল না, না হলে OSAKO, KYOTO সব দেখে আসতুম। এখান থেকে গিয়ে ফিরে আসা অনেক খরচ, তা ছাড়া জাপানী না জেনে কোথাও যাওয়া অসম্ভব ; একজন guideকে নিয়ে গেলেও বেশ সুবিধে হয়, কিন্তু তাতেও অনেক খরচ।

আমরা যখন এখানে এসেছিলুম তখন খুব শীত ছিল, এখন ক্রমশ গরম হয়ে আসছে। আমাদের শরীর বেশ ভালো আছে। আমেরিকায় গিয়ে তোমার বাতের ওষুধের চেষ্টা করব, তুমি পরের চিঠিতে কোথায় কি রকম বাত হয়েছে সব লিখে পাঠিও। আমরা

আমেরিকায় পৌঁছলে আমাদের ও সানোসানের যে ছবিগুলো তোলা হয়েছিল[৩] তার একটা করে পাঠিয়ে দিও। এতদিনে বোধ হয় বাবার দোতলা ঘর[৪] হয়ে গেছে, কি রকম হয়েছে? আমাদের ঘরে এখন কে আছেন? দিনু[৫] কি বিলেত চলে গেছে? তোমার বাঘার এখন কি রকম দশা হয়েছে? কুকুরগুলো কি বেশ বড় হয়ে উঠেছে? সমীর[৬] এখন কি করে? এতদিনে বোধহয় সে দু' চারটে কথা বলতে শিখেছে। তোমরা এখন বোধহয় খুব আম খাচ্ছ, দাঁড়াও কিছুদিন সবুর কর আমাদের আমেরিকা যেতে দাও, দেখবে লিখে পাঠাব কত রকমের ফল খাচ্ছি। আজ অনেক চিঠি লিখতে হবে।

ইতি ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩ রথী

দিদিমা,

লজ্জায় রথী কালু বেচারীর কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেনি—নগেনবাবুকে[৭] দিয়ে যদি তার একটি ছবি আঁকিয়ে পাঠিয়ে দেন ত আরও খুশি হয়ে আপনার বাতের তেলের খোঁজ নেবে। শুনলুম মজঃফরপুরে এবার খুব আম আর লীচু হয়েছে, তার কিছু প্রমাণ পাচ্ছেন কি না লিখবেন।

সন্তোষ

২.

[ইলিনয়, আমেরিকা]

শ্রীচরণেষু

দিদিমা, তোমার চিঠি না পেলে আর চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে না। এতদিন এলুম কারও একটা চিঠিপত্র নেই, ভালো লাগছে না। এখানকার কি খবর দেব ভেবে পাচ্ছি না। এখনও বেশ গরম চলছে, এখানে গরম বড় কম হয় না। মাঝে ২ বৃষ্টি পড়ে একটু ঠাণ্ডা হয়। আমাদের পড়াশুনা বেশ চলছে, আর সপ্তাহখানেক পরে এক

মাসের ছুটি হবে। তোমাদের ওখানে এখন খুব বৃষ্টি, না? বাঁদ এখন কি রকম ভরে উঠেছে? আমরা নেই এখন বৃষ্টিতে বোধ হয় ভিজতে কেউ বড় বেরোয় না। সুবোধবাবু[৮] আর জগদানন্দবাবুর[৯] শারীরিক অবস্থা কি রকম? মীরা[১০] ও কাকীমার[১১] খবর কি? পুণ্যবজ্রা দার্জিলিঙে গিয়ে শমী[১২] বোধহয় কিছু অসুবিধে হয়েছে। সে কি ফিরে এসেছে? সানোবাবু[১৩] আজকাল কি করছেন? তাঁর পাশের ঘরে এখন কে আছে? তিনি কি এখন বাংলা বলতে পারেন? বাবা এখন কোথায়? তোমরা এবার পূজোর ছুটির সময়ে কোথায় যাবে? আমরা ভাল আছি। ইতি

২০শে শ্রাবণ ১৩১২ [১৩১৩ ?] রথী

পুঃ চিঠি যখন পাবে তখন বোধহয় পূজোর ছুটি হয়েছে কিম্বা হব হব হয়েছে। কে কোথায় গেলেন আমাদের লিখ। আমরা সকলকে বোলপুরের ঠিকানাতেই চিঠি লিখব, কেউ যদি সেখানে না থাকে, তবে চিঠির ঠিকানা বদলে দেবার ব্যবস্থা করে যেও।

৩. ওঁ

9/8 Illinois St
Urbana

শ্রীচরণকমলেষু

দিদিমা, তোমার ১৫ই ফাল্গুনের এক মস্ত বড় চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলুম। আমাদের ঈষ্টারের জন্যে তিন দিনের ছুটি হয়েছে— কিন্তু বেশি অবসর নেই; কালকে তো সমস্ত সকাল বেলাটা কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটরিতে কাজ করা গেল— কিছু এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট বাকি ছিল— এই বেলা সেগুলো সেরে না রাখলে পিছিয়ে পড়তে হবে। কাল বিকেল বেলায় বাজে কাজেই সমস্ত সময় নষ্ট হল— বুড়ির হঠাৎ ঘর পরিষ্কার করবার ঝোঁক হল, কার্পেট উঠিয়ে জিনিসপত্র উল্টে পাল্টে

ঘরটর ধুয়ে পুঁছে তো চলে গেল, তার পর সেগুলো সব গুছিয়ে ঠিক করে রাখতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। আজ সকাল বেলায় কলেজের ক্ষেতে কি রকম চাষ করেছে দেখতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম— কত রকমই যন্ত্র যে ব্যবহার করে তার ঠিক নেই— এখানকার লাঙল দেওয়া যদি দেখ ত অবাক হয়ে যাও— আমাদের লাঙল দেওয়া তার কাছে একটু মাটি আঁচড়ানো মনে হয়। সময়ও খুব কম লাগে— এক ঘণ্টায় বড় ২ ক্ষেত চষা হয়ে যায়। বীজ বুনতেও যন্ত্র ব্যবহার করে— সে যন্ত্রটা এমনি তাতে মই দেওয়া, বীজ বোনা ও তারপর বীজের উপর মাটি চাপা দেওয়া সব একসঙ্গে হয়। এত দিন চাষাদের বিশেষ কাজ ছিল না— এখন থেকে হাড়ভাঙানো কাজ আরম্ভ হল। বোধ হয় আর এক সপ্তাহের মধ্যেই সকলে চাষ শেষ করে বীজ বুনে বসে থাকবে। আমাদের দেশে বীজ বোনার পর মাঝে ২ ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই কাজ থাকে না— এখানে কিন্তু তা নয়— ফসল লাগাবার পর প্রত্যেক আট দশ দিন অন্তর (তার মানে প্রত্যেক বৃষ্টির পর) জমি চষবার— cultivate করা plowing নয়— নিয়ম ; এতে জঙ্গল বাড়তে দেয় না— জমিও শুকোয় না। বেশি জঙ্গল হলে জঙ্গল কাটবার এক রকম বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে তাকে weeder বলে— তাতে জঙ্গল কাটা হয় – জমিরও চাষ হয় ; এ সব যন্ত্রই ঘোড়া দিয়ে চালায়। জমি সরস রাখবার উপায় কি জানো— মাটির নীচেটা ঝুরঝুরে অথচ জমাট (compact) থাকবে, আর উপরের দু তিন ইঞ্চি আল্‌গা (loose) থাকবে— সর্বদা এই রকম থাকলে রোদে বেশি জল টেনে নিতে পারে না, অথচ শিকড়ে বেশি জল পায়। বেশি বৃষ্টির পর উপরকার মাটিটা জমাট বেঁধে যায়— ও যদি আলগা করে না দেওয়া যায় ত শিগ্‌গিরই যে জলটুকু পেয়েছিল তা উপে যায় ; এইজন্যে এখানে বৃষ্টির পরই মাটি আলগা করে দেওয়া নিয়ম। তবে অধিকাংশ সাধারণ

চাষারা যে এই নিয়ম মেনে চলে তা নয়— সব দেশের চাষাই সমান— পিতৃপিতামহদের আমল থেকে যে অভ্যেস চলে আসছে সে ছড়ানো বড় সহজ নয়।

চাষের কথা দিয়েই ত চিঠি ভরিয়ে দিলুম, আর নয়— ভয় হয় আবার বঙ্গদর্শনে ছাপিয়ে দেবে। হাঁ, মাঘের বঙ্গদর্শন এসে উপস্থিত —জগদানন্দবাবু সেই চিঠি থেকে প্রবন্ধ খাড়া করে তুলেছেন[১৪] বটে —কিন্তু আর একটু ভাষা সংশোধন করে দিলে ভালো হত। জগদানন্দবাবু মেয়ের বিয়ে নিয়ে গোলমালে পড়েছিলেন, তার কি হল? অন্য ভালো পাত্রের সন্ধান পেলেন কি?

তোমার ফলের বাগানে খুব ফল ধরেছে শুনে খুশি হলুম— এত দিনে সেগুলো নিশ্চয়ই বেশ বড় হয়েছে— কি রকম খেতে হয় লিখো। গাছগুলো যদি বেশ জোরালো হয় ও বেশ বাড়তে থাকে তা হলে মুকুল ভেঙে দেবার বিশেষ প্রয়োজন নেই— যে সব গাছ স্বাভাবিক-ভাবে বাড়তে থাকে এখানে তার মুকুল কখনও ভেঙে দেয় না। এবারে খুব আম হবে শুনে খুশি হলুম— যদিও আমাদের ভাগ্যে কেবল আমসত্ত্বই আছে। এখনও আমসত্ত্বগুলো আছে— ফুরোতে পারি নি। আজ এখানেই শেষ করি— আরও অনেক চিঠি লিখতে হবে— পড়াশুনোও বিস্তর আছে। ইতি শনিবার চৈত্র ১৩১৩

রথী

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

১।   ওঁ

21 Cromwell Rd
S. Kensington
London. S. W.
6th Sep. 1912

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে এত দিন চিঠি লিখি নি তার কোনও excuse আছে কি না জানি না— দিতেও চেষ্টা করব না। তবে আমাদের এখানকার কিছু কিছু খবর বোধ হয় খবরের কাগজে জানতে পেরেছেন— সেই-জন্যে কি লিখব কি বাদ দেব ঠিক করতে পারছি না। আমরা বম্বে থেকে মার্সাইতে নেবে সোজা লণ্ডনে চলে এসেছি— কেবল পথে একদিন মাত্র প্যারিতে থেকে সহরটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলুম —তাতে কিছুই দেখা হয় নি— কেবল দেখবার ইচ্ছে সাতগুণ বেড়ে গেছে। লণ্ডনে এসে সেই যে বসেছি আর কোথাও নড়া হচ্ছে না— তার প্রধান কারণ হল এই যে এখানে বড্ড জমে গেছে। বাবার আগে থেকেই এখানকার একজন বেশ বড় artist, Mr. Rothenstein[১]এর সঙ্গে ভারতবর্ষে আলাপ হয়েছিল— আমরা প্রথমটা এসে তাঁর বাড়ির খুব কাছেই ছিলুম, ও সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে ভালোরকম মেশবার খুব সুযোগ হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে আবার প্রায়ই এখানকার অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও আর্টিস্টদের মজলিস হত— সেই সূত্রে অনেক ভালো ভালো লোকদের সঙ্গে আমাদের খুব আলাপ হয়ে গেছে। বাবা এখানে আসবার আগেই ওঁর কতকগুলো কবিতা তর্জমা করে এনেছিলেন— এখানে এসেও অনেকগুলো করেছেন— এই কবিতা পড়ে এখানকার সকলেই খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন— তার মধ্যে Irish Revivalএর মস্ত কবি

Mr. Yatesই[২] সবচেয়ে enthusiast। বাবাকে এখানকার India Society যে dinner দিয়েছিল তার বর্ণনা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছেন— সেই dinner-এ Mr Yeats খুব feelingly বাবার লেখার প্রশংসা করেছিলেন। India Society বাবার শ'খানেক কবিতার তর্জমা— এগুলো সবগুলোই নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি থেকে নেওয়া— দু'এক মাসের মধ্যেই বের করছে। বই ছাপা হয়ে গেলে আপনাকে একখানা পাঠিয়ে দেব। বাবা মাঝে কিছুদিন countryতে গিয়ে ছিলেন— সেখানে আরো অনেকগুলো লেখা— শিশু, মালিনী, চিত্রাঙ্গদা ও ডাকঘর— তর্জমা করেছেন। এর মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা' সকলের খুব ভালো লাগছে। শেষ দু'মাসের Modern Review যদি পড়েন তো বাবার সম্বন্ধে অনেক খবর পাবেন। এখানে যে এই রকম appreciation হবে, এটা একেবারেই আশা করা যায় নি। এবারে বুঝতে পারছি যে এদের মধ্যে এখনও সব অনেক খুব ভালো ভালো উঁচু দরের লোক আছে— যাদের কথা আমরা শুনতে পাই না— that small minority, যাদের সাধনার জোরে এখনও এই দেশটা এমন সজীব রয়েছে। এদের মধ্যে যারা সত্যিকার ভালো লোক - তারা এতদূর ভালো যে আমরা কল্পনা করতে পারি না, আমাদের দেশে সে রকম character যেন দেখতেই পাওয়া যায় না। বাবার লেখার একটা খুব demand হয়েছে— তর্জমা করতে পারলে ওঁর অনেক বই এখানে খুব বিক্রি হবে— এই রকম publisherরা আশা করছে। দু'চারটে তর্জমা হয়েছে, বাবা নিজেই বেশির ভাগ করেছেন, কিন্তু এখনও সমস্তই পড়ে রয়েছে। আপনি দু'একটা চেষ্টা করে দেখবেন? এখানে লেগে গেলে আর্থিক সুবিধাও যথেষ্ট হতে পারে। যদি করেন তো বাবাকে পাঠিয়ে দেবেন।

এখানে এবার ভারি বিশ্রী weather চলছে। সমস্ত গ্রীষ্মকালটাই ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি বাদলায় কেটে গেল। এখনও বৃষ্টির বিরাম নেই।

আমরা বোধহয় নভেম্বর পর্যন্ত এখানে আছি— তার পর আমেরিকায় যাবার কথা আছে— কিন্তু এখনও অবিশ্যি কিছু নিশ্চিত ঠিক নেই। আপনার এতদিন কোনও চিঠি পাই নি— যে আপনাদের খবর জানবার জন্যে বিশেষ উৎসুক আছি জানবেন ও নিশ্চয়ই শীঘ্র একটা উত্তর দেবেন। সকলে কেমন আছেন? 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্র' কি দেখেছেন— ভালো লাগতে পারে। আমরা ভালো আছি।

ইতি

রথী

২.

SANTINIKETAN

BENGAL

INDIA

26th NOV, 40

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ভর্ৎসনা deserve করি। সে বিষয়ে বলবার কিছু নেই। তবে এইটুকু জোর করেই বলব যে আপনাকে ইচ্ছে করে উপেক্ষা করি নি— করবার কোনোদিন ইচ্ছে হয় নি।

যে ঘটনাচক্রে চিঠি লেখা হয়ে ওঠেনি তা বলছি। বাবার সুদীর্ঘ কাল কঠিন অসুস্থতার মধ্যে আমাকে সব কাজ ফেলে রেখে ২॥ মাস ওঁর চিকিৎসা এবং সেব্যর ব্যবস্থায় ঐকান্তিকভাবে মনোযোগ দিতে হয়েছিল। এখনো তিনি শয্যাশায়ী। বাইরের লোকের কারো সেবা গ্রহণ করেন না বলে নার্স রাখা সম্ভব হয় নি, সব কাজই নিজেদের করতে হয়। বাবার অসুখের মধ্যেই আমার দুই সহকর্মীর মারাত্মক অসুখ করে। প্রথমে কিশোরীবাবু[৩] মারা গেলেন, তারপর গোরা (গৌরগোপাল ঘোষ)। এঁদের দুজনেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা

থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধাদি এবং দুঃস্থ পরিবারের ব্যবস্থা সব আমাকে করতে হয়েছে। এখানে বাবাকে নিয়ে আসবার পর ভেবেছিলুম একটু সময় পাব— কিন্তু প্রায় তিন মাস অনুপস্থিতির ফলে আফিসের যা কাজ জমে গেছে তার গতি করতে আমার অন্তত মাস খানেকের পরিশ্রম লাগবে: কালীমোহনবাবু[৪] কিশোরীবাবু ও গোরা এই তিন জনের মৃত্যু এবং ধীরেন সেন[৫] আমাদের কাজ ছেড়ে Govt. of Indiaয় চলে যাওয়ায় আমার নিজের কাজ ছাড়াও চারজন heads of departmentsএর সম্পূর্ণ দায় আমার ঘাড়ে পড়েছে। এঁদের কাওকেই নতুন লোক দিয়ে replace করতে পারিনি— শীঘ্র পারবও না। এরপর আরো বিপন্ন হয়েছি— বাংলায় দুর্ভিক্ষ লেগেছে। জমিদারির আদায় বন্ধ, ভাত-কাপড়ের সংস্থানের দুশ্চিন্তা। এ অবস্থায় চিঠির জবাব দেওয়া দূরের কথা— রাত্রে ঘুম হওয়া কঠিন হয়েছে। নিজের শরীরের অবস্থাও ভালো নয়— তাই এইভাবে কতদিন চালাতে পারব ঠিক বলতে পারি না। এখন বুঝতে পারবেন ভর্ৎসনার চেয়ে pity পাওয়াই উচিত ছিল। আমাদের একজন পুরানো মাস্টারমশায়, কয়েক বৎসর পূর্বে retire করেছেন, তাঁর কাছ থেকে আজকের ডাকে যে চিঠি পেয়েছি আপনার দৃষ্টির জন্য পাঠালুম। তার থেকে আমার অবস্থা বুঝতে পারবেন— তিনি নিজে রোগশয্যায় থাকা সত্ত্বেও ঠিক অনুভব করেছেন। ইতি

রথী

৩.

'UTTARAYAN'

SANTINIKETAN, BENGAL

May 20 [1942]

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার Pearl Buck[৬]এর বই ভালো লেগেছে জেনে খুশী হলুম। এত তন্ন তন্ন করে বিদেশি সমাজের সাধারণ জীবনযাত্রার

ভিতর প্রবেশ করাও এত সহজ ভাবে তার বর্ণনা করা, এত deep sympathy খুব কম দেখা যায়। এঁর বইয়ের সঙ্গে আর একটি বই যদি পড়েন তবে চীনের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে পুরোপুরি একটি ছবি পাবেন। Lin Yu tangএর 'My Countrymen' বইখানা খুবই ভালো লাগবে আপনার। খুব সমাদর হয়েছে—যেমন insight তেমনি ভাষার style।

নলিনীবাবুর[৭] বক্তৃতাটা সত্যিই খুব ভালো হয়েছে। তাঁকে তিন দিন আগে congratulate করাতে খুব আপ্যায়িত বোধ করলেন, মাথা নীচু করে রইলেন। তবে কথা হচ্ছে— কতটা ওঁর নিজের লেখা ?

বিশ্বভারতীর Publishing বিভাগ থেকে 'চিঠিপত্র'[৮] ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করে যাওয়া স্থির হয়েছে। প্রথম খণ্ডে মাকে লেখা চিঠিই কেবল ছাপা হয়েছে। এটা কারো ২ হয়তো খারাপ লাগবে—কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, বাবার personality ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখবার নয়। তাঁর জীবনের কোনো ঘটনাই চাপা দিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে অন্যায়। তাঁর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা যত প্রকাশ হয় ততই ভালো। আমি মনে করি আমার right নেই কোনো বিষয় লুকিয়ে রাখার। এই জন্যই আমার কাছে যা কিছু mss, চিঠি, cuttings ফোটো diary প্রভৃতি ছিল—সে collection বড়ো কম নয়—আমি একত্র করে museumএর মতো সাজিয়ে বিশ্বভারতীকে দান করেছি। এই সব materials পাব্লিক বা national property হওয়া উচিত মনে করি। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে ২/৩ জন scholars রাখা হবে— এইসব জিনিস index করে রাখা, এর থেকে নানান বিষয় research করে সেগুলি প্রকাশ করা, জীবনীর materials প্রস্তুত করে রাখা। কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

'চিঠিপত্র' যদিও ইন্দিরা দিদি[9] edit করছেন— আসল কাজটা আমাকে করতে হচ্ছে। যদি দোষ কিছু হয় আমারই।

প্রতিমা আপনাকে তাঁর লেখা নির্বাণ[10] নামে বই এক কপি পাঠিয়েছিলেন। আপনার কি রকম লাগল জানালে খুশি হব।

ইতি

রথী

সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত

লণ্ডন

11th Oct. 1920

প্রিয়বরেষু,

আপনার দুখানা চিঠি পেয়ে যে কত খুশি হয়েছি বলতে পারছি না। আপনাদের কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে কিছুদিন বড় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আণ্ড্রুস সাহেবের[1] অবিশ্যি বরাবর লম্বা লম্বা চিঠি আসত— কিন্তু তাতে আমার মন তৃপ্ত হত না— ওঁর চিঠি থেকে আসল কিছুই খবর পেতাম না। আপনি যে সমস্ত খবর দিয়ে এত লম্বা চিঠি শেষ পর্যন্ত লিখবেন তা কখনো আশা করি নি। আশা করি নি বলেই আরো এত ভালো লাগল। যখন ভগবান প্রসন্ন থাকেন তখন বৃষ্টি হয় না তো ঢল নামে— একটা ইংরেজি প্রবাদ আছে। আপনার চিঠি তো পেয়েছি— আবার গৌরবাবুরও[2] দু' দুখানা চিঠি এবং ছবি এসে হাজির। তাকে ধন্যবাদ দেবেন— পরে লিখছি বলবেন। চাই কি এই চিঠিটাও ভাগাভাগি করে নিতে পারেন। আপনারা অনেকে হয় তো আমাদের চিঠি না পেয়ে একটু দুঃখিত হয়ে রয়েছেন এইরকম ভাব বুঝলুম— কিন্তু জাহাজ থেকে যে অনেককেই চিঠি লিখেছিলুম সেগুলো কি তাহলে পৌঁছয় নি? জগদানন্দবাবু,

সন্তোষ, দিনু[৩] এদের সকলকেই তো লিখেছিলুম— জগদানন্দবাবু জবাব দিয়েছেন কিন্তু আর কেউ তো সাড়া শব্দ দেন নি। উল্টে আমাদের উপর অভিমান করলেন কেন?

আপনি খবর চেয়েছেন? কিন্তু খবর কি দিই তাই ভাবছি। যে সব দিন চলে গেছে তারই কেবল খবর দিতে পারি— যা ঘটতে বাকি আছে তার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করতেও ভরসা পাই না। আপনি তো জানেন আমাদের প্রকৃতি— আপনাকে আজ এক কথা লিখব— কাল তার উল্টোটা ঘটবে। up to date খবর দিই কি করে? সবই যে মিছে হয়ে যাবে। এই দেখুন না— আজ ১১ই তারিখ, 'ভদ্রলোকের এক কথা' যদি সারসত্য হত এবং খবরের কাগজগুলো যদি সবই না মিথ্যা কথা লিখত তাহলে আজকের দিনে আমাদের তিন জনের অ্যাটলান্টিক মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে মার্কিন দেশের তীরাভিমুখে ধাবমান হওয়া উচিত ছিল। তা না হয়ে, আমরা দুজনে কেমন লণ্ডনের এক flat-এ দিব্যি আরাম কেদারায় বসে নিশ্চিন্তমনে চিঠিপত্র লিখছি— আর বাবা প্যারিসের এক কোণে এতক্ষণ বোধহয় খাওয়া-দাওয়া সেরে পিয়ার্সন সাহেবকে[৪] নিয়ে বসে নানান সম্ভব-অসম্ভব প্ল্যান করছেন আর কল্পনায় পরম সুখ অনুভব করছেন। সেই প্ল্যানগুলো কল্পনারাজ্য থেকে নামিয়ে এনে কাগজে কলমে যদি আপনাদের সামনে ধরে দিই তাহলে যে কেবল রসভঙ্গ হয় তা নয়— মিথ্যাসাক্ষীর ফৌজদারি মকর্দমার আসামী হবার ভয় থাকে। কাজ নেই— তার চেয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুই-ই বাদ দিয়ে অতীতের সোজা পথে চলা যাক— সেখানে কল্পনার বালাই নেই— সে যে বাস্তব ইতিহাস। তবে এই ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই এতদিন অ্যাণ্ড্রুস সাহেবের চিঠি থেকে আপনারা শুনতে পেয়েছেন। জানি না তিনি আপনাদের চিঠিগুলো পড়ে শোনান কি না।

লণ্ডন ছেড়ে অবধি অনেকদিন পর্যন্ত প্যারিসেই ছিলুম। সেখানে

আমাদের ভারি জমেছিল। বিদেশে যতদিন থেকেছি— এ রকম আরামে বাড়ির মতো কোথাও থাকি নি। থাকবার সুখ যেমন ছিল— লোকজনের সঙ্গে আলাপ করেও তেমনি মনের আনন্দ পেয়েছিলুম। যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম"— তিনি আমাদেরই দলের লোক— অর্থাৎ কি না, একটি আস্ত পাগল। তাঁরও বাবাকে বড়ো ভালো লেগেছে— তিনি সব কাজ ফেলে রোজ সন্ধেবেলায় পা টিপে টিপে একবার বাবার কাছে না এসে থাকতে পারতেন না। এমন সরল, এমন খাঁটি, এমন অমায়িক লোক ইউরোপে আর দেখি নি। প্যারিসে থাকতে সাহিত্যিক দলের গণ্যমান্য অনেকেরই সঙ্গে অবিশ্যি বাবার আলাপ হয়েছিল— তার মধ্যে Bergson-র সঙ্গেই সব চেয়ে কথাবার্তা জমেছিল। তার একটি প্রধান কারণ তিনি বেশ চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন— অধিকাংশ ফরাসীরাই ইংরেজি জানেন না— জানতে চানও না। তাঁদের নিজেদের ভাষার গুমর খুব বেশি। Bergson বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ মতে মত দিলেন যে পাশ্চমে লোকে intellect-এর চর্চা করে এসেছে কিন্তু তাদের soul খুঁজে পায় নি— এই soul-এর জন্যে তাদের পূর্ব দেশে যেতে হবে। উনি বললেন বাবার Personality পড়ে ওঁর খুব ভালো লেগেছে। উনি নিজে Science এবং Logic-এর পেঁচাল অনেক রাস্তা ঘুরে শেষে যে সত্যে উপস্থিত হয়েছেন— বাবা তাঁর direct intuitive জ্ঞান থেকে সেই সত্য সহজেই খুঁজে পেয়েছেন। এখানকার অনেকেরই সঙ্গে কথাবার্তার পর এইটা বেশ এবারে অনুভব করেছি যে এরা এখন কি রকম ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষের এতদিন যা অতুল ঐশ্বর্য ছিল— এরা তারই দিকে এখন তাকাচ্ছে। কিন্তু আমরা তাই-ই খোয়াতে বসেছি— আর এদের পরিত্যক্ত নিকৃষ্ট সভ্যতার ছেঁড়া বসন নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি। তাই একজন সেদিন বলছিলেন East-এর দিকে আমরা তাকিয়ে আছি— কিন্তু তোমরা East থেকে mission-

aries পাঠাও না কেন— আমাদের ঘা দিয়ে জাগিয়ে দাও না কেন? তোমরা দেখি কেবলই আমাদের কাছে ছাত্র পাঠাচ্ছ— তারা তো কৈ সেখানকার কোনো বার্তা নিয়ে আসে না— কেবল আমাদের কাছ থেকে ভিক্ষে চায়। এরকম করে হবে না— আমরা চাই— আমাদের দাও। যদি না দিতে পার তবে বুঝব তোমাদের কিছু নেই। সত্যি কথা, আমাদের যা আছে— আমরাই যে জানি না। এইজন্যেই মনে হয় শান্তিনিকেতনের আশ্রমের এত মূল্য। আমরা যদি সকলে সেইটা জানতে পারি— অনুভব করি— তাহলে জগতের কত লাভ। তা না কত ছোট কথা— কত হীনতা! যতবার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসি ততবারই এই মনে হয়— আমাদের মস্ত mission রয়েছে— কিন্তু করবার সামর্থ্য নেই। কিন্তু ছাড়লে হবে না— আমাদের ভারত-বর্ষের স্বরূপকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে— আমাদের আকার দিতে হবে। আমি এখন বুঝেছি— Science বা Technical training ওসব হোক বা না হোক কিছু যায় আসে না— ওর সময় আছে — না হলেও ক্ষতি নেই— কিন্তু শান্তিনিকেতনকে আমাদের ভারতবর্ষের নিজস্ব culture-এর কেন্দ্র করে তুলতে হবে। সেইদিকে আমাদের সমস্ত মন দিতে হবে। যাক্‌ অনেক অবান্তর কথা বলে ফেললুম।

প্যারিস থেকে আমরা Holland-এ গেলুম। মাঝে জার্মানি যাবার ইচ্ছে ছিল— কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ে উঠল না। গবর্ণমেণ্ট থেকে কোনো বাধা ছিল না— এখানকার খবরের কাগজে সেটা ভুল গুজব বেরিয়েছিল— তবে ফ্রান্স থেকে আজকাল জার্মানি যাওয়া বড় হাঙ্গামা। রেল টিকিট কিনতে হলেও এক সপ্তাহ নোটিস না দিলে টিকিট পাওয়া যায় না— আমাদের পক্ষে এক সপ্তাহ আগে থেকে টিকিট কেনা মানে জুয়া খেলা— তাই অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে একেবারে ওলন্দাজদের দেশে যাওয়া গেল। ওখানে আগে থেকেই লোকেরা প্রস্তুত ছিলেন— অভ্যর্থনা খুব ভালো হয়েছিল। ও দেশটা

দেখে বেশ ভালো লাগল— দেখতে যেন ঠিক বাংলার মতো। পাহাড় পর্বত কোথাও নেই— একটা ৪০ না ৫০ ফিট উঁচু ঢিবি আছে সেইটা দেখাবার জন্যে তাদের ভারি আগ্রহ। ছোট ছোট সোঁতা খাল বিলে সমস্ত দেশটা ভরা। দেখতে বেশ কিন্তু আবহাওয়া ভালো না— আমার তো বাতে ধরবার জোগাড় হয়েছিল। সেখানকার বাসিন্দেরা কিন্তু বড় আরামে আছে— ইউরোপের মধ্যে এই একটা জায়গা দেখলুম যেখানে লোকে সত্যিই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করছে। Holland, Denmark প্রভৃতি ইউরোপের ছোটখাটো প্রদেশগুলিতে যেমন অতিমাত্রায় ঐশ্বর্য নেই— তেমনি দৈন্য দারিদ্র্যও একেবারে লক্ষ্য হয় না। সকলেই বেশ সুখে আছে— wealth-এর distribution বেশ সমানভাবেই হয়েছে। দেশ যত বড়; রাষ্ট্রনীতি যত গোলযোগের; লোভ, দ্বেষ, হিংসা যত বেশি— সেখানে দুঃখ দারিদ্র্য তত বেশি।

Holland-এ আমাদের বড় সুবিধা হয়েছিল যে ওরা সকলেই ইংরেজী বলে। Dutch ভাষা কেউ গ্রাহ্য করে না বলে, Dutch-দের সকলকেই ইংরেজী, জর্মান ও ফরাসী তিন ভাষাই শিখতে হয়। এর ফলে তারা ভালো linguists হয়েছে বটে— কিন্তু তাদের নিজেদের সাহিত্য কিছু গড়ে উঠছে না। Dutch কোনো বড় কবি বা লেখক এ পর্যন্ত জন্মায় নি।

Holland-এ গিয়ে আরো ভালো করে বুঝতে পারলুম ইউরোপে বাবার কতটা প্রতিপত্তি। পশ্চিমের লোকেরা ওঁর লেখা, ওঁর ideas কত যে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে— ওকে যে কি রকম ভক্তিশ্রদ্ধা করে তা বিশেষভাবে অনুভব করলুম। লণ্ডন বা প্যারিসের জনতার মধ্যে ততটা বুঝতে দেয় নি। লোকজন অনেকেই আসত বটে— মিষ্টিমিষ্টি কথাও বলত— কিন্তু তার মধ্যে কতটা ঝুঁটো কতটা খাঁটি বোঝা শক্ত। কিন্তু Hollandএর ছোট ছোট সহরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে কত জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি— সর্বত্রই বাবার প্রতি যে অকৃত্রিম

আন্তরিক ভক্তির প্রকাশ দেখেছি তাতে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করেছি। সম্প্রতি Sir J. C. Bose[৬] Norway. Sweden থেকে ঘুরে এসেছেন —তিনি বলছিলেন— সেখানকার লোকেরাও ঐ রকম বাবাকে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে আছে। তাঁর ভারি আশ্চর্য লেগেছে। কিছুদিন আগে ইটালীর মধ্যে দিয়ে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় সৈন্য ট্রেনে করে যাচ্ছিল। একটা ছোট স্টেশনে তাদের ট্রেন থামিয়ে কতকগুলি মহিলা একগাদা ফুল, ফল ও আহার্য তাদের দিয়ে বললেন —"To the Countrymen of Tagore"। তারা মর্মগ্রহণ করেছিল কি না জানি না— তাদের চেয়ে উঁচু দরের অনেকেও আমাদের দেশে করবে কি না বলতে পারি না। যা হোক Holland-এ গিয়ে আমাদের এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছিল— ও ভালো লেগেছিল— যে সকলেই বাবার কোনো না কোনো বই পড়েছে— তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করছে— তাঁর কথা তাদের মনে গিয়ে স্পর্শ করেছে এবং তাঁর থেকে তার প্রতি ও তাঁর দেশের প্রতি তাদের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠছে। এর ফল ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না— ইউরোপে একটা মস্ত Indian Renaissance আসতে পারে। এসেছে বললেও নিতান্ত ভুল হয় না।

Holland থেকে বাবা পিয়ার্সনকে সঙ্গে নিয়ে Belgiumএ Antwerp, Brussels প্রভৃতি সহরে গিয়েছিলেন— আমরা যেতে পারি নি— Hook of Holland থেকে আমরা সমুদ্র পার হয়ে লণ্ডনে চলে আসি। তার কারণ হচ্ছে Amsterdamএ থাকার সময়ই আমাদের প্ল্যান সব একবার বদলে গেল। ৯ই অক্টোবর আমেরিকা যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করা হল— দেশে ফেরবার দিকেই মন ঝুঁকে পড়ল। আমি লণ্ডনে P & O-র Passage-এর চেষ্টায়— ইতিমধ্যে কিন্তু আবার দ্বিতীয় দফা প্ল্যান বদলেছে— আগামী ১৯শে আমেরিকা রওনা হবার সব ঠিক হয়েছে। বাবা প্যারিস ঘুরে আজ লণ্ডনে

আসছেন— আর ঘণ্টাখানেক পরেই এসে পৌঁছবেন। তখন বোঝা যাবে আমেরিকার কতটা chance আছে— ইতিমধ্যে আর কোনো দেশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে কিনা কে জানে।

আপনাকে আর কত লিখব— পোস্ট অফিস এর পর আপত্তি করবে— তা ছাড়া বাবাকে স্টেশনে আনতে যাওয়ার সময় হয়ে আসছে। তার উপর বেশি বড়ো চিঠি লিখতে আজকাল ভয় করে— ফস করে শান্তিনিকেতনে[৭] ছাপিয়ে বসে থাকবেন। দোহাই আপনার জগদানন্দবাবু যেন খোঁজ না পান।

আজ তবে আসি। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রণাম ও আর সকলকে নমস্কার জানিয়ে দেবেন ;

ইতি

রথী

গৌরগোপাল ঘোষকে লিখিত

১.

4. 10. 24

কল্যাণীয়েষু,

তোমার টেলিগ্রাম ঠিক জাহাজ ছাড়বার সময় কলোম্বোতে পেয়েছিলুম। তখন চিঠি লেখবার আর সময় ছিল না। টেলিগ্রাম করা মিথ্যে— ব্যাঙ্কে টেলিগ্রাফের দ্বারা কোনো কাজ হয় না— তারা মানে না। তুমি যে রকম চিঠি চেয়েছিলে এখান থেকে লিখে এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি, ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিও।

এখন তোমরা নিশ্চয়ই ছুটিতে। ছুটিতে এবার নিশ্চয়ই তোমাকে বাড়ীতে থাকতে হয়েছিল। সাংসারিক দুর্ঘটনায় তোমার মন খুব খারাপ দেখে এসেছিলুম। বাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন থাকা দরকার মনে করছিলুম। ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিলে ত ?

আমাদের [জাহাজ] সেই Colombo ছেড়ে অবধি একটানা চলেছে— কাল ডাঙা দেখতে পাব। এ জাহাজটা আবার Aden-এ থামল না— তা না হলে এর আগেই চিঠি দিতে পারতুম। Red Sea-তে ঢুকে অবধি গরম চলছে— বড় কষ্ট বোধ হয়। রাত্রে প্রায়ই হাওয়া থাকে না— বাইরে এসে গল্প করে রাত কাটাতে হয়। এর মধ্যে আমাদের প্ল্যান একটু বদলে গেছে। Port Said থেকে এই জাহাজটা ছেড়ে দেব—এর পরের জাহাজটায় বাকী পথটুকু যাব। তাহলে হাতে দিন পনেরো পাই— সেই সময়টা Palestine, Egypt প্রভৃতি ঘুরে একটু দেখে নেবার ইচ্ছে আছে। Palestine থেকে গবর্ণমেণ্ট এবং University বাবাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে। Port Said থেকে রেল আছে Jerusalem যাবার। এটা মন্দ হবে না।

Tube well-এর অর্ডার ছুটির পরেই দিও। ওদের আবার কত দিন সময় লাগবে আরম্ভ করতে তা ত বলা যায় না। Agreementটা সুরুলের চেয়ে পাকা রকমের কর। আমাদের ওখানে খাবার জলেরও যখন অভাব ঘোচাতে হবে তখন জলের quality guarantee করাতে পারলে ভাল। মাটির samples একটা কাঁচের মোটা tube-এতে যেন নিশ্চয়ই রাখা হয়।

আচারীর[১] সঙ্গে furniture-এর contract হয়ে গেছে— ওকে হাজার টাকা advance দিলেই কাজ সুরু করে দেবে। টাকাটা দেবার জন্যে প্রশান্তকে[২] লিখেছি— যাতে পায় একটু দেখো।

প্রশান্তর কাছে আরো অনেক code তৈরী করে পাঠালুম। এর মধ্যে অনেকগুলোই তোমাদেরও কাজে লাগতে পারে। তুমি প্রশান্তর কাছ থেকে কপি আনিয়ে নিয়ে রেখে দিও।

ছুটির পর মনটাকে হাল্কা করে নিয়ে কাজ শুরু করতে পার ত ভাল হয়। ছোটখাটো তুচ্ছ কথা যত উড়িয়ে দিতে পার ততই ভাল —মনের মধ্যে গুঁজে রেখে দিলে নিজেরই পরে তাতে ক্ষতি হয়।

বিশ্বভারতী কারো একজন বা দুজনের নয় এই মনে করে personal খোঁচাগুলো অনায়াসে ঝেড়ে ফেলতে পার। সব ক্ষেত্রেই— কেবল আমাদের ওখানেই নয়— executive-দের অনেক উৎপাত, অনেক বাধা এবং personal attacks সহ্য করতে হয়। তারাই successful হয় যারা সেগুলো উপেক্ষা করে অচঞ্চলভাবে উচিত কাজ করে যেতে পারে। এটা কম পরীক্ষা নয়— কিন্তু যদি উত্তীর্ণ হতে পার ত জীবনে অনেকখানি experience লাভ করবে এবং নিজেকে আরো অনেক বড় কাজ করবার জন্য প্রস্তুত করতে পারবে। আশ্রমের অনেকের মনের ভাবের কথা শুনে বাবা আসবার আগে একটু disappointed হয়ে নেপালবাবুর[৩] কাছে কঠোরভাবে দু' চার কথা বলেছিলেন— আশা করি সেগুলো অন্যদের কানে পৌঁছে কোনো চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে নি।

Elmhirst[৪]এর কাছ থেকে একটা খুব interesting চিঠি পেয়েছি। শেষের কয়েকখানা চিঠি থেকে ওকে অনেকটা বুঝতে পারছি। ওকে অনেক বিষয়েই misunderstand করেছি। সেটা ওরই দোষে অবিশ্যি। আমাদের একজনের কাছেও যদি ওর মনের কথাগুলো সব খোলসা করে জানাত তবে এতটা হত না। Advani[৫] সম্বন্ধে ওর মনে কোনো বিরুদ্ধতা জাগে নি— নিজেই relieved বোধ করেছে। হাঁ, Advani যে ইউরোপে Geddes[৬]এর কাছে এসেছে, জানো? সুরুল সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে— Rural Reconstr. বাদে আর সব department self-supporting করে তুলতেই হবে— sooner the better। এবং এটাও জেনে রেখো দু' বছরের মধ্যে Rural reconstruction কাজের জন্য ভারতবর্ষেই টাকা তুলতে হবে। তুমি হাল ছেড়োনা— ওদের মধ্যে থেকে যাতে ওরা problemটাকে seriously face করে তার দিকে চেষ্টা কর। রজনীবাবুর[৭] survey কাজটা একটু prolong করবার দিকে

tendency আছে— সেটা check করবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা বেশিদিন খরচ বহন করতে পারব না মনে রাখতে হবে। orphanage-এর কোনো ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি না। এ বিষয়ও কি করা যায় আমাদের seriously ভাবতে হবে।

আজ আরো অনেক চিঠি লিখতে হবে। এখানেই শেষ করা যাক্।

ইতি

রথী দাদা

২০

London

29. 10. 24

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের চিঠি এইমাত্র Paris থেকে redirected হয়ে হাতে পৌঁছল। ধীরেনও[৮] কাল রাত্রে এসে পৌঁচেছে। তোমার চিঠির খবর তার মুখের খবরের চেয়ে এক সপ্তাহ পরের। তোমার চিঠি পাবার আগে Morris[৯]এর একটা চিঠি পেয়ে বড় রাগ হয়েছিল। বিদেশে কাউকে লিখতে হলে হয় দুর্ঘটনার খবর একেবারেই দিতে নেই— কিম্বা পুরোপুরি দিতে হয়। কিন্তু Morris কি করেছিল— শুধু একজন ছেলে ডুবে মারা গেছে এইটুকু খাপছাড়াভাবে দিয়েছিল। কে মারা গেল— কি করে মারা গেল এই দুর্ভাবনা সমস্ত সপ্তাহ ধরে মনের উপর চেপে ছিল। যা হোক তোমার চিঠি থেকে সব জানতে পারলুম। ছেলেটির জন্য দুঃখ হচ্ছে। এই নিয়ে আমাদের Institution সম্বন্ধে লোকের মনে কোনো খারাপ impression হবে কি না ভাবছি। ইতিমধ্যে দেশের political খবর এখানকার কাগজে পড়ে দুশ্চিন্তা বোধ করছি। ৫৬ জন leader-দের খামকা জেলে পুরেছে কেন বুঝতে পারলুম না— নিশ্চয়ই political move—তা না হলে আর ত

কোনো কারণ বুঝতে পারা যায় না। এখানে আজ আবার হুলুস্থুল —আজ election day— রাত বারোটার সময় result বোঝা যাবে। আমাদের কাছেই Albert Hall-এ একটু পরে লোক জটলা হবে— result জানবার জন্যে। আমরাও যাব ভাবছি— যদি জায়গা পাই।

সুরেনও আমাদের সঙ্গে এসেছিল। সে আজ থেকে এখানকার L. C. C-র Central School-এ ভর্তি হল— Lithography ও Book binding শেখবার জন্যে। ইতিমধ্যে কিছু Frenchও শিখে নেবে— তারপর Paris-এ যাবে। ভাষা না জানলে— বিদেশে বড় সুবিধা করা যায় না। তোমাকে আমি strongly advise করি French টা continue করতে। এর পরে তোমার পালা। তখন ভাষার দিক থেকে অসুবিধা না হয়— এখন থেকে শিখে রাখা উচিত। আমাদের বিশ্বভারতীর Staff-এর সকলকেই দেশ বিদেশে একবার ঘুরে যাওয়া চাই।

ধীরেনকে[১১] কি করব এখনো ঠিক করতে পারি নি। বাবাকে ত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল। এখন সেখানে পাঠানো useless। তাই ভাবছি ।ondon Uni-তে M.A. পড়বার জন্য লাগিয়ে দেব। ওরও তাতে মত আছে।

আমি পুপেকে[১২] সঙ্গে এনে এবারে বিপন্ন হয়ে পড়েছি। প্রতিমা[১৩] একলা হলে কোনো ভাবনা ছিল না— সঙ্গে S. America -তেও নিয়ে যেতে পারতুম— অথবা Paris বা London-এ কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে রেখে যেতে পারতুম। কিন্তু পুপেকে সুদ্ধু কোনো ব্যবস্থা করা শক্ত হয়ে পড়েছে। পুপে নতুন জায়গায় এসে আমাদের এত আঁকড়ে থাকতে চায় যে ওকে একলা কারো কাছে রেখে একটুখানি বেরোনোও মুস্কিল হয়েছে। এইসব নানাকারণে আমাকে হয় ত Europe-এই থাকতে হবে যতদিন না বাবা ফিরে

আসেন— অথচ বাবাকে কেবল[১৪] Elmhirst-এর সঙ্গে পাঠিয়েও মনে শান্তি পাচ্ছি না। কি করব বুঝতে পারছি না। এখনো সময় আছে —6th Nov.-এর জাহাজে ছেড়েও বাবাকে Peru-তে ধরতে পারি। এর মধ্যে decide করতে হবে। আমার নিজের শরীরও এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি না। Paris-এ relapse-এর মত হয়েছিল— এখানে একটু ভাল আছি। পশুর্ এখানে ডাক্তার দেখিয়েছিলুম। সে ত একেবারে নতুনরকম diagnosis করেছে। বলছে কানের ব্যারাম। তার treatment এর পর ত খুব ভাল বোধ করছি— তাই মনে হচ্ছে হয় ত diagnosis ঠিক হয়েছে। আর দু একদিনের মধ্যেই বুঝতে পারব।

তোমার কাছ থেকে যে চেকগুলো পেয়েছিলুম— আমি সই করে আবার এই সঙ্গে ফেরৎ পাঠাচ্ছি। আমার Power of Attorney Imperial Bank-এ registered আছে— কাজেই কোন গোল হবে না। Port Said থেকে আমি তোমাকে বাবার (ব্যাঙ্কের উপর) পাঠিয়েছি— নিশ্চয়ই এতদিনে পেয়েছ— আর অসুবিধা হবে না আশা করি।

শাস্ত্রী মহাশয়ের[১৫] চিঠি পেয়েছি। তুমি ত তাঁর সম্বন্ধে আমাকে কিছু লেখো নি। তাঁর চিঠির জবাব আসছে সপ্তাহে দেব। আশা করি তিনি বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষদের সম্বন্ধে আর একটু ধৈর্য ধরে বিচার করবেন। Sten Konow[১] তাঁর বিশেষ যত্ন নিও। কি দরকার না দরকার গোড়া থেকে পরিষ্কার করে নিও— পরে কোনো misunderstanding না নয়।

তুমি মাঝে মাঝে সাধারণভাবে একটা করে cable পাঠাতে ইতস্তত করো না। খরচের জন্য ভেবো না— যদি general fund থেকে না কুলায় আমার নামে হাওলাত রেখে খরচ কর।

Music dept. নিয়ে বোধ হয় তোমাকে একটু বেগ পেতে হবে,

দুদিক সামলে চালাতে হবে— যাতে বাবা ফেরা পর্যন্ত বিশেষ গোলযোগ না ঘটে।

Europe-এ বিশ্বভারতীর propaganda করা দেখছি খুব সহজ নয়। এরা এখনো নিজেদের নিয়েই বড় মেতে রয়েছে। দেখি থাকতে ২ ক্রমশ প্রবেশ করতে পারি কি না।

Wembly Exhibition দুদিন দেখে এলুম একটা huge দোকান সাজানো— আর কিছুই নয়। Exhibition হিসাবে একটুও ভালো লাগল না। নিতান্তই commercial— এবং colonies-গুলি exploit কি করে করা যায় তার আয়োজন। colonies-এর raw products গুলি ভালো করে দেখিয়েছে আর নিজেদের finished products-গুলি show করেছে। আমি নিজেদের জন্যে Wireless set, Telephone এবং অন্যান্য দু একটা যা useful machinery ও appliances দেখলুম তার খোঁজ খবর নিচ্ছি।

আজ এই পর্যন্ত থাক— আরো অনেককে চিঠি লিখতে হবে।

ইতি

রথী দাদা

Cable Address : Care AMEXCO—PARIS

১০

UTTARAYAN

SANTINIKETAN, BENGAL

28. 3. 36

শ্রীচরণেষু,

এখানে দু একটা বসন্ত দেখা দিয়েছে। দুটোই বাইরে থেকে এসেছে। জিতেন বোসের[১] কলকাতার বাড়িতে তার দুটি ছেলের mixed type-এর হয়েছিল। তাদের সারবার আগেই অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে স্ত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে। গোবিন্দর[২] শাশুড়ীর বাড়িভাড়া নিয়ে সেখানে উঠেছিলেন। এখানে কাউকে কিছু জানান নি যে infection নিয়ে এসেছেন। তিন দিন হল ছোট মেয়ের mixed বসন্ত হয়েছে। আমরা জানতে পেরেই বাড়িটা isolate করে যতটা সাবধান হতে হয় তা হয়েছি। রাতদিন পাহারা থাকে যাতে কাউকে যেতে বা বেরোতে দেওয়া হয় না। কাল আবার খবর পেলুম মেথরদের পাড়ায় রসিকের স্ত্রীর আসল বসন্ত বেরিয়েছে। তারা বোলপুরে এক আত্মীয়ের বাড়ি শীতলা পূজা দিতে গিয়েছিল। সেই বাড়িতে একজনের হয়েছিল। আজ সকালেই রসিকদের বোলপুরে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের ঘর ভালো করে disinfect করানো হয়েছে। তবু ইস্কুল খুলে রাখতে সাহস হচ্ছে না। আজ সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে ২রা এপ্রিল বন্ধের নোটিশ দেওয়া হল। বোলপুরে কয়েকটা case হয়েছে এবং ডাক্তাররা সকলেই মনে করছেন যে আশ্রম খুলে রাখা safe নয়।

তোমরা যদি এখানে ফিরে না এসে ঐ দিক থেকেই Dehra Dun বা কোথাও চলে যাও ত ভাল হয়। আশ্রম বন্ধ হলে এখানে ফিরে কোনো লাভ নেই। গরম খুব পড়েছে— বৃষ্টির চিহ্ন নেই।

বুড়ির[৩] বিয়েও তাহলে পিছিয়ে দিতে হয়। এ বিষয় ভেবে দেখে যা স্থির করো আমাকে টেলিগ্রাম করে জানিও।

এইমাত্র অনিলের[৪] টেলিগ্রামে ৬০,০০০ donation-এর[৫] খবর পেলুম। আমাদের বিশেষ উপকার হল— এখন নিশ্চিন্ত হতে পারব।

ইতি

রথী

২.

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL

১৬. ৬. ৩৯

শ্রীচরণেষু,

দু' তিনদিন পূর্বে তোমাকে একটা টেলিগ্রাম করেছি। তার কোনো জবাব পাই নি বলে আজ আবার চিঠি লিখে জানাচ্ছি। কয়েকটা কাজ জমে গেছে জরুরী রকমের তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করতে পারছি না। আওয়াগড়ের প্রস্তাব[৬] সম্বন্ধে এখুনি কিছু করা দরকার। আমি একটা scheme করে রেখেছি— কিন্তু সেটা তোমার দেখা দরকার— তাঁকে দেবার আগে। সুধাকান্তকেও[৭] বোধহয় সেখানে পাঠাতে হতে পারে। Mrs Fisher[৮] এসেছেন, তাঁর কতকগুলি প্রস্তাব আছে। বিশেষত Tucker[৯] সম্বন্ধে আমাদের এখুনি কিছু স্থির করা উচিত। কোন্‌দিন এসে পড়বে। সব চেয়ে দরকার তোমার Complete Works-এর deluxe edition প্রকাশ করা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আমাদের কাছে এসেছে— সে বিষয়ে একটা মীমাংসা করা। তারা খুব তাগিদ দিচ্ছে— তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা না করে পার্টিকে কোনো জবাব দিতে পারছি না। এইসব কাজ আছে সেইজন্য এখন তোমার আসা দরকার হয়ে পড়েছে। গরম থাকলে বলতুম না— কিন্তু এখন বর্ষা নেমে গেছে। এখানে এলে

ভালই লাগবে। তুমি এই চিঠি পেয়ে চলে আসতে পার মনে করে আমি আর মংপু যাবার চেষ্টা করলুম না।

ইতি

রথী

৩.

"UTTARAYAN"

SANTINIKETAN, BENGAL

22. 9. 39

শ্রীচরণেষু,

তুমি জানতে চেয়েছিলে আওয়াগড়ের টাকা থেকে বাড়ী তৈরী করা সুরু হয়েছে কি না।

১ শ্রীভবনের নতুন বাড়ীর[১০] ভিত পত্তন অনেকদিন আগেই হয়েছে, এর মধ্যে plinth-এর গাঁথনী মাটি ছাড়িয়ে উঠেছে। কাজ আরম্ভের আগে প্ল্যান Melle Bossennec[১১]-কে দেখিয়ে নেওয়া হয়েছিল— তিনি সন্তুষ্ট।

২। পাঠভবনের বড় ছেলেদের dormitory দুটোর[১২] ভিত হচ্ছে, গাঁথনী শীঘ্রই সুরু হবে। অনেকগুলো গাছ কাটতে হয়েছিল বলে এটা শ্রীভবনের মত অত তাড়াতাড়ি করতে পারে নি।

৩। কলাভবনের পায়খানা হয়ে গেছে, Museum-এর দুপাশে নতুন ২টা ঘর ছাত পর্যন্ত হয়ে গেছে ; মেয়েদের কাজের জন্য নতুন যে বাড়ী হচ্ছে— তার plinth গাঁথা চলছে।

৪। সঙ্গীতভবনের hostel সুরু করা হয়েছে, কিন্তু ২ হাত মাটি খুঁড়তেই জল বেরিয়ে পড়ায় ভিত করতে দেরি হচ্ছে।

৫। তোমাদের নতুন বাড়ীর[১৩] প্ল্যান একটু বদল করতে হয়েছিল বলে কাজ আরম্ভ করতে দেরি হল। পর্শু দিন contract সই করা

হয়েছে— কাল থেকেই মাল বইতে আরম্ভ করেছে। পূবদিকের ছোট গেট্‌টা খুলে দিতে হয়েছে— গাড়ী ঢোকবার জন্য।

৬। আওয়াগড়ের রাজার বাগান, রাস্তা প্রভৃতি lay out করা হচ্ছে। মালী থাকবার জন্য একটা চালা হয়ে গেছে; বড় রাস্তার ধারে মেথি বেড়া লাগানো হয়েছে। বাড়ীর প্ল্যান পাঠানো হয়েছে কিন্তু রাজার sanction এখনো আসে নি।

এইসব কাজ তিন জন contractor-এর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের সঙ্গে যেদিন contract হয়েছে, তার পরদিন থেকেই তারা কাজ সুরু করেছে। contract হয়েছে পৌষমেলার মধ্যে সব কাজ শেষ করে দিতে হবে। টাকা পেয়েছি আমরা জুলাইয়ের শেষে। প্ল্যান তৈরী করা, estimate করানো, সমস্ত প্ল্যানের blue prints ছাপানো, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে tenders call করা, সংসদের কাছ থেকে sanction নেওয়া— এইসব করতে এক মাসও লাগে নি। August-এর শেষেই contracts সই করা আরম্ভ হয়েছে, Sept এর প্রথমেই কাজ সুরু হয়েছে এবং আশা করছি মেলার পূর্বেই বাড়ী শেষ হয়ে যাবে। প্রায় ৫০,০০০ টাকার কাজ এখনকার মত জায়গায় যেখানে ইঁট ছাড়া প্রত্যেক জিনিসটা বাইরে থেকে আনতে হয়— ৫ মাসের মধ্যে শেষ করা খুব সহজ নয়। আমাদের দেশে খুব কম অনুষ্ঠানই আছে যারা এর চেয়ে দ্রুত কাজ করাতে পারে।

আমি কলকাতায় যেতে পারি নি বলে 'আকাশপ্রদীপ'[১৪] সম্বন্ধে খোঁজ নিতে পারি নি। এখানে খবর নিয়ে দেখছি মাসিক পত্রিকায় প্রতি মাসেই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। মাঝে ১ মাস বাদ গিয়েছিল— সেই মাসটায় অসুস্থ হয়ে কিশোরীবাবু[১৫] গিরিডি চলে গিয়েছিলেন। কিশোরীবাবুর অসুস্থতার জন্য Publishing Dept.-এর আরো অন্য অনেক কাজের dislocation হয়েছে। সেটা অনিবার্য, কেন না তাঁর মত অভিজ্ঞ দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ অফিসে আর কেউ নেই, যারা অধীনস্থ

কর্মচারী তারা কেবলমাত্র কেরাণী। কিশোরীবাবুর শরীর ভেঙে গেছে— ওঁকে দিয়ে আর চলবে না— তাই তাঁর জায়গায় অল্প বয়সের কর্মিষ্ঠ লোক রাখার চেষ্টা হচ্ছে। খুব সম্ভবত পুলিনকে[১৬] পাওয়া যাবে। এই গোলযোগের মধ্যেও 'রচনাবলী' এক খণ্ড ছাপা হয়েছে, সেটা আজকালের মধ্যেই বেরোবে। সেটাও তো তোমারই কাজ! Publishing Dept-টাই তোমার বই ছাপাবার জন্য রয়েছে— বাইরের বই দু' একটা ছাড়া নেওয়া হয় না। কিশোরীবাবুর অসুখের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। তাতে কাজের যে বিশৃঙ্খলতা হয়েছে সেটা ইচ্ছে করে করা নয়। সব বইয়ের বিক্রিই গত ৬ মাস কমে গেছে— ঠিক কি কারণে এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

কিশোরীবাবু এখানে এসেছিলেন। তাঁর এখানে থাকবার ইচ্ছা। চারুবাবুর[১৭] সঙ্গে কথাবার্তা এই নিয়ে চলছে। যদি পুলিনকে পাওয়া যায় তবে এই পরিবর্তন সম্ভব হবে।

সুরেনবাবুকে[১৮] আম্বালাল[১৯] জরুরী ডাক দিয়েছেন? তাঁকে আজই আমেদাবাদ যেতে হচ্ছে। ৫/৬ই অক্টোবর ফিরে আসবেন।

লালবাড়ী[২০] সম্বন্ধে লেখাপড়ার কাজে বাধা পড়েছিল— তুমি সমস্ত সম্পত্তি Trust করে দেওয়ায় Trustee-দের ক্ষমতা নেই কোনো অংশ বিক্রি করার। এটা করতে হবে Court-এর সম্মতি নিয়ে auction করিয়ে। এর জন্য আগামী ২৯শে সংসদ আবার ডেকেছি। দেবেনবাবু[২১] বা চারুবাবু[২২] নিজের দায়িত্বে এরকম একটা Procedure করাতে রাজি নন। সুরেনদাদার[২৩] পরামর্শ নিয়েই চলা হচ্ছে।

সুধাকান্ত[২৪] কলকাতায় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। Bronchial fever। ডাক্তার এখানে চলে আসতে বলে— সেখানে দেখবার লোক কেউ নেই বলে। কাল এসেছে। এখনো জ্বর রয়েছে। ইতি

রথী

পত্র-পরিচয়

শ্রীনিরঞ্জন সরকার

মৃণালিনী দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ ও পুত্র রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া আনুমানিক ৮ অক্টোবর ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে দার্জিলিং গিয়াছিলেন। ঐ সময় কার্সিয়াঙেও তাঁহার থাকার কথা জানা যায়। প্রবাসে থাকাকালে, প্রায় অষ্টমবর্ষীয় বালক রথীন্দ্রনাথের মাতাকে লিখিত প্রথম পত্রটি, তাঁহার এ-যাবৎ প্রাপ্ত পত্রাবলীর মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন বলা চলে।

বাল্যকালে, বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার মাতৃদেবীকে লিখিত রথীন্দ্রনাথের চারখানি পত্র এখানে সংকলিত হইল। প্রথম পত্রে একস্থলে জীর্ণতাহেতু পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয় নাই, সে-স্থলে বিন্দুচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পত্ররচনার তারিখ ও বারের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ কোনো-একটির ভুল করিয়াছেন। 18th November 1896 হইলে Wednesday হইবে। শ্রীসৌম্যেন অধিকারীর সৌজন্যে মৃণালিনী দেবীকে লিখিত এই চারখানি পত্র সংগৃহীত।

পত্র ১

১ বেলা। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা।

২ প্রতিভাদিদি। দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবী।

পত্র ২

৩ সোদ্দা। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর পুত্র।

৪ মীরা। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী।

পত্র ৩

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর (আগস্ট ১৮৯৯) কিছুকাল পর শিলাইদহ হইতে তাঁহাদের গৃহশিক্ষক লরেন্সের সহিত রথীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া এই পত্র লেখেন। এই সময় নীতীন্দ্রনাথ গুরুতর পীড়িত। রবীন্দ্রনাথ এই কারণে ইহার কিছুকাল পূর্ব হইতেই কলিকাতায় ছিলেন।

৫ সাহেব। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যাগণের গৃহশিক্ষক লরেন্স শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বে অল্প কিছুকাল লরেন্স শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

৬ নীদ্দা। নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র।

৭ কর্ত্তাদাদামশায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৮ ন'মা। প্রফুল্লময়ী দেবী, দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের পত্নী।

পত্র ৪

৯ নীতুদাদা। নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০ বিবিদিদি। ইন্দিরা দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা।

১১ বেলা। মাধুরীলতা দেবী।

১২ নীদ্দা। নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩ প্রতাপবাবু; প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপ মজুমদার।

১৪ সুহৃৎ। ডাক্তার সুহৃৎনাথ চৌধুরী, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা নলিনী দেবীর স্বামী।

১৫ সাহেব। লরেন্স।

১৬ সুশী বৌঠান। সুশীলতা দেবী (সাহানা), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী

শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

পত্র ১

১ সানো সান। জাপানি মল্লবিদ্যা 'জুজুৎসু'-বিশারদ সানো জিন্নোসুকে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনেন। আমেরিকা-যাত্রার পূর্বে কিছুকাল রথীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সতীর্থ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই জাপানি শিক্ষকের নিকট জুজুৎসু শিক্ষালাভ করেন। বিদ্যালয়ের কিছু উৎসাহী ছাত্র তাঁহার নিকট জাপানি ভাষাও শিখিত। রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ এই উৎসাহী শিক্ষার্থীগণের অন্যতম। সানো সান অল্পকালই, সম্ভবত বৎসর কাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

পত্র ২

২ Booker Washington। বুকার ট্যালিয়াফারো ওয়াশিংটন আমেরিকায়

দাসত্ব মুক্তির পরবর্তীযুগের বিশিষ্ট নিগ্রো কর্মবীর নেতা ও বিখ্যাত বাগ্মী।

৩ *Cosm. Club। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রথাকাকালীন রথীন্দ্রনাথ-*প্রতিষ্ঠিত 'কস্‌মোপোলিটন ক্লাব'। রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের 'কস্‌মো-পোলিটন ক্লাব' অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে।

রাজলক্ষ্মী দেবীকে লিখিত

রাজলক্ষ্মী দেবী রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর দূর-সম্পর্কিত পিসিমা। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলে রবীন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যা শমীন্দ্র ও মীরার বসবাসের ব্যবস্থা হয় রবীন্দ্রনাথের জন্য নবনির্মিত 'নতুন বাড়ি'তে। কয়েকটি খড়ের চালা মাটির ঘর লইয়া এই 'নতুন বাড়ি'। রবীন্দ্র-নাথের এই নূতন সংসারের ভার গ্রহণ করেন রাজলক্ষ্মী দেবী।

পত্র ১ (পত্রশেষে সন্তোষচন্দ্রের একটু সংযোজন আছে।)

১ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র। সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে এবং আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথের সতীর্থ। পরে আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক।

২ কাওয়াগুচি সান্। জাপানি পর্যটক। তিব্বত ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যা-বর্তনের পথে তিনি কিছুকাল কলিকাতায় ছিলেন। তখন তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পরিচয় হয়। জোড়াসাঁকো পরিবারে তাঁহার যাতায়াত ছিল।

৩ 'আমাদের ও সানো সানের যে ছবিগুলো তোলা হয়েছিল'…। এরূপ একখানি আলোকচিত্র সন্তোষচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র সুবীরচন্দ্রের নিকট রক্ষিত আছে, শিক্ষক ও তাঁহার দুই ছাত্র সকলেই জুজুৎসুর প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ-পরিহিত অবস্থায়।

৪ 'বাবার দোতলা ঘর'। 'নতুন বাড়ি'র সংলগ্ন 'দেহলি' গৃহ।

৫ দিনু। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্ভবত এই সময় শিক্ষার্থে তাঁহাকে ইংল্যাণ্ড পাঠাইবার কথা তাঁহার পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথ বিশেষ কারণে চিন্তা করিতে-ছিলেন।

৬ সমীর। সমীরচন্দ্র মজুমদার। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুবোধচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সমীরচন্দ্র সেই সময় শিশু।

৭ নগেনবাবু। নগেন্দ্রনাথ আইচ। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক।

পত্র ২

৮ সুবোধবাবু। সুবোধচন্দ্র মজুমদার। রবীন্দ্রসুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের জ্ঞাতিভ্রাতা। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরবর্তীকালে তিনি জয়পুর রাজ্যে কর্মগ্রহণ করেন এবং কালক্রমে মহারাজের সচিবপদে অধিষ্ঠিত হন।

৯ জগদানন্দবাবু। জগদানন্দ রায়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৩২ খৃস্টাব্দে অবসর গ্রহণ কাল পর্যন্ত অবিচ্ছেদে তিনি আশ্রমবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সহজবোধ্য ও সরসভাবে আলোচনার তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

১০ মীরা। রথীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী মীরা দেবী।

১১ কাকিমা। সুবোধচন্দ্র মজুমদারের পত্নী।

১২ শমী। শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩ সানোবাবু। জাপানি জুজুৎসু শিক্ষক সানো সান। বাঙালিদের মতো ধুতি কামিজ পরিয়া বাংলাভাষায় কথা বলিয়া এই বিদেশী অতিথি এদেশীয়-দের সহিত মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেন। অনুমান করা যাইতে পারে রথীন্দ্রনাথের 'বাবু' সম্বোধন এই কারণেই।

পত্র ৩

১৪ 'জগদানন্দবাবু সেই চিঠি থেকে প্রবন্ধ খাড়া করে তুলেছেন···'। নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাঘ ১৩১৩ সংখ্যায় রথীন্দ্রনাথের 'ফলের বাগান' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। Urbana U.S.A. হইতে ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে রাজলক্ষ্মী দেবীকে রথীন্দ্রনাথ যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারই সম্পাদিত রূপ উল্লিখিত প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থভুক্ত 'রথীন্দ্র-নাথের রচনাপঞ্জী'।

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭১-১৯৫০) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের সূচনায় রবীন্দ্রনাথের একান্ত আগ্রহে, শিক্ষকরূপে যোগদান করেন।

ইতিপূর্বে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে তিনি শান্তিনিকেতনে আসিয়া কয়েক দিন কাটাইয়া গিয়াছিলেন। মনোরঞ্জনবাবু বৎসরকালমাত্র শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন, এই সময়ের মধ্যেই শিক্ষকরূপে তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় রাখিরাছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আমাদের বিদ্যালয়ের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি অল্পকালের মধ্যেই রথীকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।... তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য অধ্যাপক পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইবে।"

রথীন্দ্রনাথ তাঁহার বিদ্যালয়জীবনের এই শিক্ষকের সহিত শ্রদ্ধার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপর কয়েকজন শিক্ষককে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ হইতে 'চিঠিপত্র' পর্যায়ভুক্ত হইয়া প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রথীন্দ্রনাথের তিনখানি পত্র তাঁহার পুত্র শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পত্র ১

বর্তমান পত্ররচনাকালে রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবীকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে তাঁহাদের যাত্রা ২৪ মে ১৯১২, প্রত্যাবর্তন ৪ অক্টোবর ১৯১৩ খৃস্টাব্দ।

১ **Mr. Rothenstein। Wiliam Rothenstein (1872-1945)।** রবীন্দ্রনাথের সহিত শিল্পী রোটেন্‌স্টাইনের যোগের বিবরণ উভয়ের চিঠিপত্র-সহ সংকলিত হইয়াছে **Mary M. Lago** -প্রণীত **'Imperfect Encounter' (1972)** গ্রন্থে।

২ **Mr Yeats।** কবি **W. B. Yeats।**

পত্র ২

৩ কিশোরীবাবু। কিশোরীমোহন সাঁতরা। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই কিশোরীমোহন সহকারী সচিব **(Assistant Secretary)** ও প্রকাশক। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বিশ্বভারতীর যুগ্ম কর্মসচিবের পদ ত্যাগ করিলে রথীন্দ্রনাথ যখন এককভাবে কর্মসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন কিশোরীমোহন তাঁহার গ্রন্থনবিভাগের কর্মের অতিরিক্ত বিশ্বভারতীর

সহকারী কর্মসচিবের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে পুনরায় গ্রন্থনবিভাগের পূর্ণসময়ের কর্মী হন।

৪ কালীমোহনবাবু। কালীমোহন ঘোষ (১৮৮৪-১৯৪০)। পল্লীউন্নয়নকর্মে রবীন্দ্রনাথের সহযোগী। পরে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতী পল্লীসংগঠন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইলে (১৯২২ খৃ.) তাহার প্রধান দায়িত্বভার রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনের হস্তে অর্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ অনুসরণ করিয়া গ্রামসেবার কর্মে তিনি সমগ্র জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন।

৫ ধীরেন সেন। ধীরেন্দ্রমোহন সেন। আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র। পরবর্তীকালে পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের অধ্যক্ষ, শিক্ষাসত্র ও শিক্ষাচর্চাভবনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনি ভারত সরকারের 'শিক্ষা-সচিব' (Education Commissioner) জন সার্জেণ্টের সহকারীর পদ গ্রহণ করেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব (Education Secretary) পদে অধিষ্ঠিত হন।

পত্র ৩

৬ আমেরিকার প্রখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক Pearl S. Buck -রচিত 'The Good Earth' উপন্যাসটির কথা এখানে বলা হইয়াছে, অনুমান করা চলে।

৭ নলিনীবাবু। নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়া অনুমিত। নলিনীরঞ্জন বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম মন্ত্রীসভা (ফজলুল হক মন্ত্রীসভা) তিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

৮ "চিঠিপত্র' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ…"। আত্মীয়-পরিজন ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে 'চিঠিপত্র' প্রথম খণ্ড (মৃণালিনী দেবীকে লিখিত) প্রকাশিত হয় ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯ খৃস্টাব্দে। এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাক্রমে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী।

৯ ইন্দিরাদিদি। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী, প্রমথ চৌধুরীর সহধর্মিণী।

১০ 'নির্বাণ'। প্রতিমা দেবী -রচিত রবীন্দ্রস্মৃতিমূলক গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৩৪৯

সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত

পত্র ১

১ অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব। Charles Freer Andrews। ১৯২০-২১ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের বিদেশভ্রমণকালে শান্তিনিকেতনের ব্যবস্থাদি বিষয়ে অ্যাণ্ড্রুজ কতকটা রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্ব করিতেন। অ্যাণ্ড্রুজ অন্তত নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন।

২ গৌরবাবু। গৌরগোপাল ঘোষ। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, তৎকালে শিক্ষক।

৩ জগদানন্দবাবু, সন্তোষ, দিনু। সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

৪ পিয়ার্সন সাহেব। William Winstanly Pearson। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯১৪ খৃস্টাব্দে পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী।

৫ 'যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম'। উল্লিখিত ব্যক্তি Mousieur Kahn। রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জি' শীর্ষক রচনা দ্রষ্টব্য।

৬ Sir J. C. Bose। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

৭ 'শান্তিনিকেতনে ছাপিয়ে বসে থাকবেন'। 'শান্তিনিকেতন' পত্র, তৎকালে জগদানন্দ রায় সম্পাদক।

গৌরগোপাল ঘোষকে লিখিত

পত্র ১

১ আচারী। কলিকাতাবাসী দক্ষ দারুশিল্পী। গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাদের পরিকল্পিত ভারতীয় পদ্ধতির গৃহসজ্জা আচারীকে দিয়া নির্মাণ করাইতেন। শান্তিনিকেতনে 'উদয়ন' গৃহের বৈঠকখানার দেশীয় পদ্ধতির আসবাবপত্র তিনিই করিয়াছিলেন।

২ প্রশান্ত। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। বিশ্বভারতী সোসাইটির সংস্থিতি গৃহীত হইলে প্রশান্তচন্দ্র রথীন্দ্রনাথের সহিত বিশ্বভারতীর যুগ্ম কর্মসচিব নির্বাচিত

হন (১৯২১-১৯৩১)। রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ ভ্রমণে একাধিকবার সঙ্গী ছিলেন।

৩ নেপালবাবু। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়।

৪ Elmhirst। Leonard Knight Elmhirst। ১৯২০ খৃস্টাব্দে নিউইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সহিত এলমহার্স্টের পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার আদর্শে তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া পরে শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসেন। তাঁহারই অর্থ, উৎসাহ এবং পরিশ্রমে সুরুলে বিশ্বভারতীর 'কৃষিবিভাগ' (পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন বিভাগ) প্রতিষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ২৫।২৬ বৎসর শ্রীনিকেতন পল্লী সংগঠন বিভাগের অস্তিত্ব প্রধানত তাঁহার আর্থিক সহায়তার উপরই নির্ভর করিয়াছে।

৫ Advani। সিন্ধুপ্রদেশের একজন ব্যবসায়ী। জাপানেও ইঁহার ব্যবসায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ একবার জাপান ভ্রমণকালে কয়েকদিন আদ্‌বানির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৬ Geddes। Patrick Geddes। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯২১ খৃস্টাব্দে প্যারিসে তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। গেডিস ভারতবর্ষে আসিলে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠন প্রচেষ্টা পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়া দেখিয়া একটি প্রতিবেদন লিখিয়া দিয়া যান।

প্যাট্রিক্ গেডিসের পুত্র Arthur Geddes ১৯২৩ সালে কয়েকমাস সুরুলে বিশ্বভারতী কৃষি বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন। অনুমান হয় বর্তমান পত্রে উল্লিখিত Geddes, আর্থার গেডিস।

৭ রজনীবাবু। ড. রজনীকান্ত দাস। অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিদ্যার লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকরূপে ১৯২৪ সালে যোগ দেন। শান্তি-নিকেতন ও সুরুলের পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পত্র ২

৮ ধীরেন। ড. ধীরেন্দ্রমোহন সেন। পরিচয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

৯ Morris। হিরজিভাই পেসটন্‌জি মরিস। বোম্বাই প্রদেশবাসী পারসী। ফরাসীভাষার অধ্যাপকরূপে তিনি বিশ্বভারতীর কর্মে যোগ দেন।

১০ সুরেন। সুরেন্দ্রনাথ কর। কলাভবনের অধ্যাপক প্রখ্যাত শিল্পী ও স্থপতি। নানা সময়ে তিনি শান্তিনিকেতন-সচিব পদে নিযুক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দায়িত্বও বহন করিয়াছেন।

১১ ধীরেন। ধীরেন্দ্রমোহন সেন।

১২ পুপে। শ্রীনন্দিনী দেবী (লালা)। রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা।

১৩ প্রতিমা। প্রতিমা ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী।

১৪ Elmhirst। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

১৫ শাস্ত্রীমহাশয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী। বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের (গবেষণা বিভাগ) অধ্যক্ষ। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতভাষার আশুতোষ-অধ্যাপক।

১৬ Sten Konow। নরওয়ে ক্রিস্টিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রাচীন লিপিবিদ্ ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে তিনি বিশ্বভারতীর চতুর্থ অভ্যাগত অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনে আসেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

পত্র ১

১ জিতেন বোস। বীজগণিতের বহু প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা কালীপদ বসুর (K. P. Bose) পুত্র জিতেন্দ্রনাথ বসু। এই সময় তিনি বর্তমান সংগীতভবন-অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া করিয়া সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন। পুত্রকন্যাগণ সকলেই পাঠভবনে শিক্ষালাভ করিতেছিল।

২ গোবিন্দ। গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী। ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর কর্মী।

৩ বুড়ি। রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্রী, মীরা দেবীর কন্যা নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার সহিত শিক্ষা-ভবনের সিন্ধী অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীর বিবাহ হয়।

৪ অনিল। অনিলকুমার চন্দ। বিশ্বভারতীর তৎকালীন অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব, পরবর্তীকালে শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ।

৫ '৬০,০০০ donation এর খবর'…। ১৯৩৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশের সময়

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট লাঘবের আশায় 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের দল লইয়া উত্তর ভারত ভ্রমণ করিয়া দিল্লী পৌঁছিলে কবির স্বাস্থ্যের উপর এরূপ ক্লান্তিকর প্রয়াসের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিষয়ে গান্ধীজী অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন বোধ করেন। বিশ্বভারতীর ঋণের পরিমাণ জানিয়া তিনি ৬০ হাজার টাকার একটি চেক্‌ সংগ্রহ করিয়া পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পত্র ২

৬ 'আওয়াগড়ের প্রস্তাব'। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা অঞ্চলের আওয়াগড় জমিদারি অবস্থিত। আওয়াগড়ের তৎকালীন রাজা সূর্যপাল সিং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ ভাগে আত্তয়াগড়-রাজার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। ঐ সময় বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান আর্থিক সাহায্যকারীর ভূমিকা আওয়াগড়ের রাজা গ্রহণ করেন। সূর্যপাল মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসিতেন। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে কিছুকাল বাস করিবার মানসে শান্তিনিকেতনে তাঁহার একটি বাসগৃহ নির্মাণের ইচ্ছা তিনি বিশ্ব-ভারতী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকাশ করেন; আলোচ্য পত্রে সেই প্রসঙ্গই উল্লিখিত। 'উত্তরায়ণে'র উত্তরপ্রান্ত গোয়ালপাড়ার পথের ধারে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নির্মিত তাঁহার সেই গৃহ 'আওয়াগড়ের রাজবাড়ি' নামে পরিচিত। পরে রাজাসাহেব সূর্যপাল সিং এই সম্পত্তি বিশ্বভারতীকে দান করেন।

৭ সুধাকান্ত। আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। পরবর্তী কালে বিশ্বভারতীর কর্মী। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষভাগে তাঁহার অন্যতম একান্ত সচিব।

৮ **Mrs. Fisher**। কলিকাতার মেথডিস্ট চার্চের বিশপ **F. Bohn Fisher**-এর পত্নী।

৯ **Tucker**। **Boyd Tucker**। আমেরিকার অধিবাসী, মেথডিস্ট চার্চের ধর্মযাজক। এই খৃস্টীয় সমাজের অর্থানুকূল্যে ইনি বিশ্বভারতীতে ইংরাজির অধ্যাপকরূপে সপরিবারে দীর্ঘকাল বসবাস করেন। অনুমান করা যাইতে পারে, বিশপপত্নী বর্তমান পত্ররচনা কালে অধ্যাপক টাকারের শান্তিনিকেতনের কার্যকাল বৃদ্ধিবিষয়েই মেথডিস্ট খৃস্টীয় সমাজের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনার্থে আসিয়াছিলেন।

১০ 'শ্রীভবনের নতুন বাড়ী'। ২০ জন ছাত্রীর বসবাসের জন্য নির্মিত শ্রীভবনের এই নবসংযোজিত অংশটি নির্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়া বহন করেন।

১১ Melle Bossennec। Mademoiselle Christiana Bossennec ১৯৩৫ সালের শারদীয় অবকাশ হইতে ১৯৪০ পালের প্রথম অংশ (এপ্রিল ?) শ্রীভবনের পরিদর্শিকা (Superintendent) রূপে কাজ করিয়াছেন।

১২ 'পাঠভবনের বড় ছেলেদের dormitory দুটো'। 'সতীশ কুটির' এবং 'মোহিত কুটির' নামে মাটির দেয়ালের উপর খড়ের আচ্ছাদনে পুরাতন ছাত্রাবাস দুটি ভাঙিয়া এ দুটির দক্ষিণ দিকে নির্মিত নূতন দুটি একতলা পাকা দালান নির্মাণের কথা বলা হইতেছে। গৃহ দুইটি নির্মাণের পর তাহাদের পূর্বনামই রক্ষা করা হয়। বর্তমানে মোহিত কুটির বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এবং সতীশ কুটির অর্থনীতিবিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়াছে।

১৩ 'তোমাদের নতুন বাড়ি'। উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে ঐ কালে নির্মীয়মাণ রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ বাসগৃহ 'উদীচী'।

১৪ রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯) মুদ্রণের কাজ এইসময় চলিতেছিল।

১৫ কিশোরীবাবু। কিশোরীমোহন সাঁতরা।

১৬ পুলিন। পুলিনবিহারী সেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে পুলিনবিহারী এই সময় কর্মরত ছিলেন। বিশ্বভারতী হইতে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্‌যোগকালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তাহার অন্যতম সম্পাদক ও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সহকারী অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন। পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশে, সংকলন ও সম্পাদনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

১৭ চারুবাবু। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়কে সর্বজনবোধ্য করিয়া প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্‌যোগী ছিলেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের আদিকালেই চারুচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হন সেক্রেটারি ও প্রকাশকরূপে।

পরবর্তীকালে তিনি অধ্যক্ষ (ডিরেক্টর) হইয়াছিলেন। চারুচন্দ্রের উদ্‌যোগে রবীন্দ্র-রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা।

১৮ সুরেনবাবু। সুরেন্দ্রনাথ কর।

১৯ আম্বালাল। আম্বালাল সারাভাই। আমেদাবাদের বিশিষ্ট ধনী ও শিল্পপতি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলিয়া বিশ্বভারতী আম্বালালের অর্থানুকূল্য লাভ করিয়াছে। আলোচ্য সময়ে তিনি আমেদাবাদে তাঁহার পরিকল্পিত আবাসগৃহের স্থপতিরূপে সুরেন্দ্রনাথ করকে নির্বাচন করেন; সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার 'জরুরি ডাক' এই কারণেই।

২০ লালবাড়ি। জোড়াসাঁকো পৈতৃক বাসভবনের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ-নির্মিত তাঁহার নিজস্ব আবাসগৃহ 'বিচিত্রাভবন'।

২১ দেবেনবাবু। ড দেবেন্দ্রমোহন বসু। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

২২ চারুবাবু। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

২৩ সুরেন দাদা। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতীর সহিত প্রথমাবধিই সুরেন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

২৪ সুধাকান্ত। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচনাপঞ্জী
শ্রীসুব্রত চৌধুরী -সংকলিত

কবিতা

১ 'ছন্নছাড়া', বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৪৪

২ 'পুরুষের মন', প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৪

৩ 'শেষদান', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

৪ 'কালোদিঘি', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৫

৫ 'বাঙালী মেয়ে', পরিচয়, বৈশাখ ১৩৪৮

গল্প

১ 'বাঁধাঘাট', বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫
রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক কোনো কোনো স্থলে সংশোধিত। পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালাভুক্ত।

২ 'এক ভাল্লুকের গল্প', সন্দেশ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮।
শ্রীসত্যজিৎ রায় -সম্পাদিত 'সেরা সন্দেশ' (পৌষ ১৩৮৮, আনন্দ পাবলিশার্স) সংকলনগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

স্মৃতিকথা : বাংলা / ইংরাজি

1 'Pages from a diary', Visva-Bharati News, May, 1934.

2 'Cousin Gaganendranath', Visva-Bharati Quarterly, May-July 1938.

3 'Looking Back', Visva-Bharati Quarterly, August-October 1939 ; 'Kedarnath', April 1901 ; 'A Summer Vacation at Santiniketan',April 1904; 'Pareshnath',April 1904, 'Potisar' 1924. Incorporated in the book 'On the Edges of Time' (June 1958) with certain changes.

4 'Early days at Santiniketan', Visva-Bharati News, Nov. 1939 ; Incorporated in 'On the Edges of Time' with certain changes.

5 'Looking Back', Visva-Bharati Quarterly, Nov. 1939 -Jan 1940 : America welcomes, Frontier in Europe, A Swiss Peasant, A Still-born Trip to Norway.
Incorporated in 'On the Edges of Time' published June 1958.

6 'Surendranath Tagore', Visva-Bharati Quarterly, Aug-Oct. 1940.

7 'Gora', Visva-Bharati News, December 1940.
Published after the death of Gour Gopal Ghosh, a former student and teacher of Asrama-Vidyalaya.

8 'চারযুগ আগে', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯ ধর্ম শ্রাবণ ১৩১০ ; 'মেয়েদের অধিকার' ২ বৈশাখ ১৩১২ আলোচ্যবিষয় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অনুলেখন ।

9 'শান্তিনিকেতন : আদিপর্ব', বিশ্বভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ 'Looking Back' শীর্ষক প্রবন্ধের শ্রীক্ষিতীশ রায় -কৃত অনুবাদ ।

10 'Looking Back', Visva-Bharati Quarterly, Nov. 1942 to Jan. 1943.
A discussion on Tagore's drama. Incorporated in 'On the Edges of Time'.

11 'অতীতের স্মৃতি', গীতবিতান বার্ষিকী, মাঘ ১৩৫০। 'পিতৃস্মৃতি' (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩) গ্রন্থে পরিমার্জিত রূপ প্রকাশিত ।

12 'The Boat Padma', Visva-Bharati Quarterly, May-July 1943.
Incorporated in 'On the Edges of Time'.

13 'Looking Back,' Visva-Bharati News, May 1943.
Certain portion has been translated and incorporated in the book 'Pitri-Smriti'.

14 'In the Himalayas', Visva-Bharati Quarterly, Aug-Oct. 1943.

15 'ধারাবাহী', বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০

16 'In Memorium : Jnanendra Chattopadhyay', Visva-Bharati News, July 1952.

17 'Childhood Days', Visva-Bharati Quarterly, Aug-Oct 1952. Incorporated in 'On the Edges of Time'.

18 'With Father in Europe', Visva-Bharati Quarterly, Nov. '52 to Jan'53.
Incorporated in 'On the Edges of Time'.

19 'Father as I Knew Him', Visva-Bharati Quarterly, Feb-April 1953.
Reprinted in Visva-Bharati Quarterly, Summer 1960. Incorporated in 'On the Edges of Time'.

20 'In Memorium : Premchand Lal', Visva-Bharati News, June 1954.

21 'আচার্য জগদীশচন্দ্র : আমার বাল্যস্মৃতি,' বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৫, 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

22 'পদ্মা ও পদ্মাবোট', বসুধারা, শারদ সংখ্যা' আশ্বিন ১৩৬৬, 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

23 'শিলাইদহের স্মৃতি', বসুধারা, বৈশাখ ১৩৬৭ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

24 'ছেলেবেলা', বসুধারা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

25 'ছেলেবেলা,' বসুধারা, আষাঢ় ১৩৬৭। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

26 'হিমালয় ভ্রমণ', বসুধারা, শ্রাবণ ১৩৬৭। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

27 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম', বসুধারা, ভাদ্র ১৩৬৭। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

28 'শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মের একটি ছুটি', বসুধারা, শারদসংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৭। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

29 'দুঃখের আঘাত', বসুধারা, বৈশাখ ১৩৬৮। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত'।

30 'স্বদেশী আন্দোলন', বসুধারা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

31 'রামগড় পাহাড়', আনন্দবাজার পত্রিকা, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৬১

32 'বিলাতযাত্রা : ১৩১২' 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

33 'পলাতকা ও চতুরঙ্গপ্রসঙ্গ'। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

প্রবন্ধ ও ভাষণ

1 'ফলের বাগান', বঙ্গদর্শন মাঘ ১৩১৩

2 'বৃক্ষের আকারবিধান', বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৪

3 'An Appeal', Visva-Bharati News, January 1936.
Rathindranath as the Karma-Sachiva, Visva-Bharati, issued the above appeal to the Press.

4 'Silpa Bhavana', Visva-Bharati News, March 1941.

5 'An Address', Visva-Bharati News, August 1941.
A meeting of the *Adhyapaka-Mandali* was held at Uttarayana on July 22, 1941. The above is the text of address given by Rathindranath at the end of the meeting.

6 [Rathindranath's Statement through Press], Visva-Bharati News, December 1941.
Herein Rathindranath invites everybody's help and Co-operation to enable Visva-Bharati to make the Rabindra Museum an institution by itself.

7 'An Address', Visva-Bharati News, January 1942.
A meeting of the Adyapaka-Mandali was held in the varandah of Vidya-Bhabana on December 1, 1941. The above is the opening address given by Rathindranath.

8 'An Address', Visva-Bharati News, March 1942.
Rathindranath's address of welcome to Marshal Chiang Kai-Shek and Madame Chiang Kai-Shek on 19th Feb. 1942.

9 'Our Santal Villages', Visva-Bharati News, July 1942.

10 [শিক্ষা প্রণালী] বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯, 'সঞ্চয়ন' শিরোনামে অন্যান্য রচনার সঙ্গে প্রকাশিত।

11 [শ্রীনিবাস রামানুজন], বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৯, 'সঞ্চয়ন' শিরোনামভুক্ত।

12 'Our Problem', Visva-Bharati News, August 1942.

13 'আর্টের একটা দিক', বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৯

14 [An Address], Visva-Bharati News, February 1945.
Rathindranath's address of welcome to the delegates to the All India Newspaper Editor's Conference at Jorasanko on January 29, 1945.

15 [An Address], Visva-Bharati News, March 1945.
Sir Cyril Norwood and Sir Walter Moberly, two eminent British Educationists paid a visit to Santiniketan on Feb. 6, 1945. The above is Rathindranath's address of welcome to them.

16 'This time of Crisis', Visva-Bharati News, December 1946.
Rathindranath's Statement (as the General Secretary V.B.) in connexion with communal disturbances in certain parts of the country.

17 [An Address], Visva-Bharati News, June 1947.
Rathindranath addressed (as the General Secretary, Visva-Bharati) this message to the Indians in Trinidad, through Miss W. Shamlal Singh.

18 [An Address], Visva-Bharati News, February 1948.
The Eighth Session of All India Agricultural Economics Conference was held at Sriniketan on December 27, 28 and 29, 1947. This is the address of welcome given by Rathindranath, Chairman, Reception Committee.

19 'প্রতিভাষণ', পুস্তিকাকারে প্রচারিত, রচনাকাল ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৫৫।

রথীন্দ্রনাথের ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতন সিংহসদনে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় পঠিত। এর ইংরেজি অনুবাদ 'বিশ্বভারতী নিউজ-এ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

20 [An Address], Visva-Bharati News, December 1948.
Reply to the addresses and messages made to Rathindranath at his Sixtieth Birthday.

21 'পৃথিবীর বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল', দেশ, মার্চ ১৩৪৯

22 'A new School', Visva-Bharati News, Oct-Nov 1949.

23 [An Address], Visva-Bharati News, January 1950.
Rathindranath's address of welcome to the delegates of 'World Pacifist Meeting' at Santiniketan during December 1949.

24 'To the Students', Visva-Bharati News, Oct-Nov 1951.
An address broadcast on August 15, 1951. Translated from the original Bengali by Sri Nimai Chattopadhyay.

25 'Upacharya's Address', Visva-Bharati News, Oct-Nov 1951.
On September 22, 1951, Visva-Bharati was formally inaugurated as the Central University. The above is the full text of address given by Rathindranath as the first Vice-Chancellor of the University. This is the English version of Bengali original.

26 [An Address], Visva-Bharati News, December 1951.
Address of welcome as the Upacharya, Visva-Bharati to Chinese Cultural Mission at Santiniketan on December 2, 1951.

27 'Samavartan (Convocation Dec. 1951) Address', Visva-Bharati News, Jan. 1952.

28 'পল্লীর উন্নতি', 'রবীন্দ্রায়ণ' দ্বিতীয় খণ্ড, পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত। ২২ শ্রাবণ ১৩৬৮, বাক্ সাহিত্য। 'পিতৃস্মৃতি' (১৩৭৩) গ্রন্থভুক্ত।

চিঠিপত্র

১ 'সরোজচন্দ্র মজুমদার (ভোলা)কে লেখা চিঠি', 'রবীন্দ্রভাবনা' সন্তোষচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা, ১৩৯৪
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের লেখা চিঠির শেষে সংযোজিত।

২ 'শমীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি', (৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩), নবকল্লোল, নববর্ষ সংখ্যা ১৩৯৫

৩ 'আমেরিকা থেকে পিতা রবীন্দ্রনাথকে লেখা দুটি চিঠি', প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৪। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত।

৪ 'নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি', ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ (?)।
'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত। পুলিনবিহারী সেনের 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে সংকলিত।

৫ **'A Letter', Visva-Bharati News 1947.**
Rathindranath's letter to Dr. Taichi-Tao, a prominent Chinese leader.

রচিত গ্রন্থ

১ 'প্রাণতত্ত্ব', বিশ্বভারতী 'লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা' ভুক্ত, কার্তিক ১৩৪৮

২ 'অভিব্যক্তি', বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, চৈত্র ১৩৫২

৩ **'On the Edges of Time', Orient Longmans, June 1958; reprint Visva-Bharati 1986.**

৪ 'পিতৃস্মৃতি,' জিজ্ঞাসা, কলকাতা ২৯, ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩, পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সম্পাদিত। প্রধানত, 'On the Edges of Time' গ্রন্থের অনুবাদ। রথীন্দ্রনাথ এর সম্পূর্ণ অনুবাদ করার পূর্বেই লোকান্তরিত হন। পরবর্তী অংশ অনুবাদ করেছেন শ্রীক্ষিতীশ রায়। পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮ ; পৃষ্ঠা ১০২ শেষ অনুচ্ছেদ থেকে পৃষ্ঠা ২৩৫ পর্যন্ত শ্রীক্ষিতীশ রায় -কর্তৃক অনূদিত।

৫ 'অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত', (অনূদিত) প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

৬ 'অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত' (অনূদিত) দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কার্তিক ১৩৫৮

শ্রীআশিসকুমার হাজরা এই রচনাপঞ্জী প্রণয়নে
সংকলয়িতাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর - চিত্রপঞ্জী

শ্রীসুশোভন অধিকারী -সংকলিত

			আয়তন সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
১	সূর্যাস্ত	জলরঙ [দার্জিলিং ১৯২৯]	১৩·৭ × ৮·৭	০০·১২৮৩·১৮
২	পাহাড়	জলরঙ	৮·৭ × ১৩·৭	০০·১২৮৪·১৮
৩	নিসর্গ দৃশ্য	অস্বচ্ছ জলরঙ [১৯৩৭]	১৪ × ৮·৯	০০·১২৮৫·১৮
৪	কাঞ্চন ফুল*	অস্বচ্ছ জলরঙ	২৪ × ৩৮·৫	০০·১৩১২·১৮
৫	লিলি*	অস্বচ্ছ জলরঙ	২৪ × ৩৮·৫	০০·১৩১৩·১৮
৬	'বর্ষার দিনে ভোর বেদনা'—দৃশ্যচিত্র	অস্বচ্ছ জলরঙ শান্তিনিকেতন ২৮-৭-৩৮	২৪·৯ × ১৭·৭	০০.১৩১৪·১৮
৭	গ্ল্যাডিওলাস	জলরঙ	৮·৬ × ১৩·৭	০০·১৩১৫·১৮
৮	ম্যাগ্‌নোলিয়া	টেম্পেরা	২৪·২ × ২৭·১	০০·১৩১৬·১৮
৯	লিলি ফুলের গুচ্ছ	অস্বচ্ছ জলরঙ কালিম্পং ২০-৬-৪৮	২৫·২ × ৩৫·৫	০০·১৩১৭·১৮
১০	'দি মুন্'—দৃশ্যচিত্র	টেম্পেরা কালিম্পং জুন, ১৯৩৮	২৪ × ২৬·৯	০০·১৩১৮·১৮
১১	গাছ	মোমরঙ এবং ক্রেয়ন পেন্‌সিল	১৭·৯ × ২২·৫	০০·১৩১৯·১৮
১২	কাঞ্চন ফুল*	অস্বচ্ছ জলরঙ	২৪·৭ × ৩৬	০০ ১৪২৯·১৮
১৩	গোলাপ	অস্বচ্ছ জলরঙ	৩২·৬ × ৪৭·৮	০০·১৪৩০·১৮
১৪	ফুলের ছবি	টেম্পেরা	৮·৭ × ১৩·৯	০০·১৬১৭·১৮
১৫	দৃশ্যচিত্র	জলরঙ	৩৫·৩ × ২৫	০০·১৬১৮·১৮

নিসর্গদৃশ্য। হিমালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত
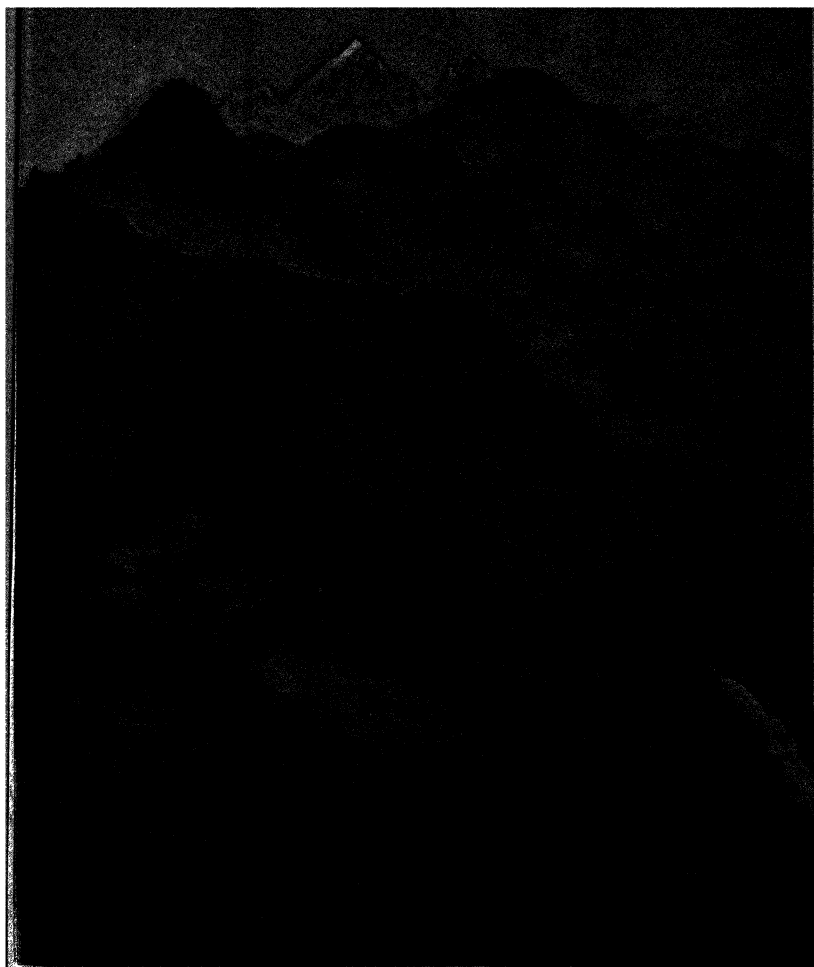
			আয়তন সেণ্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
১৬	হলিহক	টেম্পেরা	৮·৮ × ১৩·৯	০০·১৬১৯·১৮
১৭	লিলি	টেম্পেরা	৮·৮ × ১৩·৬	০০·১৬২১·১৮
১৮	শ্বেতজবা	টেম্পেরা	৮·৭ × ১৩·৭	০০·১৬২২·১৮
১৯	দোপাটী	জলরঙ	৮·৬ × ১৩·৬	০০·১৬২৩·১৮
২০	মুসাণ্ডা	টেম্পেরা	৮·৯ × ১৩·৬	০০·১৬২৪·১৮
২১	কাঞ্চন ফুল	টেম্পেরা	৮·৭ × ১৩·৮	০০·১৬২৫·১৮
২২	কলাবতী	ভার্নিশের প্রলেপ-যুক্ত টেম্পেরা	৮·৮ × ১৩·৮	০০·১৬২৬·১৮
২৩	পাহাড়	ওয়াশ ও টেম্পেরা কালিম্পং জুন, ১৯৪০	৩৫·৫ × ২৫·২	০০·১৬২৮·১৮
২৪	দৃশ্যচিত্র	জলরঙ	৩৫·৩ × ২৩·৫	০০·১৬৪৫·১৮
২৫	পাহাড় ও গাছ	টেম্পেরা	২৫·২ × ৩৫·৪	০০·১৬৪৬·:৮
২৬	মাঝি	জলরঙ	৩৫·৫ × ২৫·২	০০·১৬৪৭·১৮
২৭	ম্যাগ্‌নোলিয়া	অস্বচ্ছ জলরঙ কালিম্পং জুন, ১৯৪০	২৫·৫ × ৩৫·৫	০০·১৬৪৮·১৮
২৮	দৃশ্যচিত্র	জলরঙ	২৫·৫ × ১৫·৪	০০·১৬৪৯·১৮
২৯	ইলিজিনিয়া	মোমরঙ ও জলরঙ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯	১৫·৩ × ২৩	০০·১৬৫০·১৮
৩০	ছাদ থেকে উত্তরায়নের বাগান	অস্বচ্ছ জলরঙ	১৭·৩ × ২৪·৪	০০·১৬৫১·১৮
৩১	ফুলের ছবি	টেম্পেরা	১৭·২ × ২৪·৪	০০·১৬৫২·১৮
৩২	নিসর্গ দৃশ্য	জলরঙ	১৭·৩ × ২৪·৫	০০·১৬৫৩·১৮
৩৩	গন্ধরাজ	মোমরঙ ও পেনসিল	১৪·৫ × ২২·৫	০০·১৬৫৪·১৮
৩৪	দোলন চাঁপা	প্যাস্টেল ও ক্রেয়ন পেনসিল	১৭·৪ × ২৫	০০১৬৫৬·১৮
৩৫	থণ্ডার লিলি	টেম্পেরা	১৩·৭ × ৮·৮	০০·১৬৫৭·১৮

			আয়তন সেণ্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
৩৬	পাহাড়	জলরঙ	১৩.৬ × ৮.৭	০০.১৬৫৮.১৮
৩৭	ফুলের বাগান	অস্বচ্ছ জলরঙ	১৪ × ৯	০০.১৬৫৯.১৮
৩৮	নদীর ধার	জলরঙ	১৪ × ৯	০০.১৬৬০.১৮
৩৯	ফুলভরা টব	মোমরঙ ও ক্রেয়ন পেন্‌সিল	৯.৯ × ১৪.৯	০০.১৬৬১.১৮
৪০	নিসর্গ দৃশ্য	জলরঙ	১৩.৯ × ৮.৮	০০.১৬৬২.১৮
৪১	নাগকেশর	টেম্পেরা	৮.৫ × ১৩.৬	০০.১৬৬৩.১৮
৪২	পাহাড়	টেম্পেরা	৮.৬ × ১৩.৮	০০.১৬৬৪.১৮
৪৩	পাহাড়	টেম্পেরা	১৩.৮ × ৮.৮	০০.১৬৬৫.১৮
৪৪	পাহাড়	টেম্পেরা	৮.৭ × ১৩.৬	০০.১৬৬৬.১৮
৪৫	লিলি ফুলের সারি	অস্বচ্ছ জলরঙ	৮.৮ × ১৩.৬	০০.১৬৬৭.১৮
৪৬	ফুলের ছবি	জলরঙ	১৩.৭ × ৮.৬	০০.১৬৬৮.১৮
৪৭	তিব্বতী মেয়ের মুখোশ	অস্বচ্ছ জলরঙ	২৪.২ × ২৭.২	০০.১৬৬৯.১৮
৪৮	ফুলের ছবি	জলরঙ	৮.৭ × ১৩.৭	০০.১৬৭০.১৮
৪৯	পাহাড়	টেম্পেরা	১৩.৮ × ৮.৮	০০.১৬৭১.১৮
৫০	জবা	টেম্পেরা	১২.৩ × ১৭.৩	০০.১৬৭২.১৮
৫১	লিলি	টেম্পেরা	১৩.৫ × ১৮.৪	৮৩.৩৪৬২.১৮
৫২	পাহাড়ের দৃশ্য	ওয়াশ ও টেম্পেরা	৩৫.৬ × ২৫.২	৮৩.৩৪৬৩.১৮

* চিহ্নিত চিত্রাবলী অ্যাস্‌বেস্‌টস বোর্ডের অপেক্ষাকৃত মসৃণতলে অঙ্কিত

রথীন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুমুখিতার একটি দিক, তাঁর স্বশিক্ষিত চিত্রাঙ্কনচর্চা। তাঁর ছবিতে বিশেষভাবে ফুলের বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। সম্ভবত ফুলের বাগানের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোলাগার মধ্য দিয়ে তাঁর ছবিতে এসেছে এত বর্ণিল ফুলের রাশি। আর এই-সব ফুলের ছবি এত দক্ষ ও নিপুণহাতে আঁকা যে প্রায় প্রত্যেকটি ফুলকেই বস্তুনিষ্ঠ অনুপুঙ্খতার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। এ ছাড়া তাঁর ছবির অপর বিষয়— দৃশ্যচিত্র, যা মুখ্যত পাহাড়। আর এগুলি হয়তো বেশির ভাগই মংপু কালিম্পং দার্জিলিং আলমোড়ার দৃশ্য। তিনি যৌবনেই ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন শোনা যায়। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহের ছবি অনুসন্ধান করে দেখা যায় সবচেয়ে প্রাচীন তারিখ ১৯২৮। যদিও রথীন্দ্রনাথ ছবিতে কদাচ তারিখ দিয়েছেন। কয়েকটি ছবি পোস্টকার্ডে আঁকা— সেগুলি ডাকে পাঠানো হয়েছিল। মুখ্যত আঁদ্রে কার্পলে ও তাঁর স্বামীকে লেখা সেই চিঠিগুলি পরে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে যুক্ত হয়েছে। সেখানে পোস্ট-অফিসের ছাপ দেখে সম্ভাব্য তারিখ বসানো হয়েছে। আনুমানিক তারিখ তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে যুক্ত হল।

রথীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুটি ধারা স্পষ্টত চোখে পড়ে। একটি সমসাময়িক বাংলা কলমের ওয়াশ ও টেম্পেরা রীতি এবং অপরটি বর্ণলেপনে ইম্প্রেশনিজমের অনিকট প্রভাব ও তথাকথিত পয়েণ্টালিজমের চিত্রগুণগত প্রয়োগ। ছবির পট হিসেবে প্রধানত তিনি ব্যবহার করেছেন 'হোয়াট্‌ম্যান' ও 'কেণ্ট পেপার'। আর কয়েকটি ছবি 'অ্যাস্‌বেস্‌টস বোর্ডে' আঁকা, কয়েকটি ছবি জাপানি কাগজ বা বোর্ডের উপর আঁকা (ক্রমিকসংখ্যা ৮,১০ এবং ৪৭)। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালাভুক্ত রথীন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর যে তালিকা এখানে মুদ্রিত হল, এগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিতে তাঁর অঙ্কিত মূল চিত্র সংরক্ষিত আছে, এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহেও কিছু সংখ্যক চিত্র আছে। ভবিষ্যতে রথীন্দ্রনাথের শিল্প-কীর্তির সম্পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন সম্ভবপর হলে তাঁর কাজের বিস্তারিত ও গভীরতর পরিচয় পাওয়া যাবে।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর - কৃত দারুশিল্পপঞ্জী

শ্রীইন্দ্রাণী দাস -সংকলিত

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
	রবীন্দ্রভবন সংগ্রহভুক্ত :		
১	ভাঁজ করা গহনার বাক্স। ঢাকনায় ধাতব নকশার কাজ। ব্ল্যাক সিস্থ।	২২.৯ X ১৫.৫ উচ্চতা ১৪	১.১০
২	গহনার বাক্স। ঢাকনায় 'ইনলে'র কাজ। চাঁপ, ব্ল্যাক সিস্থ, গামার, সিস্থ।	২২ X ১১.৬ উচ্চতা ৮	২.১০
৩	কাসকেট। ঢাকনায় ইনলে'র কাজ। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	২০ X ৯ উচ্চতা ৯	৩.১০
৪	আয়তাকার বাক্স। ঢাকনায় 'ইনলে'র কাজ। পাডুক, ব্ল্যাক সিস্থ।	২২.৫ X ১২.২ উচ্চতা ১০.২	৪.১০
৫	বাক্স। চারপাশে 'ইনলে'র কাজ। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১৫.৩ X ৭.৫ উচ্চতা ৯.৬	৫.১০
৬	বাক্স। ঢাকনায় 'ইনলে' এবং গালার কাজ। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, পাডুক, ব্ল্যাক সিস্থ।	১১ X ৭.৪ উচ্চতা ৫	৬.১০
৭	বাক্স। ঢাকনায় 'ইনলে'র কাজ। গামার, মূর্গা।	১০ ৬ X ৭.৩ উচ্চতা ৪	৭.১০
৮	বাক্স। ব্ল্যাক সিস্থ, গামার।	১৬.২ X ৭.৮ উচ্চতা ৯	৮.১০
৯	চৌকো, রঙ করা পাউডার কৌটো। উপরে ফুলের ছবি আঁকা। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার।	১০.৫ X ১০.৫ উচ্চতা ৪.৫	৯.১০

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
১০	দেশলাই রাখার বাক্স। 'ইনূলে'র কাজ করা। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, আবলুস।	৭.৪ × ৪.৮ উচ্চতা ৬.২	১০.১০
১১	ফোটো রাখার বাক্স। 'ইনূলে'র কাজ। সিসু, হলদু, আবলুস।	১৩.৭ × ৮.৬ উচ্চতা ২.২	১১.১০
১২	কাসকেট। ঢাকনায় ইনূলের কাজ। 'R.T.' চিহ্নিত। ওক, ব্ল্যাক সিসু, গামার।	১৭ × ৯.৬ উচ্চতা ৬.২	১২.১০
১৩	গহনার বাক্স। ঢাকনায় 'ইনূলে'র কাজ। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিসু।	১৭.৬ × ১০ উচ্চতা ৬.৯	১৩.১০
১৪	রঙ করা হোমিওপ্যাথির বাক্স। উপরে নকশা যুক্ত। গামার।	১৩.৩ × ৬.৬ উচ্চতা ৯.৩	১৪.১০
১৫	বাক্স। ঢাকনায় 'ইনূলে'র কাজ। ওক্, ব্ল্যাক সিসু।	৯.৩ × ৫.৪ উচ্চতা ৮.৭	১৫.১০
১৬	কাসকেট ঢাকনায় 'ইনূলে'র কাজ। পাডুক, ব্ল্যাক সিসু।	১৮.৫ × ৯.৫ উচ্চতা ৬.১	১৬.১০
১৭	গোলাকার পাউডার কৌটো। গামার।	নীচের ব্যাস ৯.৫ উচ্চতা ৬	১৭.১০
১৮	চৌকো পাউডার কোটো। ঢাকনায় 'ইনূলে'র কাজ। গামার, ব্ল্যাক সিসু।	৯.২ × ৯.২ উচ্চতা ৬.৬	১৮.১০
১৯	বাক্স। ঢাকনায় 'ইনূলে'র কাজ। গামার, ব্ল্যাক সিসু।	৯ ২ × ৯.২ উচ্চতা ৬.৬	১৯.১০
২০.	বাক্স। ঢাকনায় লালরঙের গালার কাজ। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার।	১১.৪ × ৬ উচ্চতা ৪	২০.১০
২১	সিগারেট কেস। গামার, ব্ল্যাক সিসু।	১৪.২ × ৭ উচ্চতা ১১.৭	২১.১০
২২	প্যাগোডার অনুকরণে তৈরি কৌটো। সেগুন।	৮.৮ × ৮.৮ উচ্চতা ১০.২	২২ ১০

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
২৩	ছোটো বাক্স। 'রথী' স্বাক্ষরিত। ব্ল্যাক সিস্থ।	৯ × ৯ উচ্চতা ৮·৬	২৩·১০
২৪	রান্নাঘরের সরঞ্জাম। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। সেগুন।	৬·৮ × ৫·৯ উচ্চতা ৮·৫	২৪·১০
২৫	পায়াযুক্ত আলপিন রাখার বাক্স। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	৬·৫ × ৬ উচ্চতা ৯.২	২৫·১০
২৬	আটকোণ বিশিষ্ট পাউডার কৌটো। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। বার্নিশ করা ঢাকনার ভিতর দিকে খোদাই করা ছাঁচের মতো ফুলের নকশা। গামার।	উচ্চতা ৬·২	২৬·১০
২৭	স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি বাক্স। ঢাকনায় 'ইন্‌লে'র কাজ করা। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। সিস্থ।	১৪·৭ × ৬·৭ উচ্চতা ১০·৫	২৭·১০
২৮	পিনের বাক্স। দুদিকে 'ইন্‌লে'র কাজ। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার। ব্ল্যাক সিস্থ।	৭·৫ × ৬·৫ উচ্চতা ১১	২৮·১০
২৯	স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি বাক্স। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। সিস্থ।	১১·১ × ৭ উচ্চতা ৬·৫	২৯·১০
৩০	ছয়টি দেরাজযুক্ত আলমারি বিশেষ। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১২·৩ × ১২·৩ উচ্চতা ১৭·৪	৩০·১০
৩১	বাক্স। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। ব্ল্যাক সিস্থ।	৮·৩ × ৭·৪ উচ্চতা ৮	৩১·১০
৩২	আটকোণ-যুক্ত কৌটো। 'ইন্‌লে'র কাজ। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	নীচের ব্যাস ৯·৫ উচ্চতা ১০	৩২·১০
৩৩	স্তূপের অনুকরণে তৈরি কৌটো। 'ইন্‌লে'র কাজ। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ, মুর্গা।	৯·১ × ৯·১ উচ্চতা ৯	৩৩·১০
৩৪	গৃহের অনুকরণে তৈরি সিগারেট কেস্। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১০ × ৭·৩ উচ্চতা ৮·৫	৩৪·১০

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
৩৫	বাক্স। গামার, পাডুক, মার্বেল (আন্দামান)।	২২·৪ × ১২ উচ্চতা ৯·৫	৩৫·১০
৩৬	কুটিরের অনুকরণে তৈরি পাউডার কৌটো। গায়ে রিলিফ ও 'ইন্‌লে'র কাজ। ব্ল্যাক সিস্থ, গামার।	১২·৫ × ১০·৫ উচ্চতা ১৫	৩৬·১০
৩৭	পোকারের যন্ত্র দিয়ে নকশা করা আটকোণ -বিশিষ্ট বাক্স। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ৭·৬	৩৭·১০
৩৮	বিভিন্ন মাপের তুরপুন রাখার স্ট্যাণ্ড। ব্ল্যাক সিস্থ।	১০·৫ × ৯·৫ উচ্চতা ১২·৮	৩৮·১০
৩৯	রান্নাঘরের সরঞ্জাম। 'ইন্‌লে'র কাজ। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	৯·৫ × ৯·৫ উচ্চতা ১০·৫	৩৯·১০
৪০	সিগারেট কেস্। ব্ল্যাক সিস্থ, গামার।	১৫·২ × ১০·৫ উচ্চতা ১৬·৫	৪০·১০
৪১	নকৃশা করা ছাপাই ব্লক। ব্ল্যাক সিস্থ।	৭·২ × ৭·৩ উচ্চতা ৯	৪১·১০
৪২	বাক্স। 'ইন্‌লে'র কাজ। 'R. T.' চিহ্নিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	৭·৩ × ৭·৩ উচ্চতা ৮·৫	৪২·১০
৪৩	দোয়াতদান। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১৫·৭ × ১০·৭ উচ্চতা ২·৭	৪৩·১০
৪৪	পিন রাখার কৌটো। ঢাকনায় ধাতব নকশার কাজ। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	৫·৭ × ৫·৭ উচ্চতা ৭·৫	৪৪·১০
৪৫	স্তম্ভের অনুকরণে তৈরি দোয়াতদান। 'ইন্‌লে'র কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১০·৫	৪৫·১০
৪৬	স্তম্ভের অনুকরণে তৈরি দোয়াতদান। 'ইন্‌লে'র কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১০·৫	৪৬·১০
৪৭	গোলমরিচদানি। স্তম্ভের অনুকরণে		

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
	তৈরি। রিলিফের কাজ।		
	গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১০·৫	৪৭·১০
৪৮	লবণদানি। স্তম্ভের অনুকরণে তৈরি।		
	রিলিফ এবং 'ইন্‌লে'র কাজ।		
	গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১০·৫	৪৮·১০
৪৯	ক্ষুদ্রাকার সিগারেট কেস্। 'ইন্‌লে'র	দৈর্ঘ্য ৯·২	৪৯·১০
	কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ৫·৫	
৫০	সিগারেট কেস্। 'ইন্‌লে'র কাজ করা।		
	গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	দৈর্ঘ্য ১৪	৫০·১০
৫১	ভাঁজ করা বাক্স। ঢাকনায় রিলিফের	১৪·৭ X ৬·৫	৫১·১০
	এবং অন্যান্য অংশে 'ইন্‌লে'র কাজ।	উচ্চতা ১০	
	ওক, ব্ল্যাক সিস্থ।		
৫২	লম্বাগড়নের বাক্স। 'ইন্‌লে'র কাজ করা।	১০·৫ X ১০·৪	৫২·১০
	গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১৯	
৫৩	জ্যামিতিক প্যাটার্নের বাক্স। গামার,	৯·৪ X ৯·৪	৫৩·১০
	ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১০·৫	
৫৪	প্যাগোডার অনুকরণে তৈরি বাক্স। '**R.T.**'	৯·৩ X ৯·৩	৫৪·১০
	চিহ্নিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১০·৫	
৫৫	বাক্স। ব্ল্যাক সিস্থ।	৯.৩ X ৯·২	৫৫·১০
		উচ্চতা ৭·৫	
৫৬	রান্নাঘরের সরঞ্জাম 'ইন্‌লে'র কাজ করা।	৭·৮ X ৭·৮	৫৬·১০
	গামার। ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ৮·৫	
৫৭	লবণদানি।	৫·৮ X ৫·৭	৫৭·১০
	গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ৯	
৫৮	জ্যামিতিক প্যাটার্নের বাকস। সেগুন।	১০ X ৯·৩	৫৮·১০
		৮·৫	

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
৫৯	স্তূপের অনুকরণে তৈরি বাক্স। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	৯'৫ × ৯'৫ উচ্চতা ৮	৫৯'১০
৬০	ঢাকনাবিহীন বাক্স। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১০'১ × ১০'১ উচ্চতা ১৩	৬০'১০
৬১	পেপার ওয়েট। ব্ল্যাক সিস্থ।	৫'৪ × ৫'২ উচ্চতা ৫	৬১'১০
৬২	দোয়াতদান। শাল, ব্ল্যাক সিস্থ।	২৪'৭ × ৭.৫ উচ্চতা ৭	৬২'১০
৬৩	সিগারেট কেস্। গামার, ব্ল্যাক্ সিস্থ।	১৮'৯ × ১১'২ উচ্চতা ১৮'৫	৬৩'১০
৬৪	দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট বাক্স। ব্লাক সিস্থ, গামার।	১৪'৫ × ৮'৫ উচ্চতা ১৩	৬৪'১০
৬৫	কলমদানি। 'ইন্লে'র কাজ করা। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	২৩'২ × ১৫'৯ উচ্চতা ৭	৬৫'১০
৬৬	কলমদানি। 'ইন্লে'র কাজ করা। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	২১'৫ × ১৬ উচ্চতা ৭	৬৬'১০
৬৭	টয়লেট পেপার রাখার বাক্স। 'ইনলে'র কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	২৩ × ১৪'৬ উচ্চতা ৪'৫	৬৭'১০
৬৮	হাতলযুক্ত কাঠের ঝুড়ি। গামার ব্ল্যাক সিস্থ।	২১ × ১০'১ উচ্চতা ২২.৭	৬৮'১০
৬৯	সিগারেট কেস। 'ইন্লে'র কাজ করা। বার্নিশের প্রলেপ যুক্ত। ব্ল্যাক সিস্থ, গামার।	১৩ × ১০	৬৯'১০
৭০	সিগারেট কেস্। ওক্, ব্ল্যাক সিস্থ।	১১ × ৮'৫	৭০'১০
৭১	ফোটো স্ট্যাণ্ড। 'ইন্লে'র কাজ করা গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১৫'৮ × ১০	৭১'১০
৭২	সিগারেট কেস। 'ইন্লে'র কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১২'৭ × ৯.২	৭২'১০

বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
৭৩ বাক্স। বার্নিশযুক্ত। গামার	১১'৫ × ৮'৩	৭৩'১০
৭৪ সিগারেট কেস্। গামার, ব্ল্যাক সিস্থূ।	৯'২ × ৬'৫	৭৪'১০
৭৫ সিগারেট কেস্। ব্ল্যাক সিস্থূ।	৯'৩ × ৭'৬	৭৫'১০
৭৬ নকশাযুক্ত সিগারেট কেস্। 'রথী' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থূ,	৯'৮ × ৭'৩	৭৬'১০
৭৭ নকশাযুক্ত সিগারেট কেস্। গামার ব্ল্যাক সিস্থূ।	৯'৬ × ৮	৭৭'১০
৭৮ স্লাইড দেখবার যন্ত্র। ক্যামেরার অনুকরণে তৈরি। উপরে বার্নিশ করা। সেগুন।	১১'৫ × ৫'২ উচ্চতা ৯.৫	৭৮'১০
৭৯ রান্নাঘরের সরঞ্জাম। গামার, ব্ল্যাক সিস্থূ	১৬'৩ × ৬'৬ উচ্চতা ৬'৫	৭৯'১০
৮০ দুই প্রকোষ্ঠযুক্ত সিগারেট কেস্। 'ইন্‌লে'র কাজ। ব্ল্যাক সিস্থূ, গামার।	১০ × ১২ উচ্চতা ১১	৮০'১০
৮১ দৈত্যের মুখাবয়ব। কাঠ খোদাইয়ের কাজ। পাইন।	উচ্চতা ৩৪	৮১'১০
৮২ ট্রে। 'ইন্‌লে'র কাজ করা। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থূ, পাইন।	৫১'৮ × ৩৩'৮	৮২'১০
৮৩ রান্নাঘরের সরঞ্জাম। গামার, ব্ল্যাক সিস্থূ।	১৭ × ৮'৮ উচ্চতা ৯	৮৩'১০
৮৪ ক্ষুদ্রাকার পালঙ্ক। গামার।	২১ × ১০ উচ্চতা ৮'৬	৮৪'১০
৮৫ লম্বা গড়নের কৌটো। 'রথী স্বাক্ষরিত। মেহগনি।	ব্যাস ১০'৬ উচ্চতা ১৫	৮৫.১০
৮৬ পাঁউরুটির টুকরো রাখার তাক্। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থূ।	২৮ × ১৫.১ উচ্চতা ৮'৮	৮৬'১০
৮৭ খোদাই করা হাতলযুক্ত 'ব্লটিং' লাগানো প্যাড। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত।	১৪'৫ × ৮'৩ উচ্চতা ১০	৮৭'১০

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
৮৮	দোয়াতদান। 'ইন্‌লে'র কাজ। ব্ল্যাক সিস্থ। গামার।	২০'২ × ৯ উচ্চতা ১১'৬	৮৮'১০
৮৯	বই রাখার তাক। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	২২'৬ × ১৩'৬ উচ্চতা ১২'১	৮৯'১০
৯০	চিত্রিত টেবিল টপ। বার্নিশের প্রলেপযুক্ত। পাইন।	দৈর্ঘ্য ৪৪'৫ উচ্চতা ৪	৯০'১০
৯১	টেবিল ল্যাম্প। গালার কাজ। মেহগনি।	ব্যাস ১২'৪ উচ্চতা ১৮'৩	৯১'১০
৯২	একখণ্ড গাছের ডাল ও নারকেলের মালাযুক্ত ছাইদান।	উচ্চতা ২৯ ৩	৯২'১০
৯৩	টেবিল ল্যাম্প। 'ইন্‌লে'র কাজ। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১২'৫ × ১২ উচ্চতা ৩৬'২	৯৩'১০
৯৪	একটি অসম্পূর্ণ কাজ। দেশি সেগুন।	দৈর্ঘ্য ১৫ উচ্চতা ৭'১	৯৪'১০
৯৫	রান্নাঘরের সরঞ্জাম। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১৪'৪ × ৬'৪ উচ্চতা ৬'৪	৯৫'১০
৯৬	বিভিন্ন মাপের তুরপুন রাখার স্ট্যাণ্ড। ব্ল্যাক সিস্থ।	১৩'১ × ১২'৯	৯৬'১০
৯৭	কার্ড রাখার স্ট্যাণ্ড। ব্ল্যাক সিস্থ।	দৈর্ঘ্য ১২'৪	৯৭'১০
৯৮	কাঞ্চনগুচ্ছ। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। 'ইন্‌লে' করা। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। ১৫.৭.৫২ ; শান্তিনিকেতন। ব্ল্যাক সিস্থ. গামার, মূর্গা, মেহগনি।	৪০ × ২০'৪	৯৮'১০
৯৯	চিত্রিত টেবিল স্ট্যাণ্ড ? পাইন।	২৫'৫ × ১৭'৫	৯৯'১০
১০০	দাবা খেলার বোর্ড। সঙ্গে হাতির দাঁতের তৈরি ঘুঁটি। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	২৯'২ × ১৪'৭	১০০'১০

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
১০১	ফুল ও পাখি। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ 'ইনলে'-করা। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। ব্ল্যাক সিস্থ, গামার, পাডুক ও হাতির দাঁত।	৩৫·৩ × ২৭.৩	৩১২·১০
১০২	শালবনে সাঁওতাল রমণী। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। 'ইনলে' করা। মার্বেল (আন্দামান), গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	৫০·৩ × ২৪·৪	৩১৩·১০
১০৩	কলমদানি। 'ইনলে'র কাজ করা। নীচে লেখা, "হরিবাবুকে[১] শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রণত 'রথীন্দ্র'; বৈশাখ ১৩৬০" গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১৯·২ × ৫৬ উচ্চতা ৭·৯	৩১৪·১০
১০৪	কলমদানি। 'ইনলে'র কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১৩·৭ × ৫·৬ উচ্চতা ৭·৫	৩১৫·১০
১০৫	কলমদানি। 'ইনলে'র কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ, আবলুস।	১৪·৫ × ৬·৩ উচ্চতা ৭·৯	৩১৬·১০
১০৬	ট্রে। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। পাইন।	৫৪ × ৩২ উচ্চতা ৫·১	৬৭৬·১০
১০৭	'প্রণমি করজোড়ে'। চিত্রধর্মী কাঠের 'ইনলে' কাজ। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। মুর্গা, সেগুন।	৪৯ × ৩২·৫	৭১৬·১০
১০৮	পক্ষীযুগল। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। রবীন্দ্র চিত্রের অনুকৃতি। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। ব্ল্যাক সিস্থ, মুর্গা, সিস্থ।	৪১ × ২৮	৭১৭·১০
১০৯	মাতৃক্রোড়ে। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। 'ইনলে' করা। পেছনে লেখা আছে— গামার, মেহগনি, সংশাল (Rose wood)		

১. হরিবাবু। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাচীন শিক্ষক 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে অনুমান করা যায়।

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
	কেন (আবলুস), কাঁঠাল, পাডুক, কুর্চী. পেয়ারা, বন কাঁঠাল, আখরোট। ৫ ফাল্গুন ; ১৩৫৮ ; শান্তিনিকেতন ।	৪৫·৭ × ৩১	৭১৮·১০
১১০	গৃহমুখী। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। 'ইনলে' করা। ব্ল্যাক সিসু, সিসু, গামার।	৬৫·৭ × ২০	৭১৯·১০
১১১	জ্যামিতিক প্যাটার্নের কৌটো। 'ইনলে'র কাজ করা। ব্ল্যাক সিসু, গামার।	১১·৫ × ১১ উচ্চতা ২০·৫	৭২০·১০
১১২	কুটিরের অনুকরণে তৈরি পাউডার কৌটো। গামার, ব্ল্যাক সিসু।	১৩·১ × ১১ উচ্চতা ১৩·৫	৭২১·১০
১১৩	স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি লম্বা গড়নের বাক্স। সামনে ও পিছনে সমবেত নৃত্যের দৃশ্য, দু'পাশে ও মাথায় আলংকারিক নকশা। রিলিফের কাজ। গামার, ব্ল্যাক সিসু। তামার পাতে রিলিফের কাজের অনুরূপ একটি অনুকৃতি কলাভবনে আছে।	১৭ × ১০·৭ উচ্চতা ১৫	৭২২·১০
১১৪	বাক্স। সরাসরি বৃক্ষকাণ্ড থেকে নির্মিত। বাকল যথাযথ রক্ষিত। মেহগনি।	২১ × ৯·৫ উচ্চতা ১৫·৫	৭২৩·১০
১১৫	স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি বাক্স। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিসু।	১০·৫ × ১০·৬ উচ্চতা ১১	৭২৪·১০
১১৬	জ্যামিতিক প্যাটার্নের কৌটো 'ইনলে'র কাজ করা। ওক্, ব্ল্যাক সিসু।	উচ্চতা ১৪	৭২৫·১০
১১৭	বাক্স। সরাসরি বৃক্ষকাণ্ড থেকে নির্মিত। বাক্স যথাযথ রক্ষিত।	দৈর্ঘ্য ১৭ উচ্চতা ১২·৫	৭২৬·১০
১১৮	দোয়াতদানি। হাতলে জ্যামিতিক নকশা। ব্ল্যাক সিসু।	দৈর্ঘ্য ১৭ উচ্চতা ১৬·৫	৭২৭·১০
১১৯	গহনার বাক্স। ঢাকনায় 'গালার' কাজ। ব্ল্যাক সিসু।	১০·৭ × ১০·২ উচ্চতা ৭·২	৭২৮·১০

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
১২০	স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি বাক্স। ব্ল্যাক সিস্থ।	১০ × ৭·৩ উচ্চতা ৭·৫	৭২৯·১০
১২১	স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি পাউডার কৌটো। গামার।	১০ × ৯·৮ উচ্চতা ৬·৫	৭৩০·১০
১২২	জ্যামিতিক প্যাটার্নের পাউডার কৌটো। 'R. T.' চিহ্নিত। গামার, আবলুস।	৯ ৮ × ৯·৮ উচ্চতা ৬·৫	৭৩১·১০
১২৩	পাউডার কৌটো। 'ইন্‌লে'র কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ৭	৭৩২·১০
১২৪	পিন্ রাখার বাক্স। 'ইনলে'র কাজ। স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	৭·৫ × ৬·১ উচ্চতা ৯·৫	৭৩৩·১০
১২৫	কলমদানি। ব্ল্যাক সিস্থ, গামার।	১৩·১ × ৫·৬ উচ্চতা ৭·৫	৭৩৪·১০
১২৬	পাউডার কৌটো। ব্রাজিল বাদামের অনুকরণে তৈরি। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	৭·৯ × ৮·১ উচ্চতা ৭·৫	৭৩৫·১০
১২৭	সিগারেট কেস্। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১০ × ৯ ৫	৭৩৬·১০
১২৮	সিগারেট কেস্। মার্বেল (আন্দামান), ব্ল্যাক সিস্থ।	৮ ৭ × ৬·৫	৭৩৭·১০
১২৯	তাস রাখবার তাক। গামার।	৯·৩ × ৩·১ উচ্চতা ৪·৫	৭৩৮·১০
১৩০	ধূপদান। মন্দিরের চূড়ার অনুকরণে তৈরি। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১০	৭৩৯·৯০
১৩১	জ্যামিতিক প্যাটার্নের পাউডার কৌটা। ইন্‌লের কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১২·১ × ১২·৩ উচ্চতা ৬·৫	৭৪০·১০
১৩২	তামাক সেবনের পাইপ। 'ইন্‌লে'র কাজ করা। ব্ল্যাক সিস্থ, গামার।	১৭·৫	৭৪১·১০

	বিবরণ	আয়তন/ সেণ্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
১৩৩	ভাঁজ করা লেখার টেবিল। মূর্গা, ব্ল্যাক সিসু, গামার, সিসু।	৭৬ × ৪৪ উচ্চতা ২১.৫	১০৩৭.১০
১৩৪	পাহাড়। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। 'ইন্‌লে' করা। ডানদিকে 'রথী' স্বাক্ষরিত। পিছনে লেখা 'শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তি-নিকেতন। ১৫ মাঘ, ১৩৫৮'। ব্ল্যাক সিসু, গামার, সিসু, পাডুক।	৩৬.৫ × ২৫.৩	১৩২০.১০
১৩৫	'যুগল'। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। ইন্‌লে করা। রবীন্দ্রচিত্রের অনুকৃতি। পশ্চাৎ-পটে জলরঙের উপর বার্নিশের প্রলেপ। পিছনে লেখা— "রথীন্দ্র। রাজপুর। ৪.৮.৬০ পাডুক, ব্যাক সিসু"।	২৯.১ × ২০.৫	১৩২১.১০
১৩৬	রমণী। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। ইন্‌লে করা। রবীন্দ্রচিত্রের অনুকৃতি। 'রথী' স্বাক্ষরিত। মূর্গা, ব্ল্যাক সিসু, পাডুক।	৩২ × ২২	১৩২২.১০
১৩৭	রমণী। ইন্‌লের কাজ করা। 'রথী' স্বাক্ষরিত। সিসু, ব্ল্যাক সিসু, গামার, পাডুক, সৎশাল, সেগুন।	২৭ × ১৮.৪	১৩২৩.১০
১৩৮	মুখোশ। চামড়ার কাজ। রবীন্দ্র-চিত্রের অনুকৃতি। বাটিক, টুলিং। মিশ্র পদ্ধতি।	৫৬ × ৪৩ ৬	১৩৩৪.১০
১৩৯	জান্তব আকৃতি। চামড়ার কাজ। রবীন্দ্রচিত্রের অনুকৃতি। বাটিক, টুলিং। মিশ্র পদ্ধতি।	৫৭.৮ × ৪২	১৩৩৫.১০
১৪০	গ্রামের দৃশ্য। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। ইন্‌লে করা। 'রথী' স্বাক্ষরিত। গামার, সিসু, ব্ল্যাক সিসু, চাকল্‌দা।	৩৩.৫ × ২৪.৭	১৩৬৬.১০

	বিবরণ	আয়তন/ সেণ্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
১৪১	পাখি। চিত্রধর্মী কাঠের কাজ। রবীন্দ্রচিত্রের অনুকৃতি। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। পিছনে ইংরেজি স্বাক্ষর Rathindranath.' ব্ল্যাক সিস্থ, পাইন।	৩৫.৫ × ২৮.১	১৩৬৭.১০
১৪২	বাক্স। ঢাকনায় চিত্রধর্মী ইন্‌লের কাজ। বিষয় পাহাড়ের পশ্চাৎপটে যুগল। শিরীষ, গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১১.৬ × ৮ উচ্চতা ৬.৩	৪৩৬৮.১০
১৪৩	কোটো। বার্নিশ করা সেগুন।	উচ্চতা ২৫	১২৬৯.১০
১৪৪	কৌটো। ইন্‌লের কাজ। গামার। ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১৩ ৩	১৩৭০'১০
১৪৫	স্তম্ভের অনুকরণে, তৈরি ধূপদান। ইন্‌লের কাজ করা। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	উচ্চতা ১০.৮	১৩৭১.১০
১৪৬	মন্দিরের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। সেগুন, সিস্থ।	উচ্চতা ৬	১৩৭২. ১০
১৪৭	কৌটো। গালার প্রলেপযুক্ত।	ব্যাস ১৪.৮	১৩৭৩.১০
১৪৮	টেবিল ঘড়ির ফ্রেম। সরাসরি বৃক্ষকাণ্ড থেকে তৈরি। বাকল যথাযথ রক্ষিত। মেহগনি।	দৈর্ঘ ৩৭.৫ উচ্চতা ২৩.৫	১৫৭৫.১০
১৪৯	ট্রে। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। পাইন, সেগুন।	৭৫ ০ × ৩২	১৮০৩.১০
১৫০	ঘড়ি। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	দৈর্ঘ্য ৪২'৫ উচ্চতা ২৮'১	৬৯৭.৫

কলাভবন সংগ্রহভুক্ত :

১৫১	গহনার বাক্স। ইন্‌লের কাজ করা। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	২৫.৫ × ১৪.৫ উচ্চতা ৬.৭	এ/২৯

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
১৫২	হাতল এবং পায়াযুক্ত গহনার বাক্স। ইন্‌লের কাজে কাঠ এবং হাতির দাঁতের ব্যবহার। ঢাক্‌নার উপরে চিত্রধর্মী ইন্‌লের কাজ। বিষয়-'মা ও সন্তান'। ব্ল্যাক সিস্থ, গামার, পাইন ও সুপারি।	২২.৩ × ১১ উচ্চতা ৯	এ/২৮
১৫৩	গহনার বাক্স। ঢাকনায় ইনলের চিত্রধর্মী কাজ। বিষয়-নৃত্যরতা মেয়ে। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১৮.৮ × ১০.৩ উচ্চতা ৬.৩	এ/৩৩
১৫৪	গহনার বাক্স। অলংকরণবিহীন 'ইন্‌লে'র কাজ। গামার. মার্বেল (আন্দামান)	২০.৩ × ১১.২	বি/৩৯
১৫৫	চুরুটের বাক্স, মার্বেল (আন্দামান)	১৪ × ৯.৩ উচ্চতা ৩.২	৪৬ সি
১৫৬	রত্নপেটিকার অনুকরণে তৈরি বাক্স। ঢাকনা এবং অন্যান্য অংশে হাতির দাঁতের ইন্‌লের কাজ। ইন্‌লের সাহায্যে 'রথী' লেখা। সিস্থ।	১৫ × ৮.৫ উচ্চতা ১১.৭	৮১এ
১৫৭	সিগারেট কেস ও ছাইদান। সরাসরি বৃক্ষকাণ্ড থেকে তৈরি। বাকল যথাযথ রক্ষিত। মেহগনি।	দৈর্ঘ্য ১৯.৫ উচ্চতা ১৩.৮	এ/৫৫
১৫৮	লম্বা গড়নের বাক্স। ঢাকনা এবং চওড়া অংশে তামার রিলিফের কাজ। ছোটো অংশে কাঠের রিলিফের কাজ। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ। অনুরূপ দুইটি বাক্স, কাঠের রিলিফের কাজ করা— রবীন্দ্র-ভবনের সংগ্রহে আছে।	১৪ × ৯.২ উচ্চতা ১৫.৫	৭৯/কি
১৫৯	জ্যামিতিক প্যাটার্নের পাউডার কৌটো। গামার, ব্ল্যাক সিস্থ।	১৩.৬ × ১৩.২ উচ্চতা ১২	১/কি

	বিবরণ	আয়তন/ সেন্টিমিটার	রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা
১৬০	পারাযুক্ত গোলাকৃতি পাউডার কৌটো। গামার, ব্ল্যাক সিস্থু।	উচ্চতা ১৭	১৬/বি
১৬১	উড়িষ্যার পঞ্চরত্ন, পীঢ় দেউলের অনুকরণে তৈরি কৌটো। সেগুন।	১৪·৫ × ৯·৫ উচ্চতা ১০	২/বি
১৬২	গোলাকৃতি পাউডার কৌটো। ঢাকনা এবং গায়ে ঘন কারুকার্য। গামার।	উচ্চতা ৫·৫	ই ২১১/ ক.ভ
১৬৩	প্যাগোডার অনুকরণে তৈরি কৌটো। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। ব্ল্যাক সিস্থু।	৮·২ — ৮·২ উচ্চতা ১০·২	৬৪/সি
১৬৪	কৌটো। ঢাকনায় 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। ব্ল্যাক সিস্থু।	৭·৫ × ৭·৫ উচ্চতা ৯	৬৬/সি
১৬৫	ছোটো কৌটো। ঢাকনায় এবং দুপাশে 'ইনলে'র কাজে কাঠ, (ব্ল্যাক সিস্থু) ও হাতির দাঁতের ব্যবহার।	১০·৫ × ৭·৫ উচ্চতা ৫·৫	৯৭/সি
১৬৬	ছোটো কৌটো। ঢাকনা ও গায়ে ইন্‌লের কাজ। গামার, ব্ল্যাক সিস্থু।	৭ × ৭ উচ্চতা ৬·৪	১৭/সি
১৬৭	পায়া ও হাতলযুক্ত চৌকো ট্রে। 'রথীন্দ্র' স্বাক্ষরযুক্ত। গামার, ব্ল্যাক সিস্থু।	২৪ × ১৮·৫ উচ্চতা ৩	৮৭/বি

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবন ও কলাভবন সংগ্রহে রক্ষিত রথীন্দ্রনাথের কারুকৃতির একটি তালিকা দেওয়া গেল। দারুশিল্প সংগ্রহের সঙ্গে তাঁর রচিত কয়েকটি চর্মশিল্পের কাজও আছে। এই শিল্পকর্মে ব্যবহৃত কাঠ : গামার, মেহগনি, আবলুস, কাঁঠাল, পাডুক, কুকী, পেয়ারা, ব্ল্যাক সিস্থু, সিস্থু, বনকাঁঠাল, আখরোট, হলদু ইত্যাদি। বেশ-কিছু শিল্পকর্ম স্বাক্ষরযুক্ত হলেও মাত্র তিনখানি (৭১৮.১০ ; ১৩২০.১০ ; ১৩২১.১০) ছাড়া সবই তারিখহীন। অনুমান করা যায়, কোনো কোনো ব্যক্তির সংগ্রহে তাঁর কিছু শিল্পকর্ম থাকা সম্ভব। ভবিষ্যতে সেগুলি দেখার সুযোগ পেলে বর্তমান তালিকা সম্পূর্ণ হতে পারবে।

এই তালিকা প্রণয়নে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক শ্রীকাঞ্চন চক্রবর্তী, শ্রীরবি পাল, শ্রীসন্তোষকুমার কর এবং শ্রীসনৎকুমার ঘোষ। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -বিষয়ক রচনা

শ্রীসুপ্রিয়া রায় -সংকলিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আশীর্বাদ'। 'গীতালি' (১৩২১) কাব্যগ্রন্থের প্রারম্ভিক কবিতা, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীর উদ্দেশে রচিত। রচনাকাল ১৬ আশ্বিন ১৩২১ দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কল্যাণীয় শ্রীমান রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে' রচিত কবিতা। রচনাকাল ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫। পুস্তিকাকারে প্রচারিত।

Kalimohan Ghose, 'Rathindranath Tagore', Visva-Bharati News, Decmbere 1938.

Stella Kramrisch, 'Introduction' of Exhibition Catalogue : Paintings, Woodwork by Rathindranath Tagore, All India Fine Arts and Crafts Society, New Delhi 1948.

Visva-Karma [V. R. Chitra], 'Rathindranath Tagore', SILPI, July 1948.

Reprinted in Rathindranath Tagore's Exhibition Catalogue, Santiniketan Kala Bhavana, 1965.

Ramendranath Chakravorty, 'Introduction' of Exhibition Catalogue: Rathindranath Tagore, an exhibition of paintings and woodworks. Government College of Art and Craft, Calcutta 1952.

Rathin Mitra, 'Foreword' of Exhibition Catalogue : Exhibition of Drawings, Paintings and woodwork by Rabindranath Tagore and his son Rathindranath Tagore at Doon School, Dehra Dun 1951.

পুলিনবিহারী সেন, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর', গীতবিতান পত্রিকা, রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর', বসুধারা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর', বসুধারা, আষাঢ় ১৩৬৮।

পুলিনবিহারী সেন, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর', 'রবীন্দ্রায়ণ' (দ্বিতীয় খণ্ড) সংকলন গ্রন্থের 'স্মরণ' বিভাগে প্রকাশিত। ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৮। বাক্ সাহিত্য, কলকাতা।

গোপাল হালদার, 'বিয়োগপঞ্জী' [রথীন্দ্রনাথের মৃত্যু], পরিচয়, আষাঢ় ১৩৬৮।

প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর', দেশ, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮।

Prabhatkumar Mukhopadhaya, 'In Memoriam : Rathindranath Tagore', Visva-Bharati News, July 1961.

Translation from the Bengali by Sri Sisirkumar Ghosh.

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সেই নেপথ্যচারী মানুষটি', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ জুলাই ১৯৬১।

প্রমদারঞ্জন ঘোষ, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। লেখকের 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন' [১৯৬৪] গ্রন্থভুক্ত। রীডার্স কর্নার, কলকাতা।

অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রথীন্দ্রনাথ', Rathindranath Tagore, Exhibition of paintings and woodworks, Santiniketan Kala-Bhavana 1965. Catalogue.

Sudhiranjan Das, 'Foreword', Exhibition Catalogue, Santiniketan Kala-Bhavana 1965.

লেনার্ড কে. এলম্‌হার্স্ট, 'ভূমিকা', রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি' (১৩৭৩) গ্রন্থের ভূমিকা, জিজ্ঞাসা, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩।

পুলিনবিহারী সেন, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের (প্রকাশ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩) 'পরিচয়' অংশে সংকলিত। অস্বাক্ষরিত। ইতিপূর্বে, 'গীতবিতান পত্রিকা' রবীন্দ্রশতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা ও 'রবীন্দ্রায়ণ' দ্বিতীয় খণ্ডে রথীন্দ্রনাথ বিষয়ে লেখকের যে দুটি রচনা প্রকাশিত হয় তা থেকে সংকলিত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রথীন্দ্র-স্মৃতি'। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ সংস্করণ) 'পরিচয়' অংশে সংকলিত।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'সেই নেপথ্যচারী মানুষটি', আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ জুলাই ১৯৬১ প্রথম প্রকাশিত। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণকালে (১৩৭৮) সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপে 'পরিচয়' অংশে সংকলিত।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতনের বাগান ও রথীন্দ্রনাথ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ মে ১৯৭৩।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের প্রথম কৃষিবিজ্ঞানী রথীন্দ্রনাথ', বিজ্ঞান সাময়িকী, ঢাকা ১৯৭৪।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ', অমৃত, ১ জুলাই ১৯৭৭।

অমিয় চক্রবর্তী, 'রথীন্দ্রনাথ', শান্তিনিকেতন, সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ২৯ নভেম্বর ১৯৭৭। সম্পাদনা শ্রীরবীন্দ্র ঘোষ, 'ছায়ানীড়', রতনপল্লী শান্তিনিকেতন।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রথীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী', 'শান্তিনিকেতন পত্র', সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ২৯ নভেম্বর ১৯৭৭।

শ্রীহৃষীকেশ চন্দ, 'রথীদা', শান্তিনিকেতন, সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ২৯ নভেম্বর ১৯৭৭।

শ্রীনন্দিনী দেবী, 'বাবাকে যেমন দেখেছি', শান্তিনিকেতন, সপ্তম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২৯ নভেম্বর ১৯৭৭।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রথীন্দ্রস্মৃতি', শান্তিনিকেতন, সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ২৯ নভেম্বর ১৯৭৭।

শ্রীগিরিধারী লালা, 'শান্তিনিকেতন ও রথীন্দ্রনাথ', শান্তিনিকেতন, সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, ২৯ নভেম্বর ১৯৭৭।

পুলিনবিহারী সেন, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর', ভারতকোষ পঞ্চম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮০।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। লেখকের 'শান্তিনিকেতনের এক যুগ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৭।

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, 'প্রায় বিস্মৃত প্রচারবিমুখ কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ', ভারতবিচিত্রা, ভারতীয় দূতাবাস -কর্তৃক প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।

শ্রীতুহিন দত্ত মজুমদার, 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্যক্তি ও কর্মচঞ্চলতা', পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩।

শ্রীপ্রকৃতি চক্রবর্তী, 'রথীন্দ্রনাথ : কবিপুত্র কবি', 'উদীচী' পত্র, শান্তিনিকেতন, আষাঢ়

১৯৩১ ; 'গল্পকার রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর', পৌষ ১৩৯১ ; 'অনুবাদক রথীন্দ্রনাথ', আষাঢ় ১৩৯২ ; 'রথীন্দ্রনাথ : চিত্রী ও কারুশিল্পী', পৌষ ১৩৯২ ; 'শিলাইদহ ও রথীন্দ্রনাথ', আষাঢ় ১৩৯৩ ।

শ্রীনন্দিনী দেবী, 'আমার বাবা', 'পিতাপুত্রী' শীর্ষক রচনার অংশ, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৪ ।

বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা রবীন্দ্রস্মৃতিমূলক বিভিন্ন গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আছে ; এই সূচীতে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি । কোনো কোনো প্রবন্ধেও রথীন্দ্র-প্রসঙ্গ বা রথীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের প্রাসঙ্গিক আলোচনা লক্ষ করা যায়, যেমন Mayce F. Seymour -লিখিত 'That Golden Time', Visva-Bharati Quarterly summer 1959 ; গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য -লিখিত 'উদ্ভিদ জগতে অভিনব বৈচিত্র্য উৎপাদনে মানুষের কৃতিত্ব', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ সংখ্যায় ।

গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের "আশীর্বাদ" কবিতাটি 'গীতালি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। "স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও 'গীতালি' রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীকে উৎসর্গীকৃত, এবং গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত 'আশীর্বাদ' কবিতাটি তাঁহাদের উদ্দেশেই রচিত।"— গ্রন্থ-পরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, বিশ্বভারতী।

"কল্যাণীয় রথীন্দ্রনাথ" শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত কবিতা 'কল্যাণীয় শ্রীমান রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে— রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ' নামে পুস্তিকাকারে প্রচারিত। পুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' দ্বিতীয় খণ্ডে (২২ শ্রাবণ ১৩৬৮) 'স্মরণ' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে এই কবিতার দুটি পাঠ লক্ষিত হয়। কবিতাটি এ পর্যন্ত কোনো রবীন্দ্রকাব্যে, বা রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

কালীমোহন ঘোষের "রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর", *Visva-Bharati News* ডিসেম্বর ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরেজি রচনার শ্রীক্ষিতীশ রায় -কৃত অনুবাদ।

লেনার্ড কে. এল্‌ম্‌হর্স্টের "রথীন্দ্রনাথ" শীর্ষক নিবন্ধটি রথীন্দ্রনাথ' 'পিতৃস্মৃতি' (১৩৭৩) গ্রন্থের ভূমিকা।

স্টেলা ক্রাম্‌রিশের "রথীন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম", দিল্লীতে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত রথীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রদর্শনীর Exhibition Catalogue-এর ভূমিকা; শ্রীক্ষিতীশ রায় -কর্তৃক অনূদিত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "রথীন্দ্র-স্মৃতি", 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থের (সংস্করণ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮) 'পরিচয়' অংশ থেকে সংগৃহীত।

"রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক পুলিনবিহারী সেনের রচনাটি 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থ ও 'রবীন্দ্রায়ণ' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত রচনা থেকে গৃহীত।

প্রমদারঞ্জন ঘোষের 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন' [১৯৬৪] গ্রন্থভুক্ত "রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর" কিঞ্চিৎ পরিবর্জন করে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থভুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনা 'বসুধারা' জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রচনা 'বসুধারা' আষাঢ় ১৩৬৮ সংখ্যা থেকে গৃহীত।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিবন্ধ তাঁর 'শান্তিনিকেতনের একযুগ' (১৩৮৭) গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত, শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত (পৌষ উৎসব ১৯৬৫) রথীন্দ্রনাথের চিত্র ও কাঠের কাজের প্রদর্শনীপুস্তিকা থেকে অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাটি গৃহীত।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কয়েকটি রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে "বাবাকে যেমন দেখেছি" তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থভুক্ত; "পল্লীর উন্নতি" 'রবীন্দ্রায়ণ' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত ও পরে 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে মুদ্রিত। 'প্রতিভাষণ' রথীন্দ্রনাথের ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে সিংহসদনে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় লেখক-কর্তৃক পঠিত; এটি তৎকালে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। "পিতৃদেবের মৃত্যু উপলক্ষে" শীর্ষক রচনাটি অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে প্রথম পৃষ্ঠাটি গ্রহণ করা হয়েছে, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনায় গৃহীত হয় নি। আলোচ্য রচনাটির পাণ্ডুলিপিতে, পৃষ্ঠার নীচে পেন্সিলে যে টীকা আছে, কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত করে এখানে দেওয়া গেল—

"সেবিকা, নন্দিতা কৃপালনী, রানী মহলানবিশ। ডাক্তার, জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, শচীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়।

সেবকদল, সুরেন্দ্রনাথ কর, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, বিশ্বরূপ বসু।"

পৃষ্ঠার অপর দিকে— "আশ্রম থেকে যাত্রা, শুক্রবার ২৫শে জুলাই। অস্ত্রোপচার বুধবার ৩০শে জুলাই। মৃত্যু, বৃহস্পতিবার, ৭ই আগস্ট।"

রথীন্দ্রনাথের লেখা যে কয়েকটি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে তার মধ্যে শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা প্রথম চিঠিটি শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত, অন্যান্য সকল চিঠি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন সংগ্রহভুক্ত।

রথীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রঙিন 'নিসর্গদৃশ্য। হিমালয়' শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত 'উদীচী'পত্রের পৌষ ১৩৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রথীন্দ্রনাথ এই চিত্রটি উপহার-স্বরূপ প্রমথ চৌধুরীকে দিয়েছিলেন। অঙ্কনের স্থান কালিম্পং; তারিখ ২২শে শ্রাবণ ১৩৫০। রথীন্দ্রনাথ -অঙ্কিত ফুলের ছবি প্রদর্শনী-উপলক্ষে-মুদ্রিত পুস্তিকা থেকে সংগৃহীত।

শ্রীমুকুল দে -অঙ্কিত রথীন্দ্রনাথের রঙিন প্রতিকৃতি 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে প্রকাশিত, শিল্পীর অনুমতিক্রমে বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত হল।

১৩২২ বঙ্গাব্দে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর কাশ্মীরে অবকাশ যাপন কালে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ফিরে এসে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ শেক্সপীয়রের একখানি গ্রন্থের (The Tempest) আখ্যা-পত্রে একটি কবিতা স্বহস্তে লিখে প্রতিমা দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন, গ্রন্থটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। সত্যেন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে কবিতাটি বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। প্রতিমা দেবীর দশম বর্ষ পূর্তিতে *Visva-Bharati News*; নভেম্বর ১৯৬৯ সংখ্যায় তাঁর স্মৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, ঐ কবিতাটি সেখানে প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ -লিখিত কবিতাটি এখানে মুদ্রিত হল—

বন্ধুপত্নী শ্রীমতী প্রতিমা দেবী
দেবীপ্রতিমাসু

আতিথ্যে হাতেম্ তাই বন্ধুবর রথী
যে জনের পতি—
যে বধূর বর—
দুটি চক্ষে স্নেহ যাঁর মনটি সুন্দর—
তাঁর পদ্মকরে
পরম আদরে

THE TEMPEST

চির পরিচিত এই পরী-নাট্যখানি
অর্পিলাম আনি'
ক্ষুদ্র উপহার
প্রীতির প্রতিভূ তবু শ্রদ্ধা এ সাকার !
ইতি
জাফরানীস্থানের অতিথি
সত্যেন্দ্র
১২-৮-২২

জোড়াসাঁকো 'বিচিত্রা' ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে রথীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে আমন্ত্রণ জানালে (আনুমানিক ১৯১৭ খৃস্টাব্দ) ছদ্মনামে কবি পদ্যাকারে যে উত্তর দিয়েছিলেন, বর্তমান সংকলনগ্রন্থে তার হস্তাক্ষরলিপি মুদ্রিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ 'মুক্ত'গ্রাস্' শ্রীযুক্ত যুক্তহাস দ্বিপদ বিশেষ'— এই ছদ্মনাম কবিতাশেষে ব্যবহার করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ কবিতাটি নিম্নরূপ—

রথীবাবু—
পড়িল দ্বিপদ কবি বিপদ-সাগরে
গোধূলিতে পদধূলি দিব গো কি ক'রে ?
বিচিত্রা গোধূলি লগ্নে পদধূলি যাচে
চতুষ্পদ-ধুলি চাই বুঝেছি তা' আঁচে
কবি-'বার্ড',— দুটো বই পা নেই আমার
লোকে বলে ডানা আছে,— তাও কল্পনার
চতুষ্পদ নেই ; তবে, আছে যে চৌপদী
ঝাড়িব চৌপদী মোর আজ্ঞা হয় যদি
ইতি মুক্ত'গ্রাস্'
শ্রীযুক্ত যুক্তহাস দ্বিপদ বিশেষ।

রথীন্দ্রনাথের কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গ্রন্থ সংকলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানারূপ সহায়তা করেছেন শ্রীবিমান সিংহ, শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীস্বপনকুমার ঘোষ, শ্রীদ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীসনৎকুমার বাগচী। শ্রীসৌম্যেন অধিকারী রথীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ('পড়িল দ্বিপদ কবি' ইত্যাদি) ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

প্রবেশক চিত্র শ্রীমুকুল দে-অঙ্কিত রথীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির ব্লক 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন সংস্থার সৌজন্যে ও 'হিমালয়' রঙিন চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত 'উদীচী' পত্রের সম্পাদকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা	ছত্র	
১২	১৩	'নিত্যব্যবহার্য' পঠনীয়।
৩৩	১৫-১৯	'অল্প কয়েক বছর অন্তর অন্তর এঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন।··· রেণুকার মৃত্যু বারো বছর বয়সে, শমীন্দ্রনাথের এগারো বছর বয়সে, বেলাদেবীর বত্রিশ বছর বয়সে।
৩৪	২৩	'১৮৮৬ খৃস্টাব্দে মহর্ষি শান্তিনিকেতনকে'···পঠনীয়।
৩৬	১২।১৫	'ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়' হবে।
৬৩		লেখিকা-নামের পূর্বে 'শ্রী' যুক্ত হবে।
৮২	১৫	'ছায়ানীড়' পঠনীয়।
৮৪		রচয়িত্রীর নাম শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী হবে।
৮৯	২।৩	'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে, দুঃখানি চ সুখানি চ'—পঠনীয়।
৮৯	৪	'দুঃখানি' হবে।
৯৪	২২	'দূরদর্শী' হবে।
১০৬	৪	'প্রাণতত্ত্ব' গ্রন্থ স্থলে 'অভিব্যক্তি' গ্রন্থ পঠনীয়।
১০৭	৫	'পারিষদ' হবে।

পৃষ্ঠা	ছত্র	
১২৭	৮	'মাতা যুগলমোহিনী দেবীকে' হবে।
১৪৫	২	'ভালো হওয়া মুশকিল' হবে।
১৪৭	৪	'উপস্থিতি' স্থলে 'উপচিতি' পঠনীয়।
১৪৭	১৪	'অন্তর্নিহিতি' স্থলে 'অন্তর্নিহিত' পঠনীয়।

চিঠিপত্র অংশ

৩১	১৪	'তোমাকে বাবার চিঠি' পঠনীয়।
৪৩		৩ সংখ্যক পত্রের টীকা : 'প্রথম মন্ত্রীসভার' পঠনীয়।
৪৯	১০	'নিজস্ব' স্থলে 'নিজস্ব' হবে।

পঞ্জী অংশ

৫৬	২৮	'রবীন্দ্রায়ণ' পঠনীয়।
৬৬		৪৮ সংখ্যক তালিকা : 'রিলিফ' হবে।
৭১		১১৭ সংখ্যক তালিকা : 'বাকল যথাযথ রক্ষিত' হবে।
৭৪		১৪৩ সংখ্যক তালিকা : 'কৌটো' পঠনীয়।
৭৬		১৬০ সংখ্যক তালিকা : 'পায়াযুক্ত' হবে।

৭৬ দারুশিল্পপঞ্জী। শেষ পৃষ্ঠার নীচে, ছত্র ৫ : এরূপ পঠনীয়—
'বেশ কিছু শিল্পকর্ম স্বাক্ষরযুক্ত হলেও মাত্র পাঁচখানি (৯৮·১০, ৩১৪·১০, ৭১৮·১০, ১৩২০·১০, ১৩২১·১০) ছাড়া সবই তারিখহীন।'

৮২ 'রচনা-প্রসঙ্গ।' শেষ অনুচ্ছেদটির সংশোধিত রূপ এইপ্রকার—
শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা রথীন্দ্রনাথের ১ সংখ্যক চিঠি শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। মৃণালিনী দেবী ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা সকল চিঠি শ্রীসৌম্যেন অধিকারী ও শ্রীকরুণাকিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংগৃহীত। অন্যান্য চিঠিপত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ-ভুক্ত।